

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৬০

প্রকাশক : অমল গুপ্ত অয়ন ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : শ্রীশান্তিময় ব্যানার্জী প্রিন্টার্স কর্নার প্রাইভেট লিমিটেড

১ গঙ্গাধরবাবু লেন কলকাতা ৭০০ ০১২

মুখবন্ধ

আমার মতো যারা সর্বঘটের বেলপাতা, তাদের লেখার তাগিদটা আসে প্রধানত বাইরে থেকে, সম্পাদকসম্প্রদায়ের অনুরোধ-উপরোধের চাপে। বহু-বছর-ধ'রে-লেখা নানা প্রবন্ধ, এলোমেলো ছড়িয়ে ছিল এখানে-ওখানে, আজ জড়ো করতে গিয়ে বার-বার তাঁদের কথা মনে পড়ছে, যাঁরা প্রায় ঘাড়ে ধ'রে একদা লিখিয়ে নিয়েছিলেন। আজ যে প্রবন্ধগুলি বই আকারে রূপ পেল তারও কারণ বাইরের তাগিদ: 'অয়ন' প্রকাশনী-র পক্ষ থেকে সুবীর ভট্টাচার্য মহা উৎসাহের সঙ্গে বহু জায়গায় খুঁজে-পেতে লেখাগুলির কপি সংগ্রহ করেছেন; তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। 'এক্ষণ'-সম্পাদক বন্ধুবর নির্মাল্য আচার্যের কাছেও আমি সমপরিমাণ ঋণী।

প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল 'চতুরঙ্গ', 'এক্ষণ', 'পরিচয়', 'কলকাতা', 'ক্রান্তি' ও 'এপিক থিয়েটার' পত্রিকায়। সবশুদ্ধ সতেরোটি লেখা, এখন হিশেব নিয়ে দেখছি সতেরো বছর ধ'রে লেখা, ১৯৫৭ সাল থেকে শুরু ক'রে ১৯৭৪ সালের মধ্যে। অর্থাৎ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রথম প্রবন্ধ আজ থেকে একুশ বছর আগে রচিত, এবং সবশেষেরটিও অন্তত চার বছর আগে। একটু দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করছিলাম, এই এতগুলি বছরের বিস্তার জুড়ে যে-সমস্ত লেখা, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সাযুজ্য আদৌ থাকবে কিনা। মানুষের মন বদলে যায়, দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টায়, চেতনায় নতুন রঙের প্রলেপ পড়ে, সুতরাং সতেরো বছরের অন্তর্লীন সময়ে মতামতে অবশ্যই উচ্চাবচতা এসে যেতে পারে। সেরকম আশংকা এখন অমূলক ঠেকছে; লেখাগুলির মধ্যে মোটামুটি একটি চারিত্রিক অবৈকল্য প্রবহমান ব'লেই আমার মনে হয়।

'কবিতা থেকে মিছিলে' নামপ্রবন্ধটি সম্বন্ধে আলাদা ক'রে এখানে কিছু বলা প্রয়োজন নেই, কিন্তু ঐ নামের দ্যোতনায় হয়তো আধুনিক বাঙালি মানসের একটি বিশেষ প্রবণতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এই ক্ষেত্রে আমি মধ্যবিত্ত বাঙালি মানসিকতার কথাই বলছি। বাঙালির বুদ্ধি, বাঙালির আবেগ, মধ্যবিত্তের আবেগ, স্বাধীনতা-উত্তর পর্বের দু'তিন দশকের উদ্বেলিত উদ্বেগউচ্ছ্বাসঝোঁক। কবিতায় বাঙালির লালন, কবিতায় বাঙালির অঙ্গীকার, কবিতার আবেগ বাদ দিয়ে বাঙালি বাঁচতে পারে না, পারবে না। কিন্তু কী সেই কবিতার রূপ, কাদের

নিয়ে সেই কবিতা, কারা সেই কবিতার লক্ষ্য-অভিলক্ষ্য? এই প্রশ্নগুলির সঙ্গে সামাজিক মানসিকতার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। মধ্যবিত্ত মানসিকতায় আমি প্রধানত তিনটি দ্বান্দ্বিকতা দেখতে পাই। প্রথম দ্বান্দ্বিকতা, আমি যে-বোধ বা আবেগ নিষ্কাশন করতে চাই, এবং যে-প্রকরণের সাহায্যে তা নিষ্কাশন করছি, তাদের মধ্যে। কী বলছি, কেমন ক'রে বলছি, কী গাইছি, কেমন ক'রে গাইছি, কী লিখছি, কেমন ক'রে লিখছি, কী গড়ছি, কেমন ক'রে গড়ছি, কী দিয়ে গড়ছি, কী আঁকছি, কেমন তুলি দিয়ে কোন্ বিভঙ্গে আঁকছি: এ-সমস্ত জিজ্ঞাসাগুলি এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও শৈলীর মধ্যে যে-দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা, যা যে-কোনো দেশে যে-কোনো কালে সংবেদনশীল মানসিকতার দায়ভার, তা যে বাঙালি মানসকেও দীর্ণ ক'রে আনবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

দ্বিতীয় দ্বান্দ্বিকতা সৃষ্টির সঙ্গে জীবিকার। যে-কোনো কবিকে-কর্মীকে-শিল্পীকে আলাদা ক'রে সময় সাজিয়ে নিতে হয় সৃষ্টির প্রয়োজনে, অনেক-অনেক সময়, তদ্গত সময়, অথচ সে-সৃষ্টিথেকে যদি জীবিকার সংস্থান না থাকে, তা হ'লে সমস্যা, তা হ'লে সংকট। আমরা বাঁচি, বিকশিত হই সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, তা যে প্রকার, যে-পর্যায়ের সৃষ্টিই হোক না কেন—অহরহ জীবনের নতুন স্তর আবিষ্কার করি। কিন্তু মাঝে-মাঝে প্রতিহত হ'তে হয়, জীবিকার তাগিদে হন্যে হয়ে ফিরতে হয়, বেলা বয়ে যায়, সৃষ্টির কাজ মুখ থুবড়ে প'ড়ে থাকে। এই সমস্যা যে-কোনো সাধারণ মানুষের সমস্যা, কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্তআবেগযুক্ত মানুষের পক্ষে এই সমস্যা একটু বেশিরকম তীব্র। আপাতত একটা জায়গায় বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা থমকে-দাঁড়ানো; সর্বভারতীয় রাজনীতি-অর্থনীতি-শিল্পনীতি ইত্যাদির প্রকোপে "অধিকাংশ বাঙালির উপার্জনবৃদ্ধির-কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকীর্ণ। বিশেষ ক'রে বাঙালি মধ্যবিত্ত এক উৎকীর্ণ সংকটের মুখোমুখি। এই সংকটের নিরসন কোথায়, এই সংকটের শীর্ষে দাঁড়িয়ে সৃষ্টির-আবেগের-স্বপ্নভাবনার নিষ্কাশন কোন্ পথে, এই ক্রান্তির লগ্নের কবিতা কী ক'রে সৃষ্টি হবে, কী তার স্বরূপ, কবিতার জন্য আলাদা ক'রে কী ক'রে সময় পাওয়া যাবে: এই এতগুলি প্রশ্নের জবাব হাতড়ে-হাতড়ে শেষ পর্যন্ত তাই মিছিলে দাঁড়াতে হয়, মিছিলের ভিড়ে নিজেকে যুক্ত ক'রে দিতে হয়, মিছিলের স্লোগানে নিজের প্রত্যয়কে মেলাতে হয়।

সবশেষের দ্বন্দ্ব ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সমাজসত্তার, দ্বিতীয় দ্বন্দ্বের যা সম্প্রসারিত

সংস্করণ মাত্র। যিনি সৃষ্টি করবেন, যিনি গান গাইবেন, যিনি কবিতা লিখবেন, যিনি ছবি আঁকবেন, যিনি স্থাপত্য গড়বেন, তিনি কী সমাজকে বাদ দিয়ে, সমাজের কথা ভুলে, সমাজকে প্রক্ষিপ্ত রেখে আত্মনিমগ্ন থাকতে পারেন? অন্তত মধ্যবিত্ত বাঙালি মানস স্বাধীনতা-উত্তর পর্বের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে, তা অবাস্তব প্রস্তাব। সমাজকে বাদ দিয়ে আমার আলাদা-কোনো সত্তা নেই, সমাজকে বাদ দিয়ে আমার সমস্ত কারুকর্ম স্তব্ধ, আবেগ অর্গলবদ্ধ, সমাজকে বাদ দিয়ে কবিতা অব্যক্ত। আমার সৃষ্টির জন্য জীবিকা প্রয়োজন, জীবিকার জন্য মিছিলে দাঁড়ানো প্রয়োজন, মিছিলের জন্য জনতা প্রয়োজন, জনতাকে বাদ দিয়ে তাই সৃষ্টি রুদ্ধগতি, কবিতা অনারব্ধ।

বর্তমান গ্রন্থের নানা প্রবন্ধে এই তিন দ্বান্দ্বিকতার আভাস ছায়া ফেলেছে, অন্তত এরকম আমার ধারণা। ঘুরে-ফিরে বার-বার ক'রে উচ্চারিত হয়েছে, কখনো স্পষ্ট বাচনে, কখনো ইঙ্গিতে, একটি বিশেষ ধর্মকথা: মিছিলকে বাদ দিয়ে সাহিত্য অসম্ভব, কবিতা অসম্ভব, জনতাকে বাদ দিয়ে যে-কোনো কারুকর্ম অবরুদ্ধ-পর্যুদস্ত। ১৯৫৭ সালে এই বিশ্বাসে স্থিত ছিলাম, ১৯৭৪ সালেও ছিলাম, এখনো আছি: এর বেশি মুখবন্ধ হিশেবে হয়তো বলার প্রয়োজন নেই।

তবে মধ্যবিত্ত বাঙালি মানসিকতায় অনেক রকম ঝোঁক। মধ্যবিত্ত মানুষ শ্রেণীদ্বন্দ্বে আরক্ত, সে এখনো পুরোপুরি জাত খোয়াতে পারেনি। বিশ্লেষণ দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে বিচারের প্রত্যন্তে সে সমাজের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়, কিন্তু শ্রেণীত্যাগ তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে শ্রমিক নয়, কারুজীবী নয়, কৃষিজীবী নয়, সে শুধু তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য তার সঞ্চিত পাপবোধ নিয়ে চেষ্টা করতে পারে। এই একাত্মতার প্রয়াস কখনো পুরোপুরি সফল, কখনো আংশিক সফল, অনেক ক্ষেত্রে অনেক পরিমাণেই অসফল।

মজুর-কৃষকের পক্ষে শ্রেণীযুদ্ধে হাল ছেড়ে দেওয়ার কোনো প্রসঙ্গ নেই, কারণ সে-যুদ্ধ ছাড়া তাঁদের বাঁচার অন্য-কোনো রাস্তা নেই। তাঁদের তাই আশাবাদী হ'তেই হয়, তাঁরা সংঘবদ্ধ হন, সংগ্রামে প্রবিষ্ট হন, এই আশায় অটুট থাকেন যে যেহেতু তাঁদের আর-কিছু হারাবার-খোয়াবার ভয় নেই, সংগ্রাম থেকে তাঁদের একমাত্র মুক্তিই আসতে পারে, তাঁরা প্রত্যেকেই বিজয়ী বীর, আজ না হোক দু'দিন বাদে। অন্য পক্ষে মধ্যবিত্ত মানসিকতায় স্খলন-পতনের সম্ভাবনা ওতপ্রোত-জড়ানো। যেখানে সামনে মনে হয় ঘন-নিকষ অন্ধকার, সেখানে

মধ্যবিত্তের একটু ঘাবড়ে যাওয়ার আশঙ্কা, শ্রান্তির ঢল তাকে হয়তো মাঝে-মাঝেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ইতস্তত তার হয়তো প্রায়ই দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে। দৃষ্টান্ত হিশেবে এই বইয়ের একটি-দুটি প্রবন্ধের উল্লেখ করছি। 'একটি প্রেমের গল্প', এখন মনে হয়, বড়ো বেশি সাময়িকতায় আচ্ছন্ন, বড়ো বেশি অন্ধকার ঋতুর প্রভাব পড়েছে ঐ প্রবন্ধে, যেমন পড়েছে 'শরতে আজ কোন্ অতিথি' লেখাটিতেও। এই প্রবন্ধদ্বয়ের রচনাকাল ১৯৭৩-৭৪ সাল, যখন ছায়া পূর্বগামিনী, এবং গোটা দেশে স্বৈরাচারের লক্ষণগুলি আস্তে-আস্তে প্রকট হয়ে আসছিল। কিন্তু, যদি মধ্যবিত্ত মানসিকতা তার ভারসাম্য হারিয়ে না-ফেলতো, তা হ'লে এ-দুটো প্রবন্ধেরই উপান্তে হয়তো কিছু আস্তিক উক্তি সংযোজন করা সম্ভব হতো। 'একটি প্রেমের গল্প' লেখা হয়েছিল দেশ থেকে তেরো হাজার মাইল দূরে কোনো অচিন্ নগরীর হোটেলের ঘরে ব'সে, এক রবিবার সকালে স্মৃতি রোমন্থন করতে-করতে ; হয়তো এই দূরত্বহেতু কিছু অতিরিক্ত আর্দ্র রসের সঞ্চার এই প্রবন্ধে।

অন্য দিকে 'আদ্যাশক্তিমহাশক্তিকালিকাকাহিনী', যা ১৯৭২ সালে রচিত, এখনো আমাকে ঈষৎ বিচলিত করে। আমাদের দেশে ফ্যাসীবাদ কোন্ পথে এগোচ্ছে এবং যে-দেবিকাআরাধনা সেই সময় থেকে শুরু, তার পরিণতি কোথায়, তার একটা স্পষ্ট পূর্বাভাস এই প্রবন্ধে ধরা পড়ছে ব'লে আমার বিশ্বাস।

সবশেষে সামান্য, কিন্তু আমার কাছে প্রচুর দ্যোতনাপূর্ণ, একটি কথা। বিভিন্ন প্রবন্ধে 'বাংলাদেশ' কথার উল্লেখ আশা করি পাঠকদের মনে ভুল-বোঝাবুঝি সৃষ্টি করবে না। এই বইতে অন্তত, 'বাংলাদেশ' মানে আমাদের বাংলাদেশ, যার পোশাকি নাম পশ্চিম বাংলা, কিন্তু যারও বাংলাদেশরূপে অভিহিত-উচ্চারিত হবার অধিকার বাইরের কেউ কেড়ে নিতে পারবেন না।

প্রয়াত আতাউর রহমান

বন্ধু, ভ্রাতা, শুভানুধ্যায়ী

সূচীপত্র

কবিতা থেকে মিছিলে	১
দূরে এসে ভালো থাকি	৯
কবিকাহিনী	১৬
ভয়ে-ভয়ে কয়েকটি কথা	২৬
দুটো উৎক্ষিপ্ত মন্তব্য	৩৪
স্কুলে ভুল নেই	৪৬
কবিতা বাদ দিয়ে মার্ক্স	৫৫
একটি ভাষাসমস্যা সম্পর্কে	৬৩
বাংলাদেশ ১৯৬৯	৭৩
একটি প্রেমের গল্প	৮৪
শরতে আজ কোন্ অতিথি	৯৪
আদ্যাশক্তিমহাশক্তিকালিকাকাহিনী	১০৫
শ্রেণীসংগ্রাম, অবৈকল্য, ব্রেখ্ট	১১৪
মার্ক্স, সার্ত্র, শ্রীমতী বোভোয়া	১২১
বুদ্ধি, মেধা, মেরী ম্যাকার্থি	১৩০
তদ্গত রূপকথা	১৩৯

কবিতা থেকে মিছিলে

অনেক কবিতা লিখে চ'লে যায় যুবকের দল। চল্লিশ বছর আগেও যেতো, তিরিশ-কুড়ি বছর আগেও, ১৯৫৮ সালেও; সুতরাং বাংলাদেশের—এই খণ্ডিত, বিজীর্ণ, হেজে-যাওয়া বাংলাদেশের—পটভূমি বদলায়নি। শুধু সন্দেহ, যুবকদলের সংখ্যা বেড়েছে, জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের চেয়ে দ্রুততর গতিতে বেড়েছে। এবং আরো যা, পৃথিবীর পথে-পথে যে-সব সুন্দরীরা মূর্খ সসম্মানে যুবকদলের কবিতা একদা গ্রহণ করতো কি করতো না, তারাও ঠিক বধির নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে নেই, সেই সোনার পিত্তল মূর্তিগুলি পর্যন্ত কবিতা লিখছে।

আশৈশব কবিতা ভালোবাসি, অথবা ভালোবাসতাম। এবং সুন্দরীবিদ্বেষী নই। তবু বাংলাদেশের এই কবিতার প্রপাতে আমি ঘাবড়ে যাই, অবসন্ন বোধ করি, ন্যক্কারে আমার শ্লেষ্মা ভ'রে ওঠে। গড়িয়াহাট-রাসবিহারী এভিনিউ-র মোড়ে দাড়িয়ে গাল পাড়তে ইচ্ছে করে আমার, গুভারটুন হলে বাচ্চা-বাচ্চা কবিদের চতুরালিকে বিশুদ্ধ ন্যাকামি ব'লে মনে হয়, এঁরা যখন পরস্পরকে বোদলেয়ারের বদহজমের ওগড়ানি পরিবেশন করেন, দু-কান আঙুলে বুঁজে পাশ থেকে উঠে আসি। অন্তত উঠে আসার প্রবণতা হয় আমার। হয়তো উঠে আসতে পারি না। কারণ আমার মধ্যেও বাঙালি ন্যাকামি, এই ক্লীব কবি-কবিনীদের সঙ্গে তাই দেখা হ'লে হাত তুলে নমস্কার করি, হেসে একটা-দুটো কথা বলি, সেই চিরাচরিত আবহাওয়া নিয়ে ভাবনাহীন কথা। এমনকি এঁরাও যখন সৌজন্যবশত নিজেদের পত্রিকার জন্য প্রবন্ধের অনুরোধ করেন, রাজি হ'য়ে যাই। চেতনার দোষ, মধ্যবিত্ত বাঙালি চেতনার।

ঈষৎ উষ্ণ ভঙ্গিতে কথাগুলি বললাম, কারো-কারো তাই ধারণাভ্রম হওয়া

সম্ভব—যেহেতু বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজে রূঢ়বাচনের ঐতিহ্য নেই—আমি রঙ্গ করছি। না, রঙ্গ আমি করছি না, কৌতুকের প্রস্তাব আমার কল্পনার বাইরে। আমি গাল পাড়বার জন্যই গাল পাড়ছি: এই সব কবির পালের কাব্য মকশো করার খাতা যদি আমার হস্তগত হ'তো, আমি নির্দ্বিধায় প্রত্যেকটি কবিতার নিচে মন্তব্য জুড়ে দিতাম: 'রে অর্বাচীন, তুমি একশোতে শূন্যেরও কম পেলে'! কিন্তু হায়, এ সমস্তই হয়তো ফাঁকা বুলি, শেষ পর্যন্ত আমার সাহস আমার প্রত্যয়কে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে সুড়ুৎ ক'রে কেটে পড়বে, অর্বাচীনদের অর্বাচীন ব'লে অভিহিত করার মতো নির্মল উত্তেজ আমার মধ্যে থাকবে না, বাঙালি চেতনা আমাকে অভিভূত, বশীভূত, বশংবদ ক'রে আনবে। অথচ কবিতার নামে যে-সর্বনাশ ঘটছে তা হয়তো এখনো ঠেকানো যায়, হাত গুটিয়ে ব'সে-থাকা সমাজের প্রতি কৃতঘ্নতা। কবিতায় মাংস নেই, রক্ত নেই, সানুনাসিক শব্দের কণ্ডূয়ন; কখনো-কখনো পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে বলা কান্নার ভণিতা, যে-কান্না এতই নিহিত প্রজ্ঞার ব্যাপার, এতই মাজা-দেওয়া যে কান্নার মশলাই খুঁজে পাওয়া দুষ্কর; কখনো এমন-এক প্রগল্ভ হর্ষোচ্ছলতা যে অরুণকুমার সরকার-বর্ণিত নাবালক ছাগলকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। মানছি, কবিতায় প্রচুর দক্ষতা এসেছে, কিন্তু প্রাকৃত ভাষায় বলা যায়, এই দক্ষতাকে ইয়ে করি। কী হবে দক্ষতা দিয়ে যদি না চারপাশের আকাশ তার শরীরে আলো ফেলে, যদি না সেই দক্ষতার মগ্নন্যত্যে আমার উপস্থিত মুহূর্তের পৃথিবী শিঞ্জিত হ'য়ে ওঠে, যদি-না দক্ষতার শিরদাঁড়ায় আমার বাংলাদেশের চেতনাভাবনাশিহরণশোকক্রোধঅহংকার-বিদ্বেষবিসংবাদকল্পনাচিন্তাপ্রেমঅবদমনহতাশাউৎসাহভক্তিবিশ্বাসআস্থা নাড়া দেয়, অহরহ নাড়া দেয়? কবিতায় আমি আর বাংলাদেশকে খুঁজে পাই না, খণ্ডিত বিজীর্ণ হেজে-যাওয়া বাংলাদেশকে, কান্নায়-সর্বনাশে উতরোল বাংলাদেশকে, এখনো-বেঁচে-থাকা-যায়-এখনো-বেঁচে-ওঠা-যায়-এখনো- নীলিমাঘন-সুষমানিটোল-সমাজে-উত্তীর্ণ-হওয়া-যায় এমন আশায়-জ্বালানো বাংলাদেশকে। কবিরা পরস্পরকে যে-ভৌতিক কথাবার্তা শোনাচ্ছেন তাতে আমার-তোমার স্বর-অনুস্বর নেই, বিন্দুবিসর্গও নেই। আমার-তোমার ব্যবহৃত শব্দগুলি তাঁরা ব্যবহার করেন, কিন্তু ব্যবহারের কোনো প্রক্রিয়ার নেই তাঁদের, তাঁদের হাতে ব্যবহার ব্যভিচার হ'য়ে দাঁড়ায়। আমার-তোমার শব্দগুলি নিয়ে তাঁরা শৌখিন জলবিহারে চ'লে যান: যেন সমাজের কাছে তাঁদের দায়িত্ব নেই, এই যে

আমাদের শব্দগুলি তাঁরা নিয়ে গেলেন তার জন্য আমাদের যেন কোনো রাজস্ব প্রাপ্য হয়নি। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। কবিরা তাঁদের স্ব-স্ব প্রেমিকাকে কবিতায় কী-সব সম্বোধন করেন, ইতস্তত এখনো নারীর শরীর ইত্যাদি নিয়ে উল্লেখ দেখতে পাই। কোন্ নারীর শরীর? নারীর শরীর কি শুধু শব্দের ব্যাপার, কথাগুলিকে একটার-পর-আরেকটা সাজিয়ে-যাওয়ার চাতুর্যপ্রসঙ্গ? নারীর স্তন-জঙ্ঘা-যোনিদেশের উল্লেখ দেখি, ঠোঁট-চিবুক-চোখ নিয়ে অবয়বহীন দর্শনচর্চাও চোখে পড়ে। স্তন-জঙ্ঘা-যোনিদেশ কী ক'রে লোভনীয়ত্বে পৌঁছয়, ঠোঁট-চিবুক-চোখে বিদ্যুতের স্থপতি কী ক'রে গঠিত হয়? আমরা মধ্যযুগে বাস করছি না, কালিদাসের পার্বতী-বর্ণনায় আমার আগ্রহ নেই। স্তন-যোনি-জঙ্ঘার জন্য পুষ্টি দরকার, সপ্তাহের মধ্যে ন-বেলা না-খেয়ে থাকলে চোখের-ঠোঁটের-চিবুকের বিজলি ফিকে হ'য়ে মিলিয়ে যাবে। পুষ্টির অভাবে বছরের-পর-বছর ধ'রে আমি প্রেমিকাদের প্রতীপ-প্রেমিকা হ'য়ে যেতে দেখেছি: যে-কেউ এখনো তাদের দেখতে পারেন। চোখ ভিতরে ঢুকে-যাওয়া, গাল দুটো গহ্বরে রূপান্তরিত, কঙ্কাবতীপ্রতিম কেশরাশি আপাতত সাড়ে সাত ইঞ্চির শীর্ণ এক চিল্তে দড়ি, চোখের দামিনী ক্লান্তিতে-হতাশায় লেপ্টে-আসা, এমন উপহাস-উদ্রেককারী স্বাস্থ্য যে ব্যাধিগ্রস্ত ভিখিরিরও যৌনবোধ জাগবে না। বাংলাদেশে আমি যে-দিকেই তাকাই, এই প্রতীপপ্রেমিকারা, যাদবপুরের উদ্বাস্তু পল্লীতে, কাঁথির বন্যাবিধ্বস্ত গ্রামে, সন্ধ্যার ডালহৌসীতে ছ-নম্বর কি চোদ্দ নম্বর বাসের জন্য প্রতীক্ষমান অবসন্ন ঘামের পূতিগন্ধযুক্ত ভিড়ে। সংসারে সংস্থান নেই, দেড়শো-দুশো টাকার আয়ে বাবা-মা-তিন ভাই-এক পুত্রবধূ-দুই অনূঢ়া বোন-তিন ভ্রাতুষ্পুত্র-পুত্রীর অন্নের জোগান, ভাইয়ের বেকার-ব'সে-থাকা, বাবার যক্ষ্মা, বর্ষায় শৌচাগারের-শয়নঘরের একাকার হ'য়ে-যাওয়া, অভাব, মেজাজখারাপ, পরস্পরকে দোষারোপ, কান্না, তিক্ততা, মনের সুকোমল বৃত্তিগুলির ধীরে-ধীরে শুকিয়ে-আসা। এই পরিবেশে, এমনকি তেইশ বছরের আপাত-উঠতি শরীরেও, স্তন আর স্তন থাকে না, দু-দিনেই তা হেলে প'ড়ে মাই হ'য়ে যায়।

মানি, এই রুদ্ধশ্বাস পরিবেশেও কবিতা সম্ভব। কিন্তু কেমন হওয়া উচিত সেই কবিতার, গ্রথিতব্য প্রতীকের জন্য সেই কবিতা এই মালিন্য-কুশ্রীতা ঝড়-জল-সর্বনাশ এড়িয়ে অন্যচারী হ'লে, লাথি মারি সেই কবিতায়। বাংলাদেশের পৃথিবীতে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে কেরানি-ইস্কুলমাস্টার, মধ্যবিত্ত-ঠাঁট-পিছনে-ফেলে-

আসা কাতারে-কাতারে শরণার্থী, হাজার-হাজার পাশ-ক'রে বেরোনো ছাত্রছাত্রী, ছাঁটাই-হওয়া মজুর, জমি-থেকে-বিতাড়িত ভাগচাষী কিংবা দিন-আনা-দিন-খাওয়া খেতমজুর : বাংলাদেশের পৃথিবীতে অন্নাভাব, মূল্যবৃদ্ধি, বাইরে-থেকে-এসে-চ'ড়ে-বসা মূলধনের নর্তন-কুর্দন-আস্ফালন, আকীর্ণ স্বাস্থ্যাভাব, আকীর্ণ পুষ্টিহীনতা; বাংলাদেশের পৃথিবীতে হতাশা, হিংসা, আক্রোশের হাঁসফাঁস, অসহায়তাবোধের গ্লানি; কিন্তু এই বাংলাদেশের পৃথিবীতেই সেই সঙ্গে বিপ্লবের স্বপ্ন, রাজনৈতিক সংগঠন, মিছিল। মিছিলে দৃপ্ত মুখ, ধর্মঘট, বিদ্রোহে-উদ্ধত আকাশে-তুলে-দেওয়া হাত, একদিন-আমার-তোমার-সকলের-সংসারে-প্রাচুর্য-আসবে- স্বাচ্ছন্দ্য- আসবে-সুষমা-সমতা-আসবে সেই আশায় বুক কেঁপে-ওঠা। এই সমস্ত-কিছু নিয়েই কবিতা হয়, অন্তত হওয়া উচিত, কারণ ব্যাকরণগত সত্যশিবসুন্দর এই বাংলাদেশের পৃথিবীর আকরে ছড়ানো।

উপস্থিত-যাঁরা কবিতা লিখছেন, মনে হয় না এই আটপৌরে বাংলাদেশ সম্বন্ধে তাঁদের কোনো আগ্রহ আছে, তাঁদের প্রতীক তথা প্রসঙ্গ কোন্ প্রচ্ছন্ন সুড়ঙ্গ বেয়ে অন্য পৃথিবীতে চ'লে যায়, যার আদল-আলাপ-চরিত্র মঙ্গলগ্রহ থেকে আহৃতও বলা চলে। কেরানি-ইস্কুলমাস্টারের পৃথিবী নয়, বেকার-শ্রমজীবী-কৃষিজীবীর পৃথিবী নয়, আমি যে-নায়িকাকে প্রতিদিন পুষ্টির অভাবে—নিছক জাগতিক, দ্রাব্যিক পুষ্টির অভাবে—ম'রে যেতে দেখছি, তার পৃথিবী নয়। তবে কি তাঁরা কবিতা লেখেন বাংলাদেশের অঙ্গুলিমেয় সেই মিহিন উচ্চবিত্ত সমাজের জন্য, যেখানে কেরানিরা কাজে কতটা ফাঁকি দেয় তা নিয়ে বিশ্রম্ভালাপ চলে, বাঙালিদের অভ্যাস কত নোংরা তা নিয়ে বিবমিষা থেকে অন্য-আরেক বিবমিষার মধ্যে মন্তব্য-বিনিময় চলে, ঘেরাও কেন দেশদ্রোহিতার সমপর্যায়ভুক্ত সে-বিষয়ে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত, বক্তৃতাশালায় আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়, এক সন্ধ্যায় পাঁচ হাজার টাকা ঢেলে রবিশংকরের সেতার-ঝংকার শোনা হয়, জটলা চলে কী-ক'রে মজুরদের অর্জিত বোনাস আইনের মারপ্যাঁচে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব? কবিরা যদি মুখোমুখি বলেন, তাঁদের রচনা আমার-তোমার জন্য নয়, তাঁদের প্রেমিকা এই নিরালম্ব নপুংসক সমাজের, সুতরাং তাঁদের কবিতার গহনে পৌঁছনো আমার-তোমার প্রতিভার আওতার বাইরে, তাহ'লে তো সঙ্গে-সঙ্গে মামলা শেষ, সৌজন্য জিনিষটাকেও তাহ'লে অচিরে শিকেয় তোলা চলে। তাহ'লে কণ্ঠে যথাযথ বিষ ঢেলে নিয়ে বলতে পারি : অর্বাচীনের দল, চলো, তোমাদের

কবিতাকে শ্মশানে রেখে আসি, রেখে এসে আমাদের নিজেদের তদ্গত কবিতায় ব্যাপৃত হই, যে-কবিতা মিছিলের সগোত্র, যে-কবিতা মিছিলের শরীরের সঙ্গে একাকার হ'য়ে মিশে যাক এরকম আমাদের তুঙ্গতম প্রার্থনা।

হয়তো, যে-যুবকদল কবিতা লিখছেন, তাঁদের কেউ-কেউ বলবেন, আমার প্রতি ঘৃণায় নীল হ'য়ে উঠে রক্তের-চাপ-তুলে-দেওয়া রাগে ফুঁসে উঠে বলবেন: সমাজবোধ তোমার পিতৃকুলের একচেটে সম্পত্তি নয়, আমরাও আশেপাশের সমাজ নিয়ে ভাবি, বাংলাদেশের প্রতি প্রেমে আমরাও নিবিড় হই; আমাদেরও বাবা কেরানি, আমাদের বউ-বোন-ঝিকেই তুমি দিনের-পর-দিন অপবিত্র হ'তে দেখো, তোমার সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও দেখি, যে-তমিস্রা যে-খিন্নতা তোমার আবেগকে বিকৃত করেছে তার সঙ্গে আমাদেরও মুখোমুখি দেখা হয়, ঘুরে-ফিরে দেখা নয়, প্রতিনিয়ত দেখা; সুতরাং তুমি আমাদের কী বাণী দিচ্ছো? কিন্তু, তোমার সঙ্গে আমাদের তফাত যেখানে, তোমার মনে এখনো আশার দোলানি, তুমি অপোগণ্ডের মতো এখনো নতুন সমাজের স্বপ্নে আহ্লাদিত হও, মিছিলের কথা ভাবো, সমাজ বিপ্লবের প্রস্তাবনা দিয়ে নিজের কল্পনায় আঁকিবুকি কাটো। আমাদের সে-বালাই ঘুচেছে; আমাদের মনে কোনো আশা নেই; আমরা জানি আমাদের জন্য শুধুই মৃত্যু; সুতরাং আমাদের কবিতায় প্রতীকসমাগম, সন্ধ্যাভাষা, পরিপার্শ্ব-অনীহা, আমরা ম'রে যেতে চাই, সুতরাং আমাদের বোদলেয়ার-মন্থন; তুমি যদি মৃত্যুই না-ভালোবাসো, কেন মরতে তাহ'লে আমাদের সঙ্গে লাগতে আসো?

কবুলতি করছি, আত্মহত্যাবিলাসে আমার আগ্রহ নেই, আত্মহত্যার অর্থ সমাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। যে পালিয়ে যায়, সে একলা পালায়, কিন্তু আস্ত-একটা সমাজ পালাতে পারে না, আস্ত-একটা বাংলাদেশের পক্ষে গহীন গাঙে ডুবে-মরা অসম্ভব, চার কোটি লোকের বাংলাদেশ, একজন-আধজনের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা সত্ত্বেও, টিঁকবে, এই ১৯৬৮তে টিঁকে আছে, ২০৬৮ সালেও থাকবে। যত বড়ো মুখ না তত বড়ো কথা আমি বলবো না। যাদের বেঁচে-থাকার, স্বপ্ন দেখার, সুন্দর-পবিত্র হ'য়ে নতুন পৃথিবীর সাম্যচ্ছায়ায় ভালোবাসবার ইচ্ছে নেই, তারা চ'লে যাক, স'রে যাক, তাদের কবিতার অস্বাস্থ্য দিয়ে আমাদের স্বপ্নকে তারা যেন কলুষিত না করে।

সুতরাং মিছিল। আশৈশব কবিতা ভালোবাসি, কিন্তু তাহ'লেও মিছিল।

কবিতা আপাতত পাশে প'ড়ে থাক, কবিতার সর্বনেশে প্রকোপ থেকে বাংলাদেশকে উদ্ধার করো, চলো, মিছিলে যাই। যে-মিছিল আত্মহত্যার কথা বলে না, সেই মিছিলে ; যে-মিছিল আমার কেরানি বাবা, ইস্কুলমাস্টার বোন, বেকার ভাইকে স্রেফ বেঁচে থাকার—জৈব অর্থে বেঁচে থাকার—কলকাঠির নির্দেশ দেবে, সেই মিছিলে ; যে-মিছিলে ন্যাকামি নেই, মাছের কারবারীরা চাষের খেত কেন জলে ভাসিয়ে দেয় তার ব্যাখ্যা মেলে যে-মিছিলে, যেখানে জিনিশপত্রের দাম হু-হু ক'রে বাড়ার সঙ্গে সীমান্তে উপস্থাপিত জুজুর কী সম্পর্ক তার হদিশ মেলে, সেই মিছিলে, বাংলাদেশের আরেক নাম কোন্ ত্যাগে-পরিশ্রমে-অধ্যবসায়ে-তিতিক্ষায় ভিয়েৎনাম হ'যে উঠতে পারে সে-সম্ভাবনার সূত্রজ্ঞাপক যে-মিছিল, সেই মিছিলে, কেন আমরা শীর্ণ থেকে জীর্ণতর হচ্ছি অথচ শাসকদের সচিবসখারা ক্রমশ আঙুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছেন তা জানা যায় যে-মিছিলে গেলে, সেই মিছিলে। মিছিল আমাকে আরো অনেক-কিছু শেখায়, আমাকে বলে আমি একা নই, আমরা কেউই একা নই, আমরা জোট বেঁধে বুক চেতিয়ে যদি রাস্তা কাঁপিয়ে এগোই, দু-পায়ের ভিতর লেজ গুটিয়ে সমাজ-শত্রুরা তাহ'লে পালিয়ে যাবে। মিছিল আমাকে শেখায়, আমাদের অভাবে কোনো লজ্জা নেই, গ্লানি নেই, কারণ তা শোষণের অবদান ; মিছিল আমাকে অবিকল হ'তে শেখায়, রাগ করতে শেখায়, ঘৃণা করতে শেখায় ; মিছিল আমাকে বলে এই মহৎ সামাজিক বৃত্তিগুলি বাদ দিয়ে আন্দোলন হয় না বিপ্লব হয় না, নতুন পৃথিবীতে উত্তরণ হয় না।

হায়, যদি এই তীব্র ইতিভাষণান্তেই দাঁড়ি টানতে পারতাম! না, মিছিলে গেলে আমার সত্তার স্বাধীনতা মিইয়ে যাবে তা নিয়ে আমার আক্ষেপ নেই, একলক্ষ আজেবাজে লোকের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচালে আমার চেতনার তীক্ষ্ণতা ভোঁতা হ'য়ে আসবে, বুদ্ধির উজ্জ্বলতা নিষ্প্রভ হবে ইত্যাকার গালগল্পে আমার রুচি নেই। দেশের অধিকাংশ লোক যেখানে দু-বেলা খেতে পাচ্ছে না, সে-অবস্থায় শ্রীযুক্ত অমুকচন্দ্র তমুকের সত্তার স্বাধীনতা মাতা মেরীর সতীচ্ছদের মতো অক্ষত রইলো কিনা সেই চিন্তা আমার বিচারে অশ্লীল। সভাস্থলে দাঁড়িয়ে যদি ঘোষণা করা হয়, তোমরা সবাই দু-বেলা পেট পুরে খেতে চাও, না শ্রীযুক্ত অমুকচন্দ্র তমুকের সত্তার স্বাধীনতা জান কবুল ক'রে রক্ষা করতে চাও, তাহ'লে রায় কী দাঁড়াবে তা নিয়ে আমার অন্তত মনে কোনো সন্দেহ নেই। এবং এই

লোকায়ত রায় মেনে নিতে আমার কোনো নাক-সিঁটকানো ভাব আসবে না। হয়তো বলা হবে পুরো সমস্যাটিকে আমি বিকৃতরকম সরল ক'রে উপস্থাপন করছি; সমস্যাটি একের চিত্তোৎকর্ষ বনাম বহুর ক্ষুন্নিবৃত্তি নয়, ন্যূনতম আহার্যের পরিধি পেরিয়ে যে-দ্বন্দ্বঅধ্যুষিত জগৎ, যেখানে মানুষকে একটি মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়েই তবে অন্য মূল্য আহরণ সম্ভব এই প্রজ্ঞায় স্থিত হ'তে হয়, এরকম এক দার্শনিক পরিমণ্ডল জড়িয়ে দ্বন্দ্বের যন্ত্রণার পরিপূর্ণ অনুধ্যান। হয়তো ইওরোপ-আমেরিকার আপেক্ষিক সচ্ছলতার নির্যাসে সমস্যাটি এই রূপ নিতে পারে, এই সংস্কৃত ভদ্র রূপ, কিন্তু আমার আপত্তি থেকেই যায়। যাকে দ্বন্দ্ব ব'লে চালানোর চেষ্টা চলছে, বাংলাদেশের পটভূমিতে তার চরিত্রটি নেহাত ন্যাংটো। সেই যে বাংলা প্রবচন আছে, পশ্চাদ্দেশে চর্মাবরণ নেই, অথচ রাধাকৃষ্ণ-নামোচ্চারণের প্রবণতা, মিছিলে গেলে অশুচি হবো এই আশঙ্কা ঐ প্রবচনটিকেই মনে করিয়ে দেয়, যেন ক্ষুধার চেয়ে শুচিতা বড়ো।

কিন্তু না, তা সত্ত্বেও এখানে দাঁড়ি টানতে পারছি না। এমনই ছিন্নভাগ্য দেশ, মিছিলে গেলেও পরিত্রাণ নেই, সেখানেও কবিতা তাড়া ক'রে আসে। নেতাদের বক্তৃতা শুনুন, বাষ্প; হ'লোই বা বাষ্পের বিষয়বস্তু বিপ্লব, বাষ্প বাষ্পই, স্থানভেদে-কালভেদে-পাত্রভেদে তার রাসায়নিক উপাদান একই থেকে যায়; মিছিলের শেষে ময়দানে জমায়েত হ'য়ে ভালো ক'রে কান পেতে শুনুন পাটাতন-থেকে-বিস্ফোটিত শব্দকল্পদ্রুম। নিছক কথা বলার জন্য কথা বলা, প্রতি বাক্যে তিনবার ক'রে বিপ্লবের নামে শপথ, বিপ্লব যেন হুড়মুড় ক'রে এক্ষুনি এখানে এসে পড়বে এরকম এক অভ্যস্ত ভাব। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে, দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে, শ্যামবাজারের রকলগ্ন ছেলেদের শান্তিনিকেতনে পাঠরতা মেয়েদের সম্বন্ধে যে-ধারণা ছিলো—'বোলপুরে নেমে দু-পা হেঁটে তারপর একটাকে নিয়ে নিলেই হ'লো'—ময়দানে যাঁরা বক্তৃতা করেন বিপ্লব সম্পর্কে তাঁদের ধারণাটিও মোটামুটি একই রকম: রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে বিপ্লব, করুণা ক'রে কুড়িয়ে নিলেই হ'লো।

সুতরাং মিছিলেও কবিতা, সেই রোমাঞ্চ আবেগ-ভরা কথার ঠুসকোকাহিনী। যে-কাহিনীর মর্মবাণী গাড়িতে চেপে ময়দানে পৌঁছে বক্তৃতা দিতে বলে, হঠকারী হ'তে বলে না। সায়াহ্নলগ্নে যাঁরা বিপ্লবের বক্তৃতা দেন, তাঁরা ঊর্ধ্ব হিতাহিত, পরের দিন সকাল হ'লে তাঁদের কোনো বিবেকের স্মৃতি থাকে না। মধ্যবিত্ত

বাঙালি চেতনা চনমন ক'রে ওঠে, কিন্তু সেই মধ্যবিত্ত বাঙালি চেতনাই মিছিলের বক্তৃতায় কবিতা ঢুকিয়ে দেয়। পৃথিবীতে কবিতারূপী বিভীষণের শেষ নেই।

সুতরাং যা বলছিলাম, কোনোরকম মোহই নেই আমার। কবিতার ঝুট-ঝামেলা কাটিয়ে যদিই বা মিছিলে পৌঁছুই, আপাতত কোনো আশা নেই, বাষ্পভারাতুর হ'য়ে মিছিল ভেঙে পড়বে। তাছাড়া, ভড়ংবাজির বাহার-পনায় নিজের পরিচয় খুব বেশিক্ষণ ভাঁড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যে-আমি এই উক্তিগুলি করছি সেই-আমি হয়তো নিরাপদ সরকারি চাকরি করি, বাংলার আকাশের ঘনঘটা আমাকে ছোঁয় না, দুঃসাহসী সামান্য কয়েকজনও বাংলাদেশে যখন স্বৈরতন্ত্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিপ্লবের শ্মশানে একলব্যদক্ষিণা দিচ্ছে, আমি তখন হয়তো দিল্লিতে কি লখনউতে, ইওরোপে অথবা মার্কিনদেশে; মধ্যবিত্ত বাঙালি চেতনা আমার ধমনীর প্রবাহে, খোলসের পর খোলস আমি ধারণ করছি, ছাড়ছি, ফের পরছি; অসাধুতার এতগুলি স্তর আমি অতিক্রম ক'রে এসেছি যে খোলসের একবারে নিচে কোনো চেতনা যে একদিন ছিলো, তার এতটুকু স্মৃতিও এখন নেই।

এই দুশ্চরিত্র, লম্পট আমিও মিছিলে; যদি কবিতাকে পরিত্যাগ করেও থাকি, তাহ'লেও আমি দুশ্চরিত্র, লম্পট; অসাধুতা আমার অস্থিমজ্জাগত, বিশ্বাস-ঘাতকতায় আমার জুড়ি নেই, আজ মিছিলে আছি, কাল হয়তো এই মিছিলের উপরই কামান দাগবো, চেতনার ঋণ পরিশোধ করবো।

তবু মিছিলে, এই আশায় যে আমার চেতনা বংশানুক্রমে পবিত্র থেকে পবিত্রতর হবে, একদিন আমার চেতনা ভুলবে তার মধ্যবিত্ত শ্রেণীস্বার্থকলুষ করা ঐতিহ্য। এমন হ'তে-হ'তে একদিন মিছিলে আমার মতো আরো যাদের চেতনা তাদের সংখ্যা ক্ষ'য়ে-গিয়ে সামান্যে ঠেকবে, কৃষিজীবী-মজুরের চেতনা আমাদের হারিয়ে দেবে। পাটাতনে দাঁড়িয়ে তখন যাঁরা বক্তৃতা দেবেন, তাঁদের বচনে আর কবিতা থাকবে না, মিছিলের কাব্যমুক্তি ঘটবে।

এবং তখনই নতুন সমাজের নতুন কবিতা সম্ভবপরতার আরো একটু কাছাকাছি আসবে।

১৯৬৮

দূরে এসে ভালো থাকি

প্রিয়বরেষু নরেশ,

ক্ষমা চাইছি। লিখতে ব'সে কলম ঠেকে-ঠেকে যাচ্ছে। বুদ্ধদেব ষাট পেরোলেন—যেমন বোধহয় আরো পেরোলেন বিষ্ণু দে, অজিত দত্ত, এঁরা সবাই,—কিন্তু সেই সঙ্গে আমরাও তো বুড়িয়ে গেলাম, ফুরিয়ে গেলাম। বছরের পর বছর আরো গড়াবে, বুদ্ধদেব তাঁর তন্নিষ্ঠায় স্থিত থাকবেন, কিন্তু আমরা? কতগুলি নিছক কঙ্কাল আমরা, প্রেতস্বরে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলি, অথচ নিহিত কোনো বাণী বা বাসনা নেই আমাদের। আমার-আপনার আলাদা-আলাদা কিছু বিশ্বাস আছে হয়তো, কিন্তু আস্থাকে যা দীপ্ত ক'রে তোলে সেই নিষ্ঠা কোথায়? সুতরাং, স্রেফ তারিখকে বিনম্র প্রণাম জানাবার উপলক্ষসূত্রেও, যা-ই বলতে যাবো-না-কেন, একটা ফাঁক থেকেই যাবে। নিষ্ঠা, যার আরেক নাম প্রেম, আমাদের হৃদয়ে কোনোদিন নাড়া দিয়ে যায়নি। সাময়িক ব্যসনে আমরা মাঝে-মাঝে দোলায়িত হয়েছি, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সুতরাং আজ কোন্ সাহসে বুদ্ধদেবের উপর দু'ছত্র প্রবন্ধ রচনা করতে বসবো, লজ্জায় যে আমার মাথা কাটা যাবার উপক্রম হবে।

দূর থেকে শ্রদ্ধা জানানোই তাই ভালো। এমন-কি কলকাতা গেলেও, আপনি তো জানেন, বুদ্ধদেবের সঙ্গে ইদানীং কচিৎ-কদাচিৎ আমার দেখা হয়। টালিগঞ্জের সুদূর দক্ষিণ রাসবিহারী এভিনিউ-র সেই স্মৃতিলাঞ্ছিত ফ্ল্যাটটির প্রতিতুলনায় অবশ্যই বহুতর দুর্গম, কিন্তু বুদ্ধদেবের সঙ্গে দেখা না-হবার সেটা একমাত্র, অথবা প্রধান, কারণ নয়। মনের প্রবাহ দুই সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্রের উপত্যকা বেয়ে এগোচ্ছে, সময় যতই আরোএকটু

পা বাড়াচ্ছে, দূরত্ব বাড়ছে। যে-আমি একদা বুদ্ধদেবের কবিতার স্তবকে আমার জিভকে হ্লাদিনী ক'রে নিয়ে ঢাকা শহরের করোনেশন পার্কের প্রান্ত থেকে নীলক্ষেতের নীলিমার দিগন্তে পায়ে হেঁটে-হেঁটে বিলীন হ'য়ে যেতে পারতাম, যে-আমি 'হঠাৎ-আলোর ঝলকানি'-র গন্ধের স্বাদে আমার কৈশোরকে প্লাবিত ক'রে বেঁচেছিলাম, যে-আমি 'যেদিন ফুটলো কমল'এর অপাপবিদ্ধ মৌসুমী প্রেমের আশ্লেষে মৃত্যুর কাছাকাছি চ'লে গিয়েছিলাম, সেই-আমি স্মৃতিসর্বস্বতা ছাড়া এখন আর অন্য-কোনো উপচারই দাবি করতে পারি না। 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর উত্তরপর্বের পৃথিবীর সঙ্গে আমার মনের আবেগের মিলনক্ষেত্র নেই। আবু সয়ীদ আইয়ুব যখন 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'-কে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য-কীর্তির সমান সোপানে অধিষ্ঠিত করেন, নিজেকে ভীষণ নিরক্ষর মনে হয় আমার। দূরে এসে তাই ভালো থাকি, দূর থেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে।

সুতরাং আমার শুধুই পিছনে-ফিরে-তাকানো, নিছক স্মৃতিতে দহিত হওয়া। এলোমেলো স্মৃতি, সময়ের পরম্পরা না-মেনে তার নিজেকে উজাড় ক'রে আনা। 'আমায় খেপিয়েছিলো যেই-কবিতার বইগুলো সেই প্রথম ফাগুনে', বোধ হয় ১৯৪০ সাল ; 'ভাঙা গলার বাঙাল কথা রাঙালো প্রাণ মন নারানগঞ্জের ইস্টিশানে দুপুরবেলায়', হয়তো ১৯৪১ ; উজ্জ্বল ঝকঝকে 'কবিতা' পত্রিকার একাদিক্রম সংখ্যা, হঠাৎ তারই কোনো-একটিতে : 'বিনয় বৃদ্ধের বিত্ত, দাম্ভিক যৌবন / মনে করে সূর্য তারই সম্ভোগের পথের প্রতীক, / রতিহ্রস্ব রাত্রির পাহারা'—আমি তাহ'লে ১৯৩৯-এ পৌঁছে গেলাম ; 'নতুন পাতা'র শিরশিরানি দমকা মেরে আমাকে ছুঁয়ে গেলো : 'তার মুখ কি এখন দক্ষিণে, কলকাতার দিকে ফেরানো ?' পুরোনো 'ভারতবর্ষ'-এর বাঁধানো সংখ্যা, যতদূর মনে পড়ে সেটা ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গল্প 'ইতি', সরলার করুণোপাখ্যান, যে-পৃষ্ঠায় শেষ হ'লো ঠিক সেখানে, প্রায় মেপে-বসানো, শ্রীবুদ্ধদেব বসুর কবিতা : 'সব শেষ হলো তবে, তা-ই হোক, অশ্রু ফেলিয়ো না ; / জানো না কি অশ্রুজল ওষ্ঠপুটে ঠেকে বড়ো নোনা, / বিষম বিস্বাদ—/ যে-ওষ্ঠে রেখেছো এঁকে প্রণয়ের সম্পূর্ণ সম্বাদ ?' কিন্তু জলধর সেনের চমক-লাগানোর ওখানেই ইতি নয়, সামান্য কয়েকটা পৃষ্ঠা এগিয়ে শ্রীবুদ্ধদেব বসুর গল্প : হালতু-ফালতু গল্প নয়,—ভেবে দেখুন, সেটা ১৩৩৪ সাল, এবং পত্রিকাটির নাম 'ভারতবর্ষ'—একেবারে সেই ভীষণরকম দুঃসাহসী গল্প, যার শুরু আমহার্স্ট স্ট্রীটের সেই বাসি পাউরুটি-

রঙের মেসের বর্ণনায়, যে-মেসের মুখোমুখি এক পানের দোকান, যে-দোকানে রিক্সাওলা-হ'তে-পারে-কিন্তু-গুণ্ডা-হওয়াই-সম্ভব এমন-চেহারার কিছু লোক সর্বক্ষণ আড্ডা দেয়, কিন্তু যে-দোকানের চাইতে রসালো পান কলকাতা শহরের অন্য কোথাও পাবেন না, চুন-খয়েরের পারস্পরিক অনুপাত এতই 'পার্ফেক্ট'।

এবং আরো : 'রাত্রির মতো তোমার চুল, হৃদয়ে তাহার স্বপ্ন দেখি', অথবা সেকালের রাজাদের দুই প্রধান ব্যসনের বিবরণ, রাধারানীর নিজের বাড়ি কী ক'রে রক্তকে-সত্তাকে-সন্তানকে দীর্ণ ক'রে গাঁথুনির-পর-গাঁথুনি উপরে উঠলো, যে-বাড়ির লাল সিঁড়ি, সে-সিঁড়ির জন্মকাহিনী, বিক্রমপুর পরগণার গহণারণ্যে সোনারঙ্-মধ্যপাড়ার কোন্ শ্যাওলায়-নিবিড়-হ'য়ে-আসা পুকুর-পাড়ে বিদ্যাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনা-ডুবোনো-প্রেম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই শান্ত-চোখ অস্ফুট মেয়েটি, যার নাম অপর্ণা, সে যেন আমাকেই অনুযোগ ক'রে বললো, 'বড়ো দেরি ক'রে এলেন · '।

আমার শৈশব-কৈশোর-প্রথম যৌবন, বুদ্ধদেবের গল্প-কবিতা-উপন্যাস-প্রবন্ধ-প্লাবিত ঢাকা শহরের সেই দিনগুলি, যারা এখন ছায়া-ছায়া হ'য়ে এসেছে। স্বীকার করতে আদৌ সংকোচ নেই, দুটো পাশাপাশি স্মৃতি আমার মনে একত্র জড়িয়ে আছে : ঢাকা শহরের রাস্তাঘাট-গাছপালা, আরমেনিটোলা স্কুল-জগন্নাথ কলেজ-ঢাকা হল, আমার প্রথম প্রেমিকা, কিন্তু তারই পাশাপাশি 'বন্দীর বন্দনা'-'কঙ্কাবতী'-র সঙ্গে প্রথম প্রণয়ের উতরোল আনন্দ, 'ছুটি যতই কাছে আসতে থাকে, মনের ভিতর একটা গান বেজে ওঠে : 'চলো, চলো' —এ-রকম উজ্জ্বল গদ্যের গহনে রোমন্থনসুখ, 'কবিতা'-তে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলির সংস্কৃত পরিবেশে বেড়িয়ে-আসার প্রদীপ্ত অভিজ্ঞতা। ঢাকা শহরে আর কোনোদিন ফিরে যাবো না, কৈশোরের লীলাসঙ্গিনীরা আজ সবাই-ই প্রৌঢ়ত্বের উপান্তে, এখানে-ওখানে ছিটকে আছেন, রমনা অথবা অর্ফ্যানেজ রোডের সেই ঝাঁকড়া-মাথা উদ্ধতশাখা কৃষ্ণচূড়া গাছগুলির আগুনের কমলারঙও আমার স্মৃতিতে স্তিমিত-নিষ্প্রভ, 'শাপভ্রষ্ট' কবিতাটিও আর প্রথম-থেকে-শেষ পর্যন্ত মুখস্ত বলতে পারি না, 'মন-দেয়া-নেয়া' নামে একটি ছোট্টো উপন্যাস, যা ক্লাস সেভেনে প্রথম পড়েছিলাম, তার নায়ক-নায়িকা পরস্পরকে কী সম্বোধনে ডাকতো তা-ও আর মনে আনতে পারি না। 'আমরা যখন ছোটো ছিলাম, পরিমল, মনে নেই কী হতো?' এই পদ্যের পাশাপাশি 'একটি পরীর গল্প'

মিলিয়ে নিয়ে অপার্থিবলোকে উত্তীর্ণ হবার অলৌকিক সৌভাগ্যের ঋতু বহুদিন শেষ। কিন্তু তাহ'লেও স্মৃতিকে কী ক'রে অস্বীকার করি, কী ক'রে এটা ভুলে থাকি বুদ্ধদেবের তখনকার সমস্ত রচনা আমার উন্মেষের সংগোপনবৃত্তান্তের সঙ্গে জড়ানো? আজ যত দূরেই যাই—বুদ্ধদেব নিজেও যদি বহু দূরে চ'লে যান—অতীতকে এড়ানো অসম্ভব, সে আমাকে তাড়া ক'রে ফিরবে। প্রজ্ঞা থেকে প্রজ্ঞান্তরে আমরা বিহার ক'রে ফিরি, নাবালক চিন্তা-ধারণা ইত্যাদি আস্তে-আস্তে খ'সে পড়ে, কিন্তু পলিমাটি প'ড়েই থাকে, আমার সেই পলিতে ঢাকা শহরের পুঞ্জ-পুঞ্জ রেণুসম্ভার, বুদ্ধদেবের কবিতার কণার ছড়ানো ঐশ্বর্য। যে আমি এখন কবিতার নামে বিবিক্ত বিষাদে ঢ'লে পড়ি, বিরক্তিতে কুঁচকে উঠি, সেই আমাকেও মানতে হয়: আমার চেতনার পরতে-পরতে কবিতার সংবেদনা, এবং সে-সংবেদনার স্পর্শে আমি ধন্য। উন্মেষমুহূর্তে কবিতার পুষ্পবৃষ্টি না-ঘটলে আমি অন্য জীবে পর্যবসিত হতাম। সুতরাং বুদ্ধদেবের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

যতদিন ঢাকা ছিলাম, বুদ্ধদেব-বিভোরতায় কেটেছে। উপরে যা বলেছি, ঢাকা এবং বুদ্ধদেব-উন্মাদনা, আমার স্মৃতিতে দুটো তাই একীভূত। ভালো ক'রে যখন জ্ঞান হ'লো, 'প্রগতি' ততদিনে বন্ধ হ'য়ে গেছে, কিন্তু উজ্জ্বলতার রেশটুকু প'ড়ে আছে ঢাকা শহরে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হলাম, সাহিত্যের বিশ্লেষণশৈলী শেখাতেন মন্মথনাথ ঘোষ-অমলেন্দু বসু, ধনবিজ্ঞানকে প্রায় সাহিত্য ক'রে নিয়ে বোঝাতেন পরিমল রায়। খুব ঘরোয়া পরিবেশ ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, মাস্টারমশাইদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কে এক আশ্চর্য-অদ্ভুত নিবিড়তা; সুতরাং ক্লাসের বাইরেও, সকাল-সন্ধ্যা-ছুটির দিন জুড়ে আমাদের সম্মিলিত সাহিত্যালোচনা, যে-আলোচনার অনেকটা জুড়ে বুদ্ধদেব বসু। পরে দু'শো দুই নম্বরের বাড়িতে বহু সন্ধ্যা আড্ডা দিয়েছি, আপনি-আমি-অরুণকুমার সরকার, সন্ধ্যা রাত্রি হয়েছে, রাত্রি মধ্যরাত্রি হয়েছে, মধ্যরাত্রি গড়িয়ে আকাশের ফিকে হবার উপক্রম, অন্যায় আবদারে প্রতিভা বসুকে বিপর্যস্ত করেছি, অজস্র বিনিময়ের প্রহর গেছে সেই সব, কবিতাভবন থেকে বেরিয়ে রাসবিহারী এভিনিউ-র ট্রাম লাইনের ঘাসে আমাদের আড্ডা ফের জমায়েৎ হয়েছে, রাত হয়তো তখন সাড়ে তিনটে, ট্রাম লাইন থেকে উঠে আমরা হয়তো আরেক-দফা দেশপ্রিয় পার্কের স্তব্ধতাকে দীর্ণ করতে গেছি, কিংবা নিরুপম হয়তো গেছে জারুল পাড়তে কোথাও, আমি এবং আরো-কয়েকজন হয়তো সকাল ছ'টায় আপনার ব্যাল্‌কনিতে লম্বা হ'য়ে শুয়ে এক

সময়ে সত্যি-সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছি, উজ্জ্বল রোদের প্রহারে ঘুম ভেঙে গেছে। এই-যে আড্ডা, সময়-না-মানা, নিয়ম-না-মানা, ভব্যতা-না-মানা আড্ডা, তাতেও তো প্রথম-থেকে-শেষ পর্যন্ত জায়গা জুড়ে বুদ্ধদেব বসু। যে-আড্ডার ঢাকা থেকে শুরু, বহু বছর ধ'রে, সেই একই আড্ডা আমি দিয়ে এসেছি, যার আবরণ-আচ্ছাদন-উন্মোচন-উচ্চারণ সব-কিছু বুদ্ধদেবের কবিতা-প্রবন্ধ-গল্প-সম্পাদনা প্রতিভা-ব্যক্তিত্ব দিয়ে। সেই স্বপ্নময় বছরগুলির সঙ্গে আজ যদি হঠাৎ মুখোমুখি দেখা হ'য়ে যায়, কোন্ সাহসের নির্ভরে আমি অন্যদিকে ঘাড় ফেরাবো তাহ'লে?

অথচ, কোনোরকম পাপবোধও নেই আমার। আপনার চিঠিতে অনুশোচনা ছিল: হায়, বুদ্ধদেবকে সম্মানজ্ঞাপনার্থ যে-প্রবন্ধসংগ্রহের পরিকল্পনা এবছর শেষ পর্যন্ত বাস্তবে রূপ পেলো, তা কেন দশ বছর, অথবা কুড়ি বছর, আগে আমরা উদ্যোগ করিনি। এই অনুশোচনায় আমার সায় নেই। বুদ্ধদেবকে যা দেয়, এক সময়ে আমরা হয়তো একটু বেশি পরিমাণেই দিয়েছি: আমাদের শ্রদ্ধা, আমাদের ভক্তি, আমাদের অভিভূত অনুরাগ। একবার তাকিয়ে দেখুন হালের তরুণদের দিকে: পূর্বসূরীদের নিয়ে তাদের মাথা-ঘামানো নেই। ঐতিহ্যকে তাঁরা স্বতঃসিদ্ধ হিশেবে ধ'রে নিয়েছেন, ঐতিহ্যের ইতিহাসে তাঁরা আগ্রহহীন। তাঁরা একমাত্র নিজেদেরই চেনেন, জানেন, পছন্দ করেন, তাঁদের পত্রিকায় শুধু পরস্পরকে নিয়ে আলোচনা, এক কিংবা দেড় দশক আগে যে কবিরা স্পন্দিত হচ্ছিলেন, তাঁদের ব্যথাবেদনারূপকউপমা নিয়ে আলাপের বিলাসিতা নেই। ১৯৪৭-৪৮ সালে ফিরে গিয়ে নিজেদের কথা ভাবুন: নরেশ গুহ-কে নিয়ে অরুণকুমার সরকার প্রবন্ধ ফাঁদেননি কোনোদিন, অরুণকুমার সরকারকে নিয়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে নিয়ে নরেশ গুহ। সমর্পিত সম্ভ্রমের যুগ গেছে সেটা: আমরা আলোচনা করেছি বুদ্ধদেব বসু-বিষ্ণু দেকে নিয়ে, আমাদের তর্ক গড়িয়েছে সুধীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দের প্রদাহপ্রজ্ঞাআনন্দ নিয়ে। বাংলা সাহিত্যে এ-রকম আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত আর কোন্ যুগে খুঁজে পাবেন? নিজেদের সম্পূর্ণ বিলীন ক'রে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত কবিদের তর্পণ, নিজেদের প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ রুচিচিন্তাগর্হিত। বুদ্ধদেবরা ষাট পেরোলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আমরাও তো বুড়িয়ে গেলাম, প্রৌঢ়ত্বের যূপকাষ্ঠে দাঁড়িয়ে অরুণকুমার সরকার-বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-নরেশ গুহরা কী সান্ত্বনায় এখন স্থিত হ'তে পারছেন?

না, দেওয়া হ'লো না যে আপনাকে, সে-রকম পরিশীলিত ব্যথা মনে লাগার আদৌ উপলক্ষ নেই। রাখি-ঢাকিনি, আমরা নিজেদের নিঃস্ব ক'রে দিয়েছি, সুতরাং যেন কোনো গ্লানি না-লেগে থাকে। গ্লানি নয়, অপরাধবোধ নয়, আমার মন ছাপিয়ে যা তা দুঃখ। আমার অন্তত, স্মৃতি ছাড়া অন্য-কোনো আশ্রয়ই নেই: এই রিক্ততার দুঃখ। আমরা কেউ-ই এক জায়গায় স্থিত থাকি না, সম্ভবত থাকা উচিতও নয়। স্থিতি মানেই তো মৃত্যু; যেহেতু প্রত্যেকেরই আমাদের স্বতন্ত্র চেতনার অধিকার, আমরা আলাদা হ'য়ে ভাবি, আলাদা হ'য়ে এগোই। আমি এখন যে-পৃথিবীতে, তার মানসতা হয়তো বুদ্ধদেবের ন্যক্কার উদ্রেক করবে; বুদ্ধদেবের চিন্তার বর্তমানে যে-পরিমণ্ডল, আমার কাছেও হয়তো তা সমান অস্বস্তিকর। এখনো মাঝে-মাঝে, যখন কয়েক সপ্তাহের জন্য কুহকিনী কলকাতার অতিথি হই, ইচ্ছে হয় পুরোনো কবিতাভবন না-ই থাকলো, সবাইকে জুটিয়ে তাহ'লেও চ'লেই না-হয় যাই সেই পল্লীপ্রান্তে, হৈ-হৈ ক'রে কিছুটা আড্ডা দিয়ে আসি, বুদ্ধদেবকে রূঢ় ক-টা কথা শুনিয়ে আসি, যে-কথা শুনে ভদ্রলোক উত্তেজিত হবেন, আমাদের দুর্বিনয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানে চেঁচাবেন, কিন্তু খেয়াল ক'রে যে এতদূর গেলাম দেখা করতে, তাতে খুশিও হবেন খুব। কিন্তু হয় না, কোথাও থেকে জড়তার আড়াল নামে, ভয়, কী হবে গিয়ে, হয়তো প্রসঙ্গক্রমে কোনো অপ্রিয় বিষয়ে পৌঁছবো, হয়তো যা তাঁর প্রাপ্য নয় এমন অন্যায়-অসঙ্গত কতিপয় কটূক্তি ক'রে বসবো, হয়তো আবহাওয়া ঘন হবে, হয়তো অনুশোচনায় তারপর জ্বলবো, পুড়বো। তার চেয়ে দূরে থাকা ভালো, স্মৃতিকে সম্বল ক'রে, ক্বচিৎ-কখনো ঢাকা শহরে ফিরে-যাওয়া, আমার প্রথম প্রেমিকার মুখ, শাড়ির যে-রঙ তার সবচেয়ে প্রিয় ছিল সেই রঙ হুবহু মনে আনবার চেষ্টা, আর বুদ্ধদেবের অজস্র অপরিমিত কবিতা, যে-কবিতার বন্যায় ডুবে মুছে একদা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গিয়েছিলাম।

দেশভাগের পর বাংলাদেশ থেকে—অন্তত এদিককার বাংলাদেশ থেকে—মফস্বল অবলুপ্ত। কলকাতা পেরিয়ে পশ্চিম বাংলায় নগর এবং-পল্লীর মাঝামাঝি অবস্থানের লক্ষণযুক্ত অন্য কোনো সত্তা নেই, কলকাতা পেরিয়ে হয় দুর্গাপুর-বার্নপুরের অশ্লীল ঘড়ঘড়ানি, নয়তো শ্যাওড়াফুলি-কোন্নগরের কোটর-হাঁ-করা জীর্ণতা। অন্যদিকে, সীমানার ঐ প্রান্তে, আমার শৈশবের মফস্বলের-মদিরতা-জড়ানো ঢাকাও রাজধানীর শরীরে হারিয়ে গেছে; হয়তো খুলনা কিংবা

চট্টগ্রামে, রাজশাহী অথবা বগুড়ায় মফস্বল এখনো বেঁচে আছে, কিন্তু তার খবর আমার কানে পৌঁছয় না। সুতরাং আমার কাছে মফস্বল মানেই দুই মহাযুদ্ধ-মধ্যবর্তী ঢাকা শহর, যে-শহরে 'গা ঘেঁষে মেয়েরা চলে, ফেলে যায় গায়ের সুবাস'। শান্ত মফস্বল, সীমিত মফস্বল, যেখানে সবাই সবাইকে চেনে, ছোটো-ছোটো একটি পাড়া যেখানে ঘরোয়া সুষমায় সমাহিত। দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সেই ঋতুতে এই বাংলাদেশেই বেকারসমস্যা তীব্র হ'য়ে দেখা দিয়েছিল, আমাদেরই পিতামহপিতাপিতৃব্যকুল শোষণে-পীড়নে মুসলমান প্রজাদের জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিলেন, ধান-পাটের দাম নামতে নামতে প্রায় তুচ্ছতায় গিয়ে পৌঁছেছিল, পল্লী অঞ্চলে থমথমে নিহিত অশান্তির মধ্যেই দেশভাগের সূচনা ঠিক সেই ঋতুতেই লিপিবদ্ধ হচ্ছিল। এ-সমস্তই মানি, না-মেনে উপায় নেই, ইতিহাসের সঙ্গে রসিকতা চলে না। কিন্তু তা ব'লে জীবনানন্দ দাশের বরিশাল, বুদ্ধদেব বসুর ঢাকা, টলোমলো ভরাবুক মফস্বল, মিথ্যে হবার নয়। 'কখনো সে হাত ছুঁই যদি, তবু জানিব না / এই সেই হাত' এমন পংক্তি ঐ মফস্বলকে বাদ দিয়ে কল্পনা করা যায় না, বাংলাদেশের মফস্বল না-থাকলে এমন কবিতা কখনো লেখা হ'তো না। অথচ, কোনো বিকল্পপ্রস্থান নেই, ইতিহাস এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবার নয়, এমন কি ভূগোলও ব'দলে যাচ্ছে অহরহ। আমাদের প্রকৃতি ব'দলে যাচ্ছে, আমাদের আচরণে অন্য নদীর হাওয়ার উচ্ছ্বাস। পৃথিবীটা হঠাৎ মস্ত বড় হ'য়ে গেছে, তাই আমি, অশোক মিত্র, ছিটকে একদিকে, আমার কৈশোরস্বপ্নের, প্রথম প্রেমের ঢাকা কুয়াশায় ঢাকা পড়লো, বুদ্ধদেব বসুর জগৎ ভীষণরকম তফাৎ হ'য়ে গেলো। এই ভয়ঙ্কর ঘটনাপাতে আমি স্তম্ভিত, আমার কণ্ঠ-পর্যন্ত-উঠে-আসা শোকাকুল কান্না। কিন্তু এ কান্নার কোনো ভাষা নেই। ঢাকার মৃত্যু ঘটেছে, আমার মৃত্যু ঘটেছে, বুদ্ধদেব বসুর গত আট-দশ বছরে যা-যা লিখেছেন, আমার উপলব্ধির বাইরে সে-সমস্ত রচনার হৃদয়তা। অথচ যুবক সমর সেনের বুলি আত্মসাৎ ক'রে নিজেকে নিয়ে রঙ্গ পর্যন্ত করতে পারছি না : স্তব্ধ রাত্রে তুমি কেন বাইরে যাও?

সুতরাং আপনার কাছে, অরুণকুমার সরকারের কাছে, মার্জনাভিক্ষা করছি : বুদ্ধদেবের উপর আমার পক্ষে কোনো-কিছু লেখা সম্ভব নয়। আমার স্মৃতিকে আমি কবর দিতে চাই। ইতি—

কবিকাহিনী

'মহাভারতের কথা' অসমাপ্ত রইলো, যে-জীবনকাহিনী গত দু-তিন বছর ধ'রে গুচ্ছ-গুচ্ছ ক'রে লেখা হচ্ছিল, তাও সম্পূর্ণ হলো না। বুদ্ধদেব বসুর দেহান্তরের শোকাবেশেও এই দুই আক্ষেপ সবচেয়ে তীব্র হয়ে বিদ্ধ করবে। প্রত্যন্ত, এবং প্রত্যন্তে পৌঁছুবার ইতিকথা, দুই-ই শিলালিপির বাইরে থেকে গেলো; বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের পক্ষে এই ক্ষতির কোনো পরিমাপ নেই। বুদ্ধদেব বসুর মানসিকতা, চিন্তা, ভাষ্য সব-কিছুই 'মহাভারতের কথা'য় এক পরমবিন্দুতে পৌঁছবার উপক্রম করছিল: কিন্তু শেষ শীর্ষে পৌঁছনো গেলো না, তার আগেই, নিয়তিলিখন, দরজায় ধাক্কা পড়লো। যে-বিচিত্র অভিজ্ঞতা-ইতিহাসের মধ্য দিয়ে চঙ্ক্রমণ করে অবশেষে সায়ংসময়ে বুদ্ধদেব বসু উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, সে-কাহিনীও সঙ্গে-সঙ্গে ব্যক্ত করছিলেন তিনি, একটু-একটু ক'রে, স্মৃতিকে সন্তর্পণে লালন ক'রে নিয়ে, আশ্চর্য সুখ-দায়িকা ভাষায়। তা-ও অসম্পূর্ণ থেকে গেলো।

এখন কিছুদিন জল ঘোলা থাকবে। আমাদের সাম্প্রতিক ঐতিহ্যে যা প্রধান ত্রুটি, নতুন ক'রে তার পরিচয় পেতে থাকবো সবাই। জীবনানন্দ দাশ জীবদ্দশায় প্রায়-অনালোচিত থেকেছেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশাল-মহান সৃষ্টিকর্ম নিয়ে তন্নিষ্ঠ আলাপ-আলোচনা হালেই যা শুরু হয়েছে। যদিও বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে, সেই পাঁচ দশক আগে থেকেই, তর্কের ঝড় উঠেছে প্রচুর, কিন্তু তাঁর রচনাদির বিশুদ্ধ, আবেগরহিত সাহিত্যবিচার আদৌ হয়নি। এখনও, তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পর, প্রধানত যে-ধরনের আলোচনা হচ্ছে, হবে, তা টীকা-টিপ্পনী গোছের, অনেকটাই প্রায় সামাজিক কর্তব্যবোধের তাড়নায়। এবং এই

আলোচনায়, ধ'রেই নেওয়া যায়, ফের আবেগাধিক্য ঘটবে : বুদ্ধদেব বসু যেহেতু আমৃত্যু বিতর্কিত পুরুষ ছিলেন, প্রতিদ্বন্দ্বী দুই শিবির আগে থেকেই তৈরি ছিল, তাঁর সাহিত্যকীর্তির বিশ্লেষণে শিবিরভুক্ত ব্যক্তিরা তাঁদের অভ্যস্ত অভিমতগুলিই আরেক প্রস্থ পরিবেষণ করবেন, যে-যে আবেগগুলি তাঁদের পরিচয়সিক্ত, নতুন ক'রে তাদের ধারাজলে স্নান ক'রে নেবেন, ক'রে নিয়ে ভারি তৃপ্ত বোধ করবেন। এই মুহূর্তে এরকম হওয়াই স্বাভাবিক। বরাবরই, চিন্তার চেয়ে ঐতিহ্যাশ্রয়ের দিকে আমাদের আসক্তি।

বুদ্ধদেব বসুর প্রতি অথচ যদি যথাযথ কর্তব্য করতে হয়, তা হ'লে ছকের নিগড় থেকে বেরোনো প্রয়োজন। তাঁর সাম্প্রতিক মতাদর্শকে যাঁরা গভীরভাবে পছন্দ করতেন, তাঁদের দিক থেকে যেমন প্রয়োজন, বিশেষ ক'রে তাঁর মতামতের জন্যই বিগত পঁচিশ বছর তাঁকে যাঁরা দুয়ো দিয়ে আসছিলেন, তাঁদেরও তেমনি। বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর জন্য যে-স্থান নির্ধারিত থাকবে, তা কদাপি তাঁর মতাদর্শের জন্য নয় ; মতাদর্শ ছাপিয়ে, মতাদর্শ পাশে সরিয়ে রেখে তাঁর সৃজনপ্রতিভার যে-বিকচন, ভবিষ্যতের পাঠক সে-দিকেই মনোযোগ দেবে। আবার উল্টো ক'রে এটাও তাই বলতে হয়, বুদ্ধদেব বসুর জীবনাদর্শ যদি ঘোর প্রতিক্রিয়াশ্রয়ী বলে আপনার-আমার কাছে মনে হয়, তা হ'লেও তাঁর বিরাট সৃষ্টিকর্মকে অস্বীকার করবো কোন্ অধিকারে ? ইতিহাসকে ইচ্ছেমতো কেটে-বাদ দিয়ে বিশ্লেষণ হয় না, বুদ্ধদেব বসুর মতামত যেহেতু অপছন্দ করি, অতএব তাঁর প্রতিভাকে আদৌ আমল দেবো না এই যুক্তি মারাত্মক, এ-কারণে মারাত্মক যে তা আত্মপ্রতারণার সামিল। নিজের মনকে চোখ ঠারলে আর যা-ই হোক, ইতিহাসের বিশ্লেষক হওয়া সম্ভব নয়।

কারণ, মানতেই হয়, রবীন্দ্রনাথের পর এমন সৃষ্টিশীল পুরুষ বাংলা সাহিত্যে আর আবির্ভূত হননি। বিচ্ছিন্ন বিচার নয়, সমস্ত-কিছু মিলিয়ে দেখুন। কাব্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পর প্রধান পুরুষ অবশ্যই বুদ্ধদেব বসু নন, জীবনানন্দ দাশ ; উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভা—স্বভাবপ্রতিভা—যে-কারো ধরাছোঁয়ার বাইরে ; ছোটোগল্পে শরৎচন্দ্র তো আছেনই, তাছাড়া তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রেমেন্দ্র মিত্রও হয়তো বুদ্ধদেব বসুকে ছাড়িয়ে গেছেন। কিন্তু সাহিত্যের আরো যে বিস্তৃত প্রান্তর প'ড়ে আছে, সেখানে বুদ্ধদেবের একচ্ছত্র অধিকার সম্বন্ধে দ্বিমত থাকতে পারে না। প্রবন্ধে অন্নদাশঙ্কর

রায়ও প্রচুর লিখেছেন, কিন্তু বুদ্ধদেবের ব্যাপ্তি আরো অনেক প্রসারিত আয়তন জুড়ে। সাহিত্যালোচনায় বুদ্ধদেব বসুর স্থাপিত আদর্শ আজ পর্যন্ত শীর্ষশৃঙ্গে। সেই সঙ্গে মনে করুন শিশুসাহিত্য-কিশোরসাহিত্যে তাঁর অপরিমেয় কীর্তি। সবশেষে, অথবা হয়তো সর্বপ্রথমেই, কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে হয় তাঁর সম্পাদনা-আদর্শ। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হবে, বাংলা সাহিত্যে পলিমাটির উপর নতুন পলিমাটির আস্তরণ পড়বে, কোথাও ভাঙন দেখা দেবে, কোথাও নবশ্যামলিমার প্রলেপ পড়বে, কিন্তু যা আবহমান কাল ধ'রে টিঁকে থাকবে তা 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদনা-ঐতিহ্যের স্মৃতি। নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, শ্রদ্ধা, প্রেম, অবৈকল্য, নানা কষ্টিপাথরেই সম্পাদনার মান বিচার করা চলে। বুদ্ধদেব বসু সবক'টি নিরীক্ষাই মহৎ সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হবেন, এটুকু বলা আদৌ যথেষ্ট হলো না, আরো অনেক-অনেক বলতে হয়। কারণ, 'কবিতা' পত্রিকা, এবং তাঁর সম্পাদনা, যদি বাংলা সাহিত্যের গত অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসে উহ্য থাকতো, তা হ'লে, সন্দেহ হয়, বাংলা কাব্য এখনো 'ক্ষণিকা'-'পূরবী'-ছোঁওয়া কোনো প্রথাগত পৌনঃপুনিক পরিবেশে আবদ্ধ থেকে যেত, বাংলা গদ্যালোচনা 'প্রবাসী'-'ভারতবর্ষে'র ব্যাকরণগত নিগড়ে নিহিত থাকতো, বাঙালির সাহিত্যরুচি-তথা-চেতনা সমকালীন পৃথিবীর সঙ্গে সাযুজ্যবন্ধন-আবিষ্কারে অসমর্থ হতো। এই ক্ষেত্রে যে-বিপ্লব ঘটেছে, তার সূচনায় 'পরিচয়' ইত্যাদি অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকার প্রয়াস আমি অস্বীকার করছি না; বুদ্ধদেব বসুর অনবচ্ছিন্ন সম্পাদনাসাধনা তা হ'লেও অতুলনীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। সাহিত্যের মান ও আদর্শকে 'কবিতা' পত্রিকা হঠাৎ বেশ কয়েক-যোজন এক ধাক্কায় এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, যার প্রভাব অচিরে চারপাশে সংক্রামিত হলো; যা ঘটলো তা রুচির শ্রেণীগত রূপান্তর, ইতিহাসের এক সোপান থেকে বহু উঁচু আরো-এক সোপানে অবলীলায় ডিঙিয়ে পৌঁছনো। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদনা, অথবা রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা'-সম্পাদনা, সমকালীন সাহিত্যচিন্তায় যে-আলোড়ন তুলেছিল, বুদ্ধদেবের 'কবিতা'-কীর্তি তার অন্তত সমপর্যায়ের, কিংবা সম্ভবত শ্রেষ্ঠতর। কবিতাকে সাহিত্যসৃষ্টির পুরোভাগে উপস্থাপন করার মতো স্পষ্ট সাহসের উন্মোচন, পঁচিশ বছর ধ'রে সেই সাহসের জয়গানঘোষণা, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের যুগে অভাবিত ছিল, হয়তো তার পরেও অভাবিত থেকে যেত, যদি-না বুদ্ধদেব বসু তাঁর উত্তমকল্পনার ঘোড়সওয়ারে দুঃসাহসী উদ্দামতার জিন চড়াতেন।

ইতিহাসের প্রাগ্রসরতায় আস্থা যাঁরা রাখেন, তাঁরা আবেগের বশে এই তথ্য-গুলি বিস্মৃত হ'লে ইতিহাসকেই অপমান করবেন। অন্যদিকে যে-উগ্রপন্থীরা তথাকথিত মানবিকতাপন্থী রাজনীতির স্বার্থসিদ্ধিতে বুদ্ধদেবের সমস্ত ক্রিয়াকর্মকে ব্যবহার করতে চাইবেন, তাঁদের আচরণও সমান অসমর্থনীয়। বিচারে মূল্যবোধের স্থান অবশ্যই আছে, কপটতার আদৌ নেই। বুদ্ধদেবের রচনা শৈলীসর্বস্ব, তাঁর বক্তব্য নিঃসার, স্থানে-স্থানে প্রতিক্রিয়ালগ্ন, অতএব তিনি ইতিহাসের বিচারে অপাংক্তেয়, এই যুক্তি সর্বনেশেরকম দুর্বল। বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ এড়াবার কোনো উপায় নেই এখানে। এমনকি যদি মেনেও নেওয়া যায়, শৈলীর বাইরে বুদ্ধদেবের যা-যা সৃষ্টিকর্ম, তারা কালের বিচারে টিঁকবে না, তা হ'লে সঙ্গে-সঙ্গে এটাও বলতে হয়; স্রেফ শৈলীর চমৎকারিত্বে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর চত্বরে একদা জড়ো হয়েছিলেন বহু-বহু প্রতিভাবান, যাঁদের কীর্তি শৈলীকে ছাপিয়ে-ছাড়িয়ে। কোরক এবং অন্তর্লীন-শাঁসের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত, কিন্তু যে-ব্যক্তি একদা 'কতদিন মনে-মনে করেছি শপথ : ঘৃণারে করি না ঘৃণা'-র মতো অবিস্মরণীয় পংক্তি লিখতে পেরেছিলেন, তাঁকে তাঁর পরবর্তীকালীন বিচ্যুতির জন্য সম্পূর্ণ বরবাদ করে দেওয়া ঘোর ইতিহাসবিরোধী আচরণ। কারো-কারো মূল্যমানে পদ্ধতিটিকে যন্ত্রণাদায়ক ঠেকলেও, বুদ্ধদেব বসুকে বিচার করতে হবে তাঁর সমগ্র সাহিত্যসত্তার অভিজ্ঞানের সাহায্যে। যাঁরা তা করছেন না, মুখস্থ ব্যাকরণের ছকে দু-কথায় অন্তিম রায় লিখছেন, তাঁরা আসলে ইতিহাসের সঙ্গে তঞ্চকতা করছেন। কিন্তু ইতিহাস তো ভোলে না, ঠগদের চিনে রাখে।

অথচ বিরুদ্ধপক্ষেও সমান চতুরালি। বুদ্ধদেব বসুর সৃষ্টিকর্ম একটি প্রবাহ, কোনো মধ্যবর্তী লগ্নের মুহূর্ত থেকে তার সালতামামি শুরু করা মস্ত অসাধুতা। তার সায়াহ্নবেলায় বুদ্ধদেব এক বিশেষ জীবনদর্শন বেছেছিলেন। তাঁর সামগ্রিক রচনায় একমাত্র সেই জীবনদর্শনেরই প্রতিভাস, এমন বললে অন্যায় অতিরঞ্জন হয়, বুদ্ধদেবের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের ব্যাপ্তিকে সংকুচিত ক'রে আনা হয়। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধ'রে, বুদ্ধদেবের আত্মপ্রকাশের সেই প্রথম পর্ব থেকেই, বহু পাঠক ছিলেন এবং আছেন, যাঁরা বুদ্ধদেব-কর্তৃক উচ্চারিত দর্শন বা তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাননি, অথচ তাঁর রচনা সম্বন্ধে তাঁদের মুগ্ধতাবোধ অব্যাহত থেকেছে। কারো-কারো কাছে বুদ্ধদেবের যে-কোনো অধ্যায়ের রচনাগত ভাবোচ্ছ্বাস তরল ঠেকেছে, অন্য-কারো কাছে মনে হয়েছে তাঁর দার্শনিকচিন্তা বালখিল্য কপচানির সামিল, কেউ বা হয়তো

সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন ক্ষুরধার নদী অনেক ক্ষেত্রে যেমন প্রবাহে অচঞ্চল থাকতে অপারগ, বুদ্ধদেবের সেই দশা : প্রতিনিয়ত বাঁক নিচ্ছেন এদিকে-ওদিকে, আবেগের বন্যায় কখনো ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এই প্রান্তের জনপদ, পরমুহূর্তেই হয়তো অন্যমনা হয়ে প্রতীপপ্রবাহ, ভেসে গেলেন সম্পূর্ণ অভাবনীয় কোনো গতির উদ্দেশে। এরই মধ্যে, এই এতগুলি যুগ ধ'রে অথচ যা অবিকল-নিটোল থেকেছে তা তাঁর কাব্যবোধ, ভাষার প্রতি মমতা, শব্দসৌকর্য সম্বন্ধে নিষ্ঠা, সাহিত্যকলার প্রতিটি অঙ্গ-উদ্দিষ্ট ভাবনা-ডুবোনো প্রেম। সুতরাং কেউ যেন বুদ্ধদেব বসুকে রাজনীতির অস্ত্র হিশেবে ব্যবহার করতে না যান। সেটা এক দিক থেকে যেমন অযৌক্তিক, অন্যদিকে তেমনই আত্মঘাতী ব্যাপার হ'তে বাধ্য : কারণ তাঁর এক পর্যায়ের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আরেক পর্যায়ের রচনাকে ঘায়েল করার খেলাটি অত্যন্ত সহজসাধ্য। এ-ধরনের চেষ্টা অন্য-এক অর্থেও আত্মঘাতী, কারণ তা আমাদের মনকে বিচ্যুত করবে বুদ্ধদেবের রচনার সারাৎসার থেকে, ভাষার প্রতি, কবিতার প্রতি, শব্দের জাদুমন্ত্রিত কুহকের প্রতি যে বিরাট-বিশাল প্রেম তাঁর সমগ্র সৃষ্টিপ্রয়াসে ছড়ানো-ছিটোনো-জড়ানো, তা থেকে। মূল্যবোধের বিচারে যাঁরা ঘোরতর বুদ্ধদেবভক্ত, এমনকি তাঁরাও তো তা চান না। যাঁরা নিজেদের বুদ্ধদেব অনুগামী ব'লে গর্ব করেন, তাঁরা কেন মোহান্ধ প্রবাহে এই ঐতিহাসিক অবিচারে লিপ্ত হবেন ?

ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকগতিতে আমি আস্থা রাখি। সেই আস্থায় নির্ভর ক'রেই বলছি, বাংলা সাহিত্য তথা সংস্কৃতির পটভূমিতে বুদ্ধদেব বসুর সংস্থান-নির্ণয়ে তাঁর ব্যক্তিগত দর্শনের তেমন উপযোগিতা নেই, দর্শন যদি সতত-পরিবর্তনশীল না-ও হতো, তা হ'লেও থাকতো না। কারণ এই দর্শন-উপলব্ধি, ইতিহাসের নিয়মেই, ঘটনাপরম্পরার ব্যাপার।

হেঁয়ালি করছি না। আমার উক্তির মূল প্রতিপাদ্য সামান্য দুটো কথাতেই স্পষ্ট করা সম্ভব। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বুদ্ধদেব বসু বিংশ শতকের প্রথম দশকে, একই বছরে, প্রায়-হুবহু এক সামাজিক পরিবেশে জন্মেছিলেন, হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারে, মাতাপিতৃপুরুষ পূর্ববঙ্গীয়, আরো একটু বিশদ হ'তে গেলে এই তথ্যও পরিবেষণ করতে হয় যে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার উত্তরাধিকার তাঁদের দুজনেরই চেতনার-ধমনীর প্রবাহে। বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের বিংশ শতকের প্রথমার্ধের দায়ভাগ তাই তাঁদের জন্মের ইতিহাসে বিধৃত। ভূমিস্বত্ব-

ভোগী বাঙালি, উচ্চবর্ণীয় হিন্দু, কিন্তু বহিরাবহ অহরহ বদলে যাচ্ছে—বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-স্বাদেশিকতা, প্রথম মহাযুদ্ধ, অসহযোগ আন্দোলন-ভাবুকতা, ইংরেজি ভাষার প্রসাদলব্ধ উদারতর চিন্তার পরিমণ্ডল, তিরিশের দশকে বিশেষ ক'রে হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীর উৎকীর্ণ বেকারসমস্যা; অন্যদিকে পল্লী বাঙলায় নতুন আলোড়ন, নাগরিক নানা দ্বান্দ্বিকতার পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে প্রজাপীড়ন, এই পীড়নহেতু নতুন আবর্তের সঞ্চার, দেশভাগ, শরণার্থীপ্লাবন, হিন্দু মধ্যবিত্তের চরম সংকট-প্রলয়ক্রান্তির লগ্ন, যার জের এখনো চলছে। জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে, কিন্তু জীবনধারা যেখানে ইতিহাসের চাপে বহুবিচূর্ণ, সেখানে চেতনা নিছক একটিমাত্র খাতেই প্রবাহিত হবার নয়। বস্তুত বিগত তিরিশ-চল্লিশ বছর বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের পক্ষে আরক্ততম ঋতু: অনেক উথালপাথাল, অনেক টানাপোড়েন, অনেক পরস্পরবিরোধী চিন্তারআবেগেরস্বার্থেরস্বপ্নের আলোড়ন, অনেক আশাভঙ্গ—সেই সঙ্গে অনেক নতুন নেশায়-পাওয়া, অনেক লাঞ্ছনা-তিক্ততাবোধ, কিন্তু পাশাপাশি নানা বর্ণের অনেক নতুন মোহও। যে-কোনো দেশে, যে-কোনো ক্রান্তির লগ্নে চেতনাকে এরকম যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হ'তে হয়, অপ্রতিরোধ্য এই যুদ্ধ। সময়কে যদি আয়ত্ত ক'রে আনা যায়, ভূতচৈতন্যবাদের প্রক্রিয়াকে যদি সম্পূর্ণতমরূপে বিকশিত হবার সুযোগ দেওয়া হয়, তা হ'লে এই যুদ্ধ বিশেষ-এক উপসংহারে না-পৌঁছে পারে না। কিন্তু তা তো অন্তিম ফলাফল। ইতিমধ্যে, যতদিন আবেগেরচিন্তারদ্বন্দ্বেরসংশয়ের সমরলীলা অব্যাহত, ইতস্তত বহু ঘটনাসম্পাত ঘটবে, কেউ এদিকে হেলে পড়বেন, কেউ ওদিকে। এই ভবিতব্য মধ্যবিত্ত উত্তরাধিকারের ললাটলিখন: একই সময়ে, সমান্তরাল অথবা আড়াআড়ি, মধ্যবিত্ত মানসিকতায় অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন দ্যুতি বিকিরিত হয়, যে-কোনো ঋতুতেই হয়, রক্তাক্ত-অশান্ত ক্রান্তির যুগে তো কথাই নেই। শেষ পর্যন্ত, কার চেতনার নৌকো ঠিক কোথায় গিয়ে ভেড়ে তা বেশ-খানিকটা আকস্মিকতার ব্যাপার, কোনো বিশেষ মুহূর্তনিচয়ের পরিবেশের প্রভাবের ব্যাপার। ইতিহাসের নিয়ম কাজ করছে, মধ্যবিত্তের অস্থিরচঞ্চলউদ্বেল চেতনায় কারুকার্য সাধন ক'রে যাচ্ছে, কিন্তু এই ভাস্কর্য সব ক্ষেত্রে এক হয় না, হ'তে পারে না, এবং তার কারণও ইতিহাস-সম্মত। ইতিহাসের বিচারে বৃহৎ সমাজপ্রবাহ যেমন ধ্রুব, কোনো ব্যক্তির মানসিকতা বিবর্তনের ইতিকথায় আকস্মিকতার সংস্থান প্রায় ততটাই ধ্রুব। এই আকস্মিকতার ঝঞ্ঝায় তাড়িত হয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁর বিরাট সৃষ্টি-প্রতিভাকে আপাত-নিরাসক্ত, আপাত-নির্লিপ্ত, অথচ গভীর মমতাঠাসা ইতিহাসের প্রয়োজনে নিযুক্ত করেন। অন্যপক্ষে, ঐ একই আকস্মিকতার ফেরে, বুদ্ধদেব বসু সংগোপন আতঙ্কে শিহরিত হয়ে ফিরে যান গ্রন্থাগারের অন্ধকার সুড়ঙ্গে, জনজীবনের রূঢ়-বাস্তব উদ্‌ঘাটনকে ছাই-চাপা দিয়ে, নিছক কথাকে, শব্দকে, ধ্বনি-তরঙ্গকে অবলম্বন ক'রে বেঁচে থাকার বিস্ফারিত দুঃসাহস নিয়ে নিজেতে নিমগ্ন হয়ে পড়েন। অথচ দুজনেই কিন্তু ইতিহাসের নিয়ম মানছেন ; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বুদ্ধদেব বসুর যুগ্ম উদাহরণের নজির অতীতের পাতা ঘাঁটলেও হাজার জায়গায় খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

যেহেতু ইতিহাস তার পূর্বনির্ধারিত খাতে বয়ে চলেছে, সুতরাং সমাজসংস্থিত ব্যক্তিরা স্রেফ অনড়, স্থাবর শালগ্রামশিলা, তা নয়। ইতিহাসে আমার-আপনার স্থান কোথায়, তার বিচার তথা সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত আমার-আপনার উপরই ন্যস্ত। আমরা, সমাজের অন্তর্ভুক্ত অগণ্য-অসংখ্য ব্যক্তিরা, বিশ্লেষণ করি, নিজেদের পছন্দ-অপছন্দ ব্যক্ত করি, বাছাই করি। যিনি বিত্তহীন শ্রমজীবী, বাছাইয়ের অধিকার তাঁর পক্ষে সীমিত ; এ-ও বোধহয় বাড়িয়ে বলা হলো, আসলে শূন্য। শ্রমজীবীর বিত্ত নেই, উপচার নেই, আলাদা অস্ত্র নেই, তাঁর একমাত্র তূণ সংঘবদ্ধতা, অপর-অপর শ্রমজীবীর সঙ্গে জোট-বাঁধা : হয় সমস্ত শ্রমজীবী পরস্পরের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ইতিহাসের গতিকে ক্ষিপ্রতর করার জন্য এগিয়ে যাবেন, নয় তাঁরা আপাতত মুখ থুবড়ে প'ড়ে থাকবেন, এর বাইরে তাঁদের কোনো বিকল্প প্রস্থান নেই। মধ্যবিত্তের আছে, থাকে : মধ্যবিত্ত এদিকে হেলতে পারেন, ওদিকে ; তিনি বিত্তহীনদের দিকে এগিয়ে এসে ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক জয়যাত্রার প্রতি আনুগত্য জানাতে পারেন, বিতৃষ্ণায়-অবহেলায় মুখ ঘুরিয়ে উল্টোদিকে হেঁটে রওনা দিতে পারেন, অথবা, বিভ্রান্ত-বিহ্বল মানসিকতায় দীর্ণ হয়ে, স্তম্ভিত প্রত্যয়ে নিজের একান্ত গুহায় কোনো নিভৃততর নির্জনতার অন্বেষণ করতে পারেন। যে-কোনো মধ্যবিত্তকেই, বিশেষ ক'রে ক্রান্তির মুহূর্তে, এই বাছাইয়ের কাজে লিপ্ত হতে হয়, এই কর্তব্য থেকে রেহাই নেই : সে-মধ্যবিত্ত যদি সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী হন, তা হ'লে তো আরো নেই।

বুদ্ধদেব বসু যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, তা নিয়ে নতুন ক'রে তর্ক জুড়ে লাভ নেই। সেই সিদ্ধান্তহেতু নিন্দা কিংবা সাধুবাদ, দুটোই তিনি যথাযথ কুড়িয়েছেন, যথেষ্ট সময় ভ'রেই কুড়িয়েছেন। বিগতকাহিনী নিয়ে চর্বিতচর্বণ

এখন অর্থহীন, অকর্মার্হ সময়ক্ষেপণ। উক্ত প্রসঙ্গ উপস্থিত উহ্য রাখাই শ্রেয়। বুদ্ধদেব বসু তাঁর সৃষ্টির ধারাকে যে-প্রান্তরপ্রান্তে সযত্ন-প্রহরায় রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গেলেন. ইতিহাসধারা তাতে আদৌ হতচকিত হলো না; এমনটা যে হ'তে পারে, ইতিহাসে তার পূর্বসাক্ষ্য আছে। এই সত্যটি মেনে নিয়ে অতএব তাঁর প্রতিভার বিশ্লেষণ ও বিচার প্রয়োজন; যাঁরা তা না-ক'রে তাঁকে অবজ্ঞায় পাশ কাটিয়ে যেতে চাইবেন, অন্যদিকে যাঁরা বড়াই করবেন বুদ্ধদেব বসু প্রগতির প্রক্রিয়াকে আদৌ তোয়াক্কা না-ক'রে, সামাজিক আচার-অনুশাসন সুতীব্র সচেতনতার সঙ্গে অবহেলা ক'রে, ইতিহাসকে নিষ্ঠুর, কিন্তু নির্ভুল, বিদ্রূপ হেনে নিজের প্রতিভায় স্থিত থেকেছেন, দুপক্ষই তাঁরা সমান অবিমৃষ্যকারিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। ইতিহাসের প্রবাহ শখের অভিনয়ের ঠুনকো তলোয়ার নয় যেমন, একবগ্‌গা একরোখা ব্যাকরণও নয়; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-বুদ্ধদেব বসু এক যাত্রাবিন্দু থেকে শুরু ক'রে কেন পৃথগীকৃত কলাপারঙ্গমতায় আলাদা-আলাদা স্থানে পৌঁছুলেন, ইতিহাসের গহনে সে-ঈষৎরহস্য সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যাত।

বুদ্ধদেব বসুর কীর্তির বিচার তাই ইতিহাসপ্রসঙ্গকে পাশে সরিয়ে রেখে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতাকে, একা, হয়তো প্রায় তিনশো বছর এগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। সমকালীন অথবা পরবর্তী বিচারে তাঁর কাব্যকর্ম যদি শীর্ষস্থান অধিকারের যোগ্য না-ও বিবেচিত হয়, তা হ'লেও কবিতাপ্রীতি, কবিতার প্রতি মমতাবোধ, কবিতার অধিকারবোধ, প্রত্যেক বাঙালির অবচেতনের সংগোপনে যে-বোধ লুকিয়ে থাকে, তাকে উন্মোচিত-বিকশিত করার উদ্যোগে বুদ্ধদেবের তিতিক্ষা পরিমাপের বাইরে; এই বিশেষ অনুষঙ্গ থেকে দেখলে রবীন্দ্রনাথের পরই তাঁর স্থান নির্ণয় করতে হয়। একটি সম্পূর্ণ জীবন কবিতার প্রতি প্রেমে ব্যয়িত হয়েছে, রেখে-ঢেকে নয়, বুদ্ধদেবের সমগ্র সাহিত্যসত্তা কবিতাকে লক্ষ্য ক'রে নিমগ্ন থেকেছে, বছরের পর বছর ধ'রে, ঋতুর পর ঋতু পেরিয়ে, দশকের পর দশকের সেতু ডিঙিয়ে। এমনকি গদ্যও কবিতার প্রাণায়াম হয়ে উঠেছে, গদ্য পড়তে-পড়তে প্রতিবার মনে হয়েছে, না, কোথাও অনুশাসনে গোলমাল দেখা দিয়েছে, এ তো গদ্য নয়, নিটোল গীতিকবিতা। উপন্যাসপ্রয়াসাদিতেও একই অভিজ্ঞতা: বুদ্ধদেবের উপন্যাস কদাচ ঘটনা ও চরিত্রের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের অভিযানকাহিনী, সেখানেও নক্ষত্রের কানে, তারা-ভরা আকাশের তলে, ঘুরে-ফিরে সেই একই গান, শব্দের পুঞ্জিত

সমারোহ, কবিতা। বুদ্ধদেবের পৃথিবীতে কবিতার শেষ ছিল না কোনোদিন: তত্ত্বগত-আলোচনা, সাহিত্যবিষয়ক-আলোচনা, রাষ্ট্রনীতি নিয়ে আলোচনা, যা-ই মনে করুন না কেন, চিন্তার আড়াল কখনোই বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, প্রবন্ধের যূথবদ্ধ সারি অচিরে তাদের পরিচয় বদলে ফেলে, তারাও কবিতা হয়ে যায়। বুদ্ধদেবের শিশু-কিশোরদের উদ্দেশে নিবেদিত রচনাবলী আপনি হয়তো ছুঁয়ে-ছেনে দেখছেন, কিন্তু কবিতাকে চাপা দিয়ে রাখা অসম্ভব, তা উপ্‌চে উঠছে। ভ্রমণকাহিনী বা 'ব্যক্তিগত' প্রবন্ধ? নামে কী এসে যায়, সব, সব কবিতাতে রূপান্তরিত, ফুলঝুরির মতো কবিতা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে, কবিতার ক্লান্তিহীন দিগ্বলয়, আলো, গান, মূর্ছনা, কবিতা আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ব্যাকরণের হিশেবে যা নাটক, কথোপকথনের উচ্চাবচতা পেরিয়ে যার অপ্রতিরোধ্য আবেগশীর্ষে পৌঁছুবার কথা, বুদ্ধদেবের প্রতিভার স্পর্শে তা পর্যন্ত অন্য আদল নিয়েছে, নাটক কখন কবিতার শরীরে মিশে গেছে। তাছাড়া, তাঁর সম্পাদনা-আদর্শ, যে-প্রসঙ্গ আগে উল্লেখ করেছি, সে-আদর্শের অভিলক্ষ্য তো, সেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, এক স্থিরবিন্দু: কবিতা, কবিতাই সৃষ্টি, কবিতাই সাহিত্য, সাহিত্য কবিতা, জীবন জড়িয়ে কবিতা, জীবন পেরিয়ে কবিতা, কবিতা অবজ্ঞার বাইরে, তাচ্ছিল্যের বাইরে, কারণ কবিতার সুষমা ছাড়া জীবনধারণ অসম্ভব। মানুন না-মানুন, আপনি অভিভূত হোন না-হোন, কবিতার আড়ালে মাঝে-মাঝে যে-চিন্তার প্রলেপ তা আপনাকে বিচলিত করুক না-করুক, এই মহৎ পরিচিকীর্ষার তুলনা কোথায় পাবেন সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে? বুদ্ধদেবের কাব্যধর্ম দিনের সায়াহ্নসময়ে, 'মহাভারতের কথা'-র আধারে, পরিপূর্ণতম আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল। কবিতার আবেগ তার সমস্ত তরঙ্গলীলা নিয়ে উপস্থিত, কিন্তু সে-তরঙ্গে কী ক'রে যেন এক আশ্চর্য শান্ততাও হঠাৎ যুক্ত হয়েছে। কবিতাতে দীপ্তি, প্রাখর্য, অগ্নি, কিন্তু এ-আগুনে জ্বালা নেই, চন্দনের সমাহিত প্রলেপ। মহাভারতের বিচিত্র চরিত্রেরা আসছেন, যাচ্ছেন, তাঁদের ঔদার্যমহত্ত্ববীর্যশৌর্য-অভিমানরাগক্রূরতাখলাচারক্ষমাপ্রেমঅভীপ্সাঅবসাদঔদাসীন্য দপ্‌ ক'রে জ্বলছে, নির্বাপিত হচ্ছে, ফের আরেকবার অভ্যুদিত হচ্ছে, আবার নিষ্কাশন-প্রস্থান: পুরাণ দর্শনে রূপান্তরিত হচ্ছে, দর্শন শাস্ত্রকলায়, শাস্ত্র ইতিহাসঅভিজ্ঞানে, ইতিহাস সমাজাচারে, সমাজতত্ত্ব কোনো গার্হস্থ্যকাহিনীতে, কিন্তু সব-কিছুই যেন উপলক্ষ, বুদ্ধদেব যেন 'মহাভারতের কথা'-র নির্ভরে তাঁর সারা জীবন ধ'রে

যে-স্বধর্মে নিযুক্ত থেকেছেন, কবিতা, সেই কবিতার গভীরে, সেই কবিতার চারদিক ঘিরে, জুড়ে, সেই কবিতায় অবগাহিত হয়ে আমাদের ইশারায় ডাকছেন, আমরা যেন যোগ দিই, আমরা যেন তাঁর প্রতি অনুকম্পায়ী হই, আমরা যেন কবিতার প্রতি অনুকম্পায়ী হই, আমরা যেন কবিতাকে চিনি, জানি, কবিতাকে প্রতি ঋতুতে, প্রতি পলে, প্রতি মুহূর্তে যেন আলিঙ্গন ক'রে বলি : প্রসঙ্গ উহ্য, তুমি যেখানে উপস্থিত, আকাশ সেখানে গান হয়ে গেছে।

কিন্তু, ভবিতব্য, গান শমে পৌঁছুলো না, 'মহাভারতের কথা'-র কবিতা দিগন্তবলয়ে উপনীত হবার আগেই স্তব্ধ হলো, এখন শুধু এক মুহ্যমান নীরবতা। জীবিকার নোংরা ধান্দায় কবিকেও ব্যয়িত হ'তে হয়; সময় ব'য়ে যায়। বুদ্ধদেবের সময় কতিপয় তস্কর চুরি ক'রে নিয়ে গেলো, কবিতা অসমাপ্ত রইলো। বুদ্ধদেব বসুর জীবনে মৃত্যুর অভ্যুদয়, শীতের প্রার্থনা যখন অসমাপ্ত, অকরুণ রূঢ়াচরণ; অথচ কোনো প্রতিকার নেই : অতি শোকান্তিক তাই এ-কবিকাহিনী।

ভয়ে-ভয়ে কয়েকটি কথা

এই বছরের শুরুতে এলিয়টের মৃত্যুসংবাদ আমাদের কাছে পৌঁছয়। কিংবদন্তী, কবিতার দেশ বাংলা, কিন্তু যে-কোনো সাধারণ প্রসঙ্গের মতোই, এলিয়টের মৃত্যুও আমাদের আদৌ বিচলিত-উত্তেজিত করতে পারেনি। সামান্য কয়েক দশকে আমরা কতদূর স'রে এসেছি এটা তার পরিচায়ক। উত্তর-এলিয়টের জীবনদর্শনে অবশ্যই আমাদের অধিকাংশের শ্রদ্ধা নেই; তাছাড়া, গত কুড়ি বছরে তেমন-কোনো প্রগাঢ় দ্যোতনাসম্পন্ন কবিতা লেখেননি এলিয়ট। তবে, সবচেয়ে বড়ো কথা, কবিতা থেকেই আমরা অনেকদূর স'রে এসেছি। যে যা-ই বলুন, শুদ্ধতাতাত্ত্বিকরা যত মন্ত্রই উচ্চারণ করুন, আসঙ্গে দেশ, সমাজ, আশেপাশে সংস্থিত-সংঘটিত-উন্মোচিত আবেগ-অভিজ্ঞতা-অনুভূতির উদ্বেলতা-বিষণ্ণতা-বিশীর্ণতা অতিক্রম ক'রে কবিতা অসম্ভব: কাব্যরচনা অসম্ভব, কাব্য-উপভোগও। দেশ ম্লান থেকে ম্লানতর হচ্ছে, সমাজ শতচ্ছিন্ন, সুবিধান্বেষণ-চতুরালি-বিবেকহীনতার কাছে আমি-আপনি-সবাই আত্মসমর্পণ ক'রে আছি, সাম্প্রতিক ক্রিয়াকর্মে সততার ব্যাপ্তি নেই, আবেগের অভিজ্ঞানও অনুপস্থিত। পৃথিবী টুকরো-টুকরো হয়ে এসেছে, মহৎ সুষমার প্রতি মনোনিবিষ্ট হবার মতো চিকীর্ষা কোথাও নেই। সুতরাং কবিতার ঋতু শেষ, কবিতার প্রতি প্রেম ম'রে গেছে। কবিতার বইয়ের কাটতি এমনিতে বেড়েছে, এমনকি এই বাংলাদেশে পর্যন্ত বেড়েছে, কবিকুল এখনো ক্রমবর্ধমান, ছন্দে-ভুল-নেই, প্রকরণে-সপ্রতিভতা এমনধারা প্রচুর কবিতা লেখাও হচ্ছে। অথচ, আলাদা ক'রে বিচার করা হোক, কিংবা সম্মিলিত সভায় মাল্যপুষ্পাঞ্জলির আয়োজন করা হোক, গত পাঁচ-দশ বছরের বাংলা কবিতায়, ভেবেচিন্তেই ঢালাও মন্তব্য করছি, কোনো আনন্দেরই

আভাস নেই : হতাশার-কান্নার উৎসমূল থেকে ছিটকে-বেরোনোর যে-আনন্দ, তার স্পর্শ নেই ; নিবিড়তার হৃৎপিণ্ড ছুঁয়ে আসার সাফল্যে যে-আনন্দ, তা-ও নেই ; নিরাভরণ-নিরাড়ম্বর কোনো অপাপবিদ্ধা মেয়ের হাসির ঝিলিমিলির মধ্যে যে-আনন্দ, তা পর্যন্ত নেই। দক্ষতা আছে, কিন্তু দক্ষতার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য আমরা কবিতা পড়ি না, তাহ'লে তো তরবারি-ঘুরোনো তত্ত্বালোচনার খোঁজ করলেই হয়। কবিতার নির্ভরে যে-গ্রহান্তরকামনা আমরা চরিতার্থ করতে চাই, সেই বিস্ময়লোক বাংলা কবিতায় আর ধরা দেয় না : সায়াহ্নলগ্নে প্রতিহত হয়ে ফিরি।

আশঙ্কা হয়, যে-দুঃসাহসী যুবকের দল এখনো কবিতা লিখছেন, তাঁদের মনেও আর আশা নেই, তাঁরাও ধ'রে নিয়েছেন এখন থেকে শুধু প্রহর-গোণা। 'কবিতা' পত্রিকা যদিও বন্ধ হয়ে গেছে, তরুণতরদের কবিতার পত্রিকা ইতস্তত এখনো অনেকগুলি প্রকাশিত হচ্ছে। এরকম কোনো পত্রিকারই একটি বিজ্ঞাপন সেদিন হঠাৎ চোখে পড়লো, বাংলাতে সবশেষের ভালো কবিতা-ক'টি তাঁরা ছাপাচ্ছেন, আমরা যেন কিনে পড়ি। এই চাতুর্য ভালো লাগল, কিন্তু ভালো-লাগাকে ছাপিয়ে আচ্ছন্ন ক'রে রইলো আসন্ন মৃত্যুর বিষাদরেশ।

ইচ্ছা করেই 'কবিতা' পত্রিকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম : করলাম এটা স্মরণ ক'রে যে আজ থেকে ঠিক তিরিশ বছর আগে 'কবিতা'-র জন্ম। বছর পাঁচেক হ'তে চলল 'কবিতা'-র প্রকাশ বন্ধ হয়েছে, আমার সন্দেহ, প্রকৃতির নিয়ম মেনে নিয়েই হয়েছে। তারও আগে, খুব সম্ভব ১৯৫০ সালে, পত্রিকাটি উঠে যাবার উপক্রম হয়েছিল ; জোড়াতালি দিয়ে পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথই ঠিক, যা ফুরোবার, তাকে ফুরোতে দেওয়াই ভালো। 'কবিতা'-র ধুঁকে-পুকে শেষ দশ বছর বেঁচে থাকার কোনো সার্থকতা ছিল না। বড়ো কষ্টের মধ্যে 'কবিতা'-র ঐ শেষের কয়েকটি বছর কেটেছিল, ঋতু পেরিয়ে বেঁচে থাকার কষ্ট, স্রেফ শারীরিক অর্থে বেঁচে থাকার গ্লানি। বুদ্ধদেব বসু কয়েক বছর ধরে প্রবাসী, এবং ধ'রে নেওয়া যেতে পারে 'কবিতা' আর নবপর্যায়ে প্রকাশিত হবে না। তাই, অনেকটা আবেগ-নিরপেক্ষ হয়ে, এখন 'কবিতা'-র বিশ্লেষণ সম্ভব।

এই বিশ্লেষণের প্রয়োজন যথেষ্ট। বাংলা কবিতা বিগত কয়েক দশকে কোথায় পৌঁছেছে, কী ক'রে পৌঁছল, কী হয়েছে, কী হ'তে পারল না, এবংবিধ সকল

বৃত্তান্ত, আমার ধারণা, 'কবিতা' পত্রিকার ইতিহাসে বিধৃত হয়ে আছে। এই ইতিহাসের অন্যতম প্রধান পুরুষ সম্পাদক হিশেবে বুদ্ধদেব বসু নিজে নিশ্চয়ই, কিন্তু অভিভাবক্রিয়তার ভূমিকায় যাঁদের আসন সর্বাগ্রে মনে পড়ে, তাঁরা একদিকে জীবনানন্দ দাশ, অন্যদিকে সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

প্রেমেন্দ্র মিত্র-সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-বিষ্ণু দে-অজিত দত্ত-অমিয় চক্রবর্তীকে আমি ইচ্ছা ক'রেই আপাত-অবহেলা করছি, যেমন করছি বুদ্ধদেব বসুর কবিকর্মকে। অনেক রাত্রি-উতল-করা কবিতা উল্লিখিত প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি, অনেক উজ্জ্বলতার অভিজ্ঞান, শত-সহস্র পংক্তি যেগুলি এখন আমাদের চেতনার সঙ্গে সুমিশ্রিত। কিন্তু মনে হয় না, আরো কয়েক দশক পেরিয়ে যাবার পর, এদের কারোরই কাব্যকলার বৃহদংশ বুকে চমক দিয়ে ডাকবে, অথবা বুদ্ধিতে নতুন-কোনো দীপ্তির দৌত্য নিয়ে আসবে। সময়ের প্রভাবে বাংলা কাব্যপাঠকের আবেগে-বিচারে ধৃতিনিষ্ঠার ছোঁয়া লাগবে : তখন অনেকের কাছেই সম্ভবত মনে হবে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-মোহিতলালের প্রবাহের পর, পশ্চিমের কবিতার পাশাপাশি নিঃশ্বাসের পর, বুদ্ধদেব বসু-বিষ্ণু দে-সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সবাই-ই সহজবোধ্য, সহজগ্রাহ্য। কিন্তু প্রবাহের ভিড়ে হারিয়ে যাবেন না জীবনানন্দ দাশ, উদ্ধত বিদ্রূপের মতো পংক্তি-বিভক্ত হয়ে থাকবেন সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

'কবিতা' পত্রিকার অভাবে বরিশালের কবি জীবনানন্দ হয়তো চুপচাপ কবিতা লিখে চুপচাপই তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখতেন, চিরকালের জন্য তারা আমাদের অনুভবের অন্তরালে থেকে যেত। বুদ্ধদেব বসু যদি কোনোদিন আত্মজীবনী লেখেন, আরো-একটু বিশদ ক'রে আমরা জানতে পারবো কত পরিমাণ আশ্বাস ও উৎসাহ দিয়ে, কত উপরোধের উপান্তে জীবনানন্দের কাছ থেকে নিয়মিত কবিতা সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। অন্যদিকে 'কয়েকটি কবিতা'-পর্যায়ের প্রায়-সমস্ত কবিতাও প্রথম দু-বছরের 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, এবং পত্রিকাটির প্রথম পাঁচ বছর সমর সেন সম্পাদক-মণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন, কলেজের ছাত্র থাকাকালীন অবস্থাতেই ছিলেন। প্রায়-নাবালককে এই সম্মানদানের পিছনে অবশ্যই ছিল বুদ্ধদেব বসুর ঔদার্য ও বিচারতীক্ষ্ণতা। এরই কয়েক বছর বাদে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে সমপরিমাণ উৎসাহসহকারে 'কবিতা' পত্রিকায় সাদরসম্ভাষণও স্মরণ করতে হয়। সুভাষ

হয়তো কবিতা লিখতেনই, লিখতেন বেপরোয়া প্রাণের আবেগে, কিন্তু 'কবিতা' পত্রিকার অভাবে, 'পদাতিক'-এর সংহতি হয়তো অনেকটাই অপচয়ভ্রষ্ট হতো।

অবশ্য এমনকি জীবনানন্দের কবিতায় পর্যন্ত মাঝে-মাঝে ইয়েটসের ঈষদাভাস, সমর সেনের আদি কবিতায় এলিয়ট অথবা পাউণ্ডের ইতস্তত-অনুরণন, সুভাষের প্রারম্ভোক্তিতে ক্বচিৎ-অকস্মাৎ মায়াকভস্কির ইংরেজি অনুবাদের সদ্যপঠিত ইঙ্গিত। কিন্তু এ-সমস্ত বাহ্য; মাত্র কিছুদিনের মধ্যে এই কবিত্রয়ের সৃষ্টিতে যুগপৎ যে-আবেগ ও ওজস্ উদ্ভাসিত হ'তে শুরু হলো, তার তুলনা নেই। একদিকে জীবনানন্দের ছায়া-ছায়া উপমা-চিত্রকল্প-রূপকথা, অন্যদিকে সমর সেনের বুদ্ধিক্ষিপ্র নাগরিকতা, কিছু পরে সুভাষের দীপ্ত আশার ঘোড়সওয়ার, বাংলা কাব্যে এক অভাবনীয় ঐশ্বর্য জড়ো করলো।

'কবিতা' পত্রিকার প্রথম দশ বছর এই সুখসৌভাগ্যে কেটেছে। কিন্তু তারপরেই অঘটনের পালা। দুর্যোগ এলো প্রধানত তিনটি দিক থেকে। প্রথম থেকেই সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরাগী অনুকারকের সংখ্যা প্রচুর। অনুরাগাধিক্যের উচ্ছ্বাসে শেষোক্তরা এত পরিমাণ নকলনবিশি নিকৃষ্ট কবিতা লিখতে ব্যাপৃত হলেন যে তন্নিষ্ঠমনারা ভড়কে গেলেন: রাজনৈতিক ধুয়ো, যা সস্তা, কবিতার বৃহদায়তন দখল ক'রে রইলো, কাবত্ব ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হলো। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বরাবরই আদর্শবৎসল, অচিরেই তিনি অনুকারকদের অনুকরণে কবিতা মক্সো আরম্ভ করলেন। সমর সেন, সম্ভবত আতঙ্কগ্রস্ত হয়েই, গদ্যছন্দ বর্জন ক'রে কিছু সময় ঈশ্বর গুপ্তের পয়ারের আড়ালে আত্মগোপন করলেন, তারপর একদিন তাঁর লেখা বন্ধ হয়ে গেলো। অক্ষম অনুকারকদের খর্পর থেকে উদ্ধার পাবার জন্যই তিনি নীরবতা অবলম্বন করলেন কিনা সেটা বাংলা কাব্যের ইতিহাসে একটা মস্ত প্রশ্ন থেকে যাবে। তাছাড়া, যে-আবেগের তাড়নায় শাণিত, ক্লান্ত, বিদ্রূপঅবিশ্বাসছড়ানো লিরিকের উত্তরসময়ে নতুন সমাজের স্বপ্নবুননে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন, গোঁজামিলস্বাধীনতাপ্রাপ্তি-দেশবিভাগ-শরণার্থী সমস্যার রক্তরোলে তা আস্তে-আস্তে সম্পূর্ণ মিলিয়ে আসে। পেশাদার আশাবাদী হ'লে তদসত্ত্বেও সমর সেন লিখে যেতেন, কিন্তু, বরাবরই সাধুতার জন্য বিখ্যাত তিনি, হয়তো তিনি ভেবে ঠিক করলেন, কবিতা-লেখার প্রস্তাব অতঃপর প্রক্ষিপ্ত।

দেশ ও সমাজকে বাদ দিয়ে বৈদেহী কাব্য রচনা সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়,

প্রথমদিকের জীবনানন্দ তার প্রমাণ। কিন্তু আদর্শ হিশেবে এ-ধরনের প্রতীপ প্রত্যয় বিপজ্জনক, কারণ যে-নারীকে ভালোবাসা কিংবা অবহেলা করা যায়, তারও চোখের নীলিমায় সমাজের ভাবনার অনুকম্পা যুক্ত হবেই। যে-কেউই স্বীকার করবেন, শেক্সপীয়রের সনেটসমষ্টির অভীষ্টার সঙ্গে ব্রাউনিঙের লীলা-সঙ্গিনীর শত শতাব্দীর ব্যবধান। ঠিক যে-মুহূর্তে সুভাষ মুখোপাধ্যায় শ্লোগানের গহনতায় ডুবে গেলেন, এবং সমর সেন নীরব হবার সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন, বাংলাদেশের পাঠকেরা, প্রায় অতর্কিতভাবেই যেন, জীবনানন্দ দাশকে আবিষ্কার করলেন। নিজের মনে বহুদিন ধ'রে জীবনানন্দ বাংলাদেশের মফস্বলে কবিতা রচনা ক'রে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ১৯৫০-এর প্রত্যন্তে পৌঁছেই তবে তাঁর প্রাপ্য তিনি পেতে লাগলেন। এই জীবনানন্দ-আচ্ছন্নতা আবেগশীর্ষে পৌঁছুল তাঁর শোকাবহ মৃত্যুর পর, কিছুটা, আমার সন্দেহ, ঐ শোকাবহ মৃত্যুর জন্যই।

জীবনানন্দের কাব্য সত্যিই কুহকিনী। রবীন্দ্রনাথের পর এতটা দ্যোতনা বাংলা কবিতায় আর সঞ্চারিত হয়নি। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পৃথিবী, আমূল অন্য এক পরিভাষা: যে-পৃথিবী তার মায়া দিয়ে কাছে ডাকে, একবার কাছে গেলে আর দূরে স'রে আসা যায় না চট ক'রে—মৃত্যুর মতো, নিবিড়তম প্রেমের মতো যা ছেঁকে ধরে। এবং ভাষা, তা-ও তাই—কখন নিজেদের অজ্ঞাতে সবাই সে-ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করেন, কিন্তু বৃথা, সেই জাদু অতটা অবলীলার সঙ্গে ঝলক দেয় না, প্রত্যেকেই ব্যর্থ হয়ে ফেরেন, অথচ ব্যর্থতা থেকে পুনরায় রোখ চেপে বসে, সেই ভাষার সম্মোহে কাতারে-কাতারে কবি-কবিমন্যরা ফিরে-ফিরে যান। যে-মায়া কোনোদিন ধরা পড়বে না, যাতে জীবনানন্দের একারই শুধু মহত্তম, অখণ্ডতম অধিকার, সেই সোনার হরিণের অন্বেষণ উদ্‌ভ্রান্ত উৎসাহের সঙ্গে অবিশ্রান্ত চলেছে, এখনো চলছে।

আজ থেকে অর্ধশতাব্দী আগেকার রবীন্দ্রানুস্মৃতির মতোই, বর্তমানের জীবনানন্দীয় ঘোর, আমার ধারণায়, বাংলা কাব্যকে এক জায়গায় আটকে রেখেছে, জীবনানন্দকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে না-আসতে পারলে মুক্তি অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কবিতায় জীবনানন্দের সৃষ্টি জ্যোতির্ময়তম, কিন্তু, সেজন্যই বলছি, তাঁর সর্বসমাচ্ছন্ন-করা প্রভাব পরম সর্বনাশের ব্যাপার। এই সর্বনাশের প্রথম আভাস আজ থেকে পনেরো-ষোল বছর আগে প্রথম

ধরা পড়ে। অপ্রিয়বাদের অভিযোগের আশঙ্কা সত্ত্বেও বলবো, এই প্রবণতার অশুভ পরিণাম-সম্ভাবনা সম্বন্ধে তখন থেকেই বিবেকবান সমালোচকদের ভাবা উচিত ছিল, এবং সবচেয়ে বেশি ক'রে ভাবা উচিত ছিল 'কবিতা'-সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর। নিজের উপর বুদ্ধদেব অনেকটা দায়িত্ব নিয়েছিলেন, সম্পাদক হিশেবে তাঁর প্রধানতম কর্তব্য ছিল অকম্পিত, অবিচলিত, সম্পূর্ণ আবেগনিরপেক্ষ সমালোচনা। বাংলা কবিতার পক্ষে মস্ত দুর্ভাগ্য, ঐ মুহূর্তে 'কবিতা'-সম্পাদক সে-দায়িত্ব পালন করলেন না। রাজনীতিপরাঙ্মুখতাহেতু সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায়-সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যকলার বিরূপবিচারে বুদ্ধদেব সে-সময় মহা উষ্মার সঙ্গে ব্যস্ত-ব্যাপৃত। সমাজের অভিজ্ঞান বাদ দিয়ে কাব্য যে অসম্ভব, এমনকি প্রেমের কবিতাও, বুদ্ধদেব সম্পাদক হিশেবে সে-অনুজ্ঞা জানাতে তাই আর উৎসাহী রইলেন না। জীবনানন্দের কবিতার গভীরে যে-প্রেম, যে-জ্ঞানস্নিগ্ধ আস্তিকতা, তারও যে সুষমাউজ্জ্বল এক সামাজিক পটভূমি আছে, 'কবিতা' পত্রিকার মারফৎ সে-সতর্কবাণী সংকটসময়ে অনুচ্চারিত থাকলো।

শ্লোগানে আস্থা হারিয়ে যে-মানসিক আবর্তনের শুরু, তার আকর্ষণে বুদ্ধদেব শেষ পর্যন্ত অন্য-এক শ্লোগানে অন্ধ বিশ্বাস আরোপ ক'রে পারতুষ্টি পেলেন। সমাজ নয়, আজ-কাল-পশুর সংঘটনা নয়, চোখকান বুঁজে, বহিপৃথিবীর সঙ্গে সংবেদনার দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে নিজের ভিতরে তাকাও, সেখানেই কবিতার উৎস। জীবনানন্দীয় সম্মোহনের সঙ্গে এই সম্পাদনা-আদর্শের কাকতালীয় মারাত্মক নৈরাজ্যের বন্যা উপস্থিত করলো। জীবনানন্দের পারমিতাবোধ প্রায় সকলেরই উপলব্ধির অনায়ত্ত, অথচ তাঁর নিভৃত, নিজস্ব ভাষাসম্ভারের উচ্ছৃঙ্খল লুণ্ঠনে প্রত্যেকেরই যেন অপরিমিত অধিকার। সেই থেকে শুরু কথা-সাজানোর সানুনাসিক ক্লান্তিকর ঋতুর: আবেগ নেই, অনুভূতি নেই, উচ্চকিত প্রেম নেই, স্বদেশ-সমাজের প্রতি অনুরাগ নেই, ভাষার নিরালম্ব-বায়ুভূত-নিরাশ্রয় ব্যবহার আজ পর্যন্ত বাংলা কবিতাকে আবিল ক'রে রেখেছে।

দুঃখ হয় অরুণকুমার সরকার-বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-নরেশ গুহ প্রমুখ কয়েকজনের জন্য, যাঁরা এই প্রায়োন্মত্ত ভিড়ের মধ্যেও আলাদা স্বর ফোটাবার চেষ্টা করেছিলেন, ছন্দের শিহরিত বৈচিত্র্যের উৎস-অনুসন্ধানে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তাঁদের কারো কাব্যই তেমন আর আমল পেলো না:

একদিকে জীবনানন্দের বিলম্বিত অভিভাব, অন্যদিকে বিদেশী সমুদ্রের প্রতিধ্বনিত অস্থিরতা, তাঁদের কয়েকজনের অন্তরঙ্গ, অথচ বিশিষ্ট, কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেলো।

কারণ ঠিক এই সময়েই, 'কবিতা' পত্রিকার মধ্যবর্তিতাতেই, আরেকটি বৃষস্কন্ধের আবির্ভাব ঘটলো। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বহু বছর ধ'রে চেষ্টা করছিলেন বাঙালি পাঠকদের সঙ্গে ইওরোপীয়, বিশেষ ক'রে ফরাশি ও জর্মন, কাব্যের পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার। কিন্তু ইংরেজির বাইরে আমাদের ভাষাচর্চা মোটেই অগ্রসর নয় ব'লে আমাদের অন্যান্য বিদেশী ভাষার কাব্যাস্বাদও যথেষ্ট সময়ের ব্যবধান অতিক্রম ক'রেই তবে পরিপূর্ত্তি পায়। অনুবাদে, কিংবা অনুবাদের অনুবাদে, বাংলাদেশে র‍্যাঁবো, বোদলেয়ার, ভের্লেন প্রভৃতির কবিতার ঢেউ এসে ঠেকলো বিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকের প্রা॒ন-মাঝামাঝি ঋতুতে। সমরেশ সেনরা, অন্নদাশঙ্করের ছড়াতেই আছে, যখন যা পড়েন, তখন তা লেখেন। তিরিশের দশকে পাউণ্ড-এলিয়ট-মায়াকভস্কির প্রতিধ্বনিত আবেগ মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের তৎকালীন মানসিকতার সঙ্গে চমৎকার মিলে গিয়েছিল। কিন্তু দু'টুকরো-হয়ে-যাওয়া শরণার্থীসমস্যাদীর্ণ বিপ্লবের-ঘোর-লাগা বাংলাদেশে ১৯৬০ সালের আবর্তে র‍্যাঁবো-বোদলেয়ার ঘোরতর বেমানান। যাঁরা জীবনানন্দীয় ভাষাকুহেলিতে নিজেদের জড়িয়ে রেখেছিলেন, তাঁরা এবার বোদলেয়ারের পাপবোধমূর্ছিত বিষণ্ণতা কায়দা করতে মহা উৎসাহে লেগে গেলেন: এই ব্যাপারে তাঁদের পথিকৃৎ হলেন স্বয়ং বুদ্ধদেব বসু। মেকি আর আসলে ভেদাভেদ রইলো না, অনুবাদ আর অনুকরণ পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেলো।

বাংলা কাব্যকে ঠিক এই জায়গায় পৌঁছে দিয়ে 'কবিতা' পত্রিকা বন্ধ হয়েছে। আমি কোনো অভিযোগ করছি না, নিতান্তই আক্ষেপ জানাচ্ছি: অবরোহণের রাস্তা দেখানো সোজা, পুনরুত্থানের নির্দেশ দেওয়া অনেকগুণ দুরূহ। আদর্শহীন এক নৈরাজ্যের মধ্যে আপাতত অধিকাংশ কবিরা বিরাজ করছেন: তাঁদের রচনায় কোনোরকম বিশ্বাস কিংবা আবেগের ধৃতি নেই। ইতিহাসের বিবর্তনে আগ্রহশূন্য, সমাজ ও রাজনীতি তাঁরা এড়িয়ে চলেন, যে-কোনো প্রেমে তাঁদের আরূঢ় অনীহা, ভাষাসৌকর্য সম্বন্ধে নিরুৎসুক, ছন্দের—এমনকি প্রবহমান কিংবা গদ্যছন্দের পর্যন্ত—প্রকরণ নিয়ে আদৌ অধ্যবসায়ী পরীক্ষা হচ্ছে না। যেন কাব্যকলা নিষ্ক্রিয়তার ব্যাপার, যেন ভগ্নাংশিক ভাবনাই কবিতা, চিন্তার এলায়িত বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি। এ এক ভয়াবহ

ক্রান্তিপ্রান্তে আমরা উপনীত : ভাবা-ছন্দ বিসর্জিত, আদর্শ অবলুপ্ত, যে-কোনো উদ্ধত অবিনয় সৃষ্টির অহমিকা নিয়ে সভাক্ষেত্রে উপস্থিত। হঠাৎ ক্বচিৎ-কোনো মুহূর্তে সামান্য একটি চাতুর্যপ্রয়োগ হয়তো এখনো মনকে দোলা দিয়ে যায়, কিন্তু তারপর হতাশার সমাচ্ছন্ন ঘনতা।

এই অবস্থায় কবিতার পুনরুজ্জীবনের বাক্যালাপ হয়তো অর্থহীন ঠেকবে, ব্যক্তিগতভাবে তাই আমি নীরব থাকার পক্ষপাতী। একটা কথা তা হ'লেও মনে হয়। অবলম্বনহীনতা থেকে কবিতা হয় না, বাংলা কবিতাকে বাঁচতে হ'লে কোনো আস্তিকতায় প্রত্যাবর্তন করতেই হবে। আস্তিকতার জন্ম মৃত্তিকার মূল থেকে, পরিপার্শ্বের নিঃশ্বাস থেকে। বাংলাদেশের সমাজবিবর্তনের ধারাগুলি এড়িয়ে, সন্দেহসংশয়অবরুদ্ধবিপ্লব-আরক্ত সমাজব্যবস্থা ডিঙিয়ে, কবিতা অসম্ভব। কাব্যে অবৈকল্য যদি এখনো অন্বিষ্ট হয়, আমাদের ব্যাহত পাঠ ফের শুরু ক'রে অতএব ফিরতে হবে সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপলব্ধির উৎসে, জীবন এবং লোকপ্রেমের প্রত্যয়ে। এবং, যে-ক'রেই হোক, কবিতার ভাষাকে মুক্ত করতে হবে জীবনানন্দের ভাস্কর্যচিত্রকল্পখচিত রুদ্ধশ্বাস গুহা থেকে। জীবনানন্দ আমার প্রিয়তম কবি, তা হ'লেও একথা বলছি : অন্যথা বাংলা কবিতা অচিরে শিবা আর শকুনের আহার হবে।

দুটো উৎক্ষিপ্ত মন্তব্য

১

কাল অস্থির, বাংলা সাহিত্যে সমালোচনা অবলুপ্ত, এবং বিশেষ ক'রে অপ্রতিহত মুদ্রাস্ফীতির ফলে প্রথাগত সামাজিক সম্পর্কে গত বিশ বছরে নানা উচ্চাবচতার সৃষ্টি হয়েছে। যাঁরা স্রেফ সাহিত্যিক হয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন, স্ব-স্ব নিষ্ঠায় নিমগ্ন থাকবার প্রয়াস করেছিলেন, তাঁদের অচিরেই আর্থিক দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। আসলে শরৎচন্দ্র-তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এমন দু'একজন ছাড়া, স্রেফ লেখার উপার্জনে বাংলা দেশে সংসার চালিয়েছেন, স্বাধীনতার আগে সেরকম দৃষ্টান্ত বিরলতম। অধিকাংশ সাহিত্যিক লেখা বিক্রি ক'রে যা পেতেন সেটা উপুরি পাওনা হিশেবে ধ'রে নিতেন; জীবিকার প্রধান সংস্থান হতো হয় শিক্ষকতা নয় কেরানিগিরি থেকে, নয়তো জমিদারির লভ্য থেকে। মস্ত জমিদার কি বড়ো চাকুরে সাহিত্যিকদের মধ্যে সামান্য কয়েকজনই ছিলেন; ১৯৫০ সাল পর্যন্ত, বাংলা দেশের অধিকাংশ বিখ্যাত-অর্ধখ্যাত সাহিত্যিকের দিন কেটেছে আর্থিক অনটনের মধ্যে, অভাবের সংসারে কোনোক্রমে জোড়াতালি দিয়ে। অথচ এই অভাবের দিনযাপনে তেমন-কোনো গ্লানির ভাব ছিল না। যেখানে নিষ্ঠা, সেখানে সৃষ্টি থেকে আনন্দবোধও। তাছাড়া, সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গও অবাস্তর নয়; সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধার স্বতঃপ্রকাশ ছিল। যাঁরা লিখতেন, তাঁদের নিয়ে সাধারণ লোকের হতচকিত বিস্ময়, সেই সঙ্গে সাহিত্যিক নামের গৌরব মিলিয়ে এক ধরনের জ্যোতির বিচ্ছুরণ ছিল। শিক্ষকদের ক্ষেত্রে যেমন, সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রেও তেমনি, সামাজিক সম্ভ্রমে আর্থিক অপ্রাচুর্যের খিন্নতা অনেকটা দূর হতো।

প্রথমত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, তারপর স্বাধীনতা-উত্তর যুগের নানা ভেল-ভেল্কি, সমাজের চেহারা-রুচি-আচরণ-অধিকরণ খোল-নলচে বদলে গেলো। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত বিদেশী শাসকদের সংস্কৃতি-সংস্কার কিছুমাত্র প্রভাবও আমাদের জাতীয় চেতনাকে নিগড়ে বাঁধেনি; ইংরেজরা বাইরে-দূরেই ছিলেন, ভারতীয় যে-ক'জন ইংরেজমন্য হয়ে বিদেশী সামাজিক চেতনায় নিজেদের রপ্ত করতেন, তাঁরা ঈষৎ কৌতুকের উপলক্ষ হয়েই থাকতেন। আসলে প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই সামাজিক মূল্যমান নির্ণীত হতো স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শের প্রভাবে। বাংলা-গুজরাট-দাক্ষিণাত্যের চিন্তাদর্শ প্রায় সর্বত্র সামাজিক সংবিধান হিশেবে গৃহীত হতো: জ্ঞানে ভক্তি, বিদ্যাচর্চায় সন্নত আগ্রহ, জীবনযাত্রায় সারল্য, নিছক অর্থোপার্জনে অনীহা। এই পরিবেশে শিক্ষক কিংবা সাহিত্যিকদের টাকার অনটন আদৌ সংকটের সংজ্ঞাবাহক ছিল না।

স্বাধীনতার পর আমূল পটপরিবর্তন। সামাজিক জীবনে শাসনতন্ত্রের প্রভাব হাজারগুণ বৃদ্ধি পেলো। তাছাড়া, প্রদেশ ছাপিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার মানদণ্ড প্রধান হয়ে উঠলো। কেন্দ্রকে পাশে সরিয়ে রেখে, নিছক প্রদেশের প্রাক্তন স্বয়ংভরতায় নিরালম্ব থাকা অতঃপর অসম্ভব: রাজনীতিতে ভারতীয় চেতনা অন্য-সমস্ত আবেগকে ঢেকে-মুছে দিতে শুরু করলো। সাংস্কৃতিক-সামাজিক মূল্যবোধও সেই সঙ্গে আস্তে-আস্তে বদলে যেতে লাগলো। কেন্দ্রের নেতারা পাটাতন থেকে তখনও চেঁচাতেন, জীবনযাত্রায় সারল্য শ্রেয়, জাতীয় লক্ষ্য সমাজতন্ত্রে পৌঁছনো, ইত্যাদি। কার্যত কিন্তু প্রতীপবিপ্লব: পঞ্জাব-উত্তর ভারতের প্রভাব রাজনৈতিক ঘটনাচক্রে সারা দেশে সংক্রমিত হলো, সামাজিক আচার-কলায়ও সেই সঙ্গে বাংলা-দাক্ষিণাত্যের আদর্শ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হবার পালা। রুক্ষ শোনালেও যাকে বলতে হয় পাঞ্জাবী জীবনধর্ম— চক্‌মকে-ঝক্‌ঝকে পোশাক-আসবাব, বিলাসাসক্তি, অর্থের প্রাচুর্য-অপ্রাচুর্য দিয়ে সামাজিক মান-নির্ধারণ—সাম্রাজ্যবিস্তারের পরিক্রান্ত সমারোহ নিয়ে এলো।

কেন্দ্রীভূত শাসনতন্ত্র, বাংলারও অতএব রেহাই পাবার কোনো পথ ছিল না। রাজনীতির ছাপ জীবনধারাকে গড়ে, সমাজের চেতনাকে দুমড়ে-মুচড়ে দেয়। তাছাড়া, স্বাধীনতার ঠিক পরে পশ্চিম বাংলার মস্ত দুঃসময় গেছে। দেশভাগের ফলে ভারতবর্ষের রাজনীতির কাঠামোয় বাংলার উপযোগিতা খর্বিত, কংগ্রেস দলের মধ্যে বাংলার নেতাদের পরিসর সংকুচিত, শরণার্থী সমস্যায় প্রদেশটি

বিব্রত-জর্জরিত, হীনমন্যতার গ্লানি এই অবস্থায় অচিরে বাঙালিমানসে পরিব্যাপ্ত হলো। দিল্লির নির্দেশে রাজকীয় সম্ভার; আচারে-বিচারে উত্তর ভারতীয় মূল্যবোধ ক্ষীয়মান পশ্চিম বাংলায় সুতরাং অচিরে অনুপ্রবেশ করলো।

সেই কালভ্রষ্ট ঋতু এখন পর্যন্ত মোটামুটি অব্যাহত। জাগতিক সাফল্যের সংজ্ঞা বদলে গেলো; যাঁর যত বিত্তের ঠমক, তাঁর তত সামাজিক প্রতিষ্ঠা। ভুঁই ফুঁড়ে উঠলেন বেনে-ব্যবসাদাররা, তলিয়ে যেতে থাকলেন শিক্ষক-সাহিত্যিকদের সম্প্রদায়। জীবনযাত্রার, বিশেষ ক'রে মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন-যাত্রার, প্রয়োজনীয় উপকরণের ফিরিস্তিতে এখন থেকে পঞ্জাবি রঞ্জনের আভা। মাস্টারি কিংবা কেরানিগিরির উপর নির্ভর ক'রে সাহিত্যিকদের বেঁচে থাকা দুরূহ হয়ে উঠলো। সমাজের নতুন-শেখা বিচারে যে-লেখকের অর্থসাচ্ছল্য নেই, তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠাও প্রায় শূন্যের কোঠায়।

লেখক-সাহিত্যিকদের তেমন দোষ দিয়ে লাভ নেই, যেমন লাভ নেই একদা-আদর্শবাদী শিক্ষককুলের সাম্প্রতিক অর্থগৃধ্নুতাকে গাল পেড়ে। সমাজের মান অধোগামী হলে পণ্ডিত সম্প্রদায় কিংবা বিদ্বান মনীষীরা খুব বেশিদিন সেটা ঠেকিয়ে রাখতে পারেন না। আমরা অধিকাংশই শাদামাটা; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবেক ছাপিয়ে আমাদের ভীরুতা বড়ো হয়ে ওঠে। অবশ্য এ-ধরনের সংকট-মুহূর্তে যদি কোনো মহৎ ব্যক্তিত্ব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে অধঃপতনের রাস্তা আগলে দাঁড়ান, লেখক-সাহিত্যিকদের আত্মবিশ্বাসে সংহত থাকবার আহ্বান জানান, প্রাক্তন অধ্যায়ের মানে সবাইকে প্রত্যাবর্তনে উদ্বুদ্ধ করেন, তা হ'লে ইতিহাসের ধারা অন্য মোড় নিতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পর বাংলাদেশে সেরকম ব্যক্তিত্বের সম্ভাবনা অবলুপ্ত।

ফলে যা হবার তা-ই হলো। গত কুড়ি বছরে পশ্চিম বাংলায় সাহিত্যচর্চা অর্থকরী সাফল্যের ধ্রুবতারা লক্ষ্য ক'রে ছুটেছে। যে-ক'রেই হোক, লিখে টাকা করতে হবে; যে-ধরনের লেখায় টাকা হয়, গাড়ি-বাড়ির সংস্থান হয়, দু'দশ বার বিদেশ ঘুরে আসার—বিশেষ ক'রে মার্কিন দেশ দেখে আসার— সুযোগ হয়, সে-ধরনের লেখা তৈরি করবার তাগিদ লেখকদের একটি বৃহদংশকে তাড়া ক'রে ফিরেছে। কোন্ ধরনের সেই রচনা? এই প্রশ্নের নিরসনও সহজেই হলো। পুরোনো দিনে সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখা ছাপাতেন বিশুদ্ধ সাহিত্য পত্রিকায়: পত্রিকা প্রকাশের অর্থনীতি সে-যুগে সহজতর ছিল। যেহেতু লেখকদের

অর্থাভীপ্সা অসম্ভবের কাছাকাছিও যেত না, সাহিত্যপত্রিকাগুলি থেকে মোটামুটি যা পেতেন—এবং পরে প্রকাশকরা দয়াপরবশ হয়ে মাঝে-মাঝে যা দিতেন—তাতেই তাঁরা বিনম্র-সন্তুষ্ট থাকতেন। এই ব্যবস্থায় সব-কিছু যে ভালো ছিল তা নয়, অনেক লেখক প্রকাশকের নির্দয়তাহেতু কৃচ্ছ্রের মধ্যে কাটিয়েছেন, শঠতার শিকার হয়েছেন। কিন্তু হালে যা ঘটছে তাতেও কোনো আনন্দের উপচার নেই। ছাপার খরচ বহু গুণ বেড়েছে, লেখকদের খোরাকের দাবিও অনেক বেড়েছে, অথচ দেশভাগের ফলে বিক্রয়ের পরিধি সংকুচিত, সাহিত্য-পত্রিকাগুলি তাই আস্তে-আস্তে স্তব্ধ হয়ে এসেছে। একমাত্র সেই পত্রিকাই আজ বাঁচতে পারে, যার বিজ্ঞাপনের সংস্থান আছে; বিজ্ঞাপনের প্রসাদ ছাড়া পত্রিকা-চালানো অসম্ভব ক্রিয়াকর্ম। সুতরাং, প্রায় অপ্রতিরোধ্যভাবেই, সাহিত্যিকরা জড়ো হয়েছেন দৈনিক সংবাদপত্রের ছায়ায়: সেই রবিহীন করদৃপ্ত প্রদোষের তলে বিজ্ঞাপন আছে, অর্থের প্রাচুর্য আছে, জাগতিক সাফল্যের ইশারা আছে। পশ্চিম বাংলায় সাহিত্যচর্চার অধিনায়কত্ব তাই আপাতত দৈনিকসংবাদপত্রগোষ্ঠীর কুক্ষিগত।

এই প্রতিবিপ্লবের অন্য কারণও ছিল। খবরকাগজ শুধু বিজ্ঞাপনের প্রসাদ-পুষ্টই নয়, খবরকাগজ নিজে থেকে আবার বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থাও করতে পারে। রচনার প্রকৃত উৎকর্ষ-অপকর্ষ যা-ই হোক না কেন, যদি খবরকাগজের মালিকরা খুশি থাকেন, দিনের-পর-দিন কাগজের পৃষ্ঠায় তা হ'লে গুণকীর্তন চলবে, কোনো বিশেষ লেখকের রচনাকে আকাশে তুলে ধরা হবে, তাঁকে প্রায় বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি অবতার ব'লে সাধারণের কাছে ঘোষণা করা হবে। দৈনিক সংবাদপত্র এক আশ্চর্য জাদু, যার ছোঁওয়ায় ছয় নয় হয়ে যায়, যিনি আপাদমস্তক নিরেট তিনি ক্ষুরধার প্রতিভাবান ব'লে রটিত হন। সংবাদপত্র শুধু বিজ্ঞাপন পায়ই না, বিজ্ঞাপিত করে, লেখকের খ্যাতি-অখ্যাতি নিরূপণ করে। এই খ্যাতি-অখ্যাতির উপর বইয়ের কাটতি নির্ভর, কে আমির হবেন আর কে নিঃস্ব থাকবেন তা আজ সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীরাই ব'লে-ক'য়ে দেন। এক কথায়, তাঁরা প্রায় বিধাতার কাছাকাছি।

এই বিধাতাপ্রতিম ব্যক্তিরাই সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যের মান নির্ণয় করছেন। এক ছত্র না লিখেও তাঁরা সবচেয়ে প্রভাবশীল সমালোচক: ঐতিহ্যগত সমালোচনা বাংলা সাহিত্য থেকে ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। মালিকরা যাঁদের দয়া ক'রে

পোষণ করেন, যাঁদের রচনা নিয়মিত এবং প্রভূত পরিমাণে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, যাঁদের লেখা প্রতিনিয়ত বিজ্ঞাপিত করেন, তাঁরাই দু'দিনের মধ্যে প্রথিতযশা সাহিত্যিক ব'নে যান। তাঁদের বইয়ের কাটতি বাড়ে; চেহারায় চিক্কণ মসৃণতা আসে; সাংসারিক সাচ্ছল্যের সরোবর কাণায়-কাণায় ভ'রে ওঠে।

সংবাদপত্রের প্রসাদ কুড়িয়ে যেখানে সাহিত্যচর্চা, আদর্শের বালাই সেখানে থাকবার কথা নয়। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব এই অবস্থায় অপ্রাসঙ্গিক, যা-ই লেখা হোক না কেন, খবরকাগজের ভেল্কিবাজিতে তা-ই অবলীলায় হাটে বিকোবে। কল্পনাশক্তি, পরিশ্রম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, এ-সমস্ত বৃত্তিই অপ্রয়োজনীয়। বরং, লেখায় যেন কোনো গম্ভীর স্বর না-আসে, কোনো চিন্তার পীড়ন যেন রচনাকে দীর্ণ না-করে: অলঘু প্রবণতা খবরকাগজের মালিকদের পছন্দ হবার নয়। রচনায় যেন চটুলতা থাকে, দিনের খবরের মতো তা যত ঠুনকো হয় তত ভালো; যত সস্তা তার আবেগ, তত বেশি তার তারিফ পাবার সম্ভাবনা।

এন্তার গল্প-উপন্যাস লেখা হচ্ছে ইদানীং বাংলাদেশে উপন্যাসের ভণিতায় দেড়-দু'হাজার পৃষ্ঠা-ফাঁপানো কেঁদো কাহিনী: যা আধ পাতায় ব'লে দেওয়া যায়, পঁচিশ পৃষ্ঠা জুড়ে তার বিস্তার। অপরিমিত, অসংস্কৃত ভাষণ; বাক্যগঠন দুর্বল, ব্যাকরণপ্রয়োগে ভুল, সস্তা চটকের ফুলঝুড়ি। যাঁরা আদৌ লিখতেই জানেন না, বাংলা গদ্যের চরিত্র নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামাননি, ভাষাব্যবহার যে সাধনার ফসল, আগাছা নয়, এই চিন্তার উদ্বেগ যাঁদের কোনোদিন ব্যাহত করেনি, তাঁরাও ভুরি-ভুরি লিখছেন, লিখে বিখ্যাত হচ্ছেন। সৃষ্টি আর আদপেই দ্বন্দ্বের যন্ত্রণার প্রতিচ্ছায়া নয়; বোতাম টিপলেই হলো, কারখানার যন্ত্রের গহ্বর থেকে যেমন তৈরি তৈজস বেরিয়ে আসে, সাহিত্যও তেমনি দণ্ডে-দণ্ডে প্রস্তুত হচ্ছে, বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, বিক্রিত হচ্ছে। গত বছর-দশকের সালতামামি থেকে ধরা পড়বে, যে-সমস্ত গল্প-উপন্যাস বাজারে ছাড়া হয়েছে, তাদের অন্তত শতকরা নব্বুই এই তাৎক্ষণিক সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত।

সবচেয়ে যেটা বেশি দুঃখের, এই মূর্খতার পরিবেশে, একদা যাঁরা সাক্ষর ছিলেন, তাঁরাও আজকাল নিরক্ষরতায় ফিরে যাচ্ছেন। প্রায় পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে সন্তোষকুমার ঘোষ যখন গল্প লিখতে শুরু করেন, আমি তাঁর অনুরাগী পাঠক ছিলাম। সে-যুগে তাঁর লেখার ভঙ্গিতে কোনো প্যাঁচ ছিল না, বাঙালি নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে অনাড়ম্বর স্পষ্ট চিত্রযোজনার মধ্যে নিবিড়-অন্তরঙ্গ

সংবেদনা ছিল। বিশেষ ক'রে, সীমিত পরিসরের মধ্যে 'কিমু গোয়ালার গলি' আশ্চর্য দ্যোতনাঘন। কিন্তু পতনের আবেগতরঙ্গ কে রোধ করবে, সন্তোষকুমার ঘোষ দু'দিন বাদে সংবাদপত্রের পৃথিবী দ্বারা 'আবিষ্কৃত' হলেন। এই আবিষ্কারে পার্থিব সুখসুবিধা নিশ্চয়ই অনেক আছে, কিন্তু আমার নিজের অকপট অভিমত ভদ্রলোককে তার জন্য ত্যাগস্বীকার করতে হয়েছে প্রচুর: যিনি একদা 'কিমু গোয়ালার গলি' লিখতে পেরেছিলেন, তাঁকে নামতে হয়েছে অনেক দূর।

'জল দাও'* বোধহয় প্রকাশকের ভাষায় 'উপন্যাস', যেহেতু একশো চোদ্দ পৃষ্ঠা জুড়ে কাহিনীটির বিস্তার। অথচ ছ' পৃষ্ঠায় এ-কাহিনী বলা চলতো; একমাত্র খবরকাগজের পৃথিবীর সংজ্ঞানুযায়ী পংক্তি মেপে পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা ছাড়া এই প্রগল্ভতার অন্য-কোনো অজুহাতই থাকতে পারে না। কাহিনী যেখানে বিস্তারের ভার সইতে পারে না, বেশি কথা সেখানে বলতে যাওয়া মানেই ন্যাকামি। 'জল দাও', আমার বিবেচনায়, পুরোটাই ন্যাকামি। তদুপরি ভাষা কদর্য। সন্তোষকুমার ঘোষ নিজের স্বাভাবিক ভাষাকে জীর্ণ বস্ত্রের মতো পরিত্যাগ করেছেন; আমার সন্দেহ, বোধহয় কেউ তাঁকে পরামর্শ দিয়েছে, বড়ো সাহিত্যিক হ'তে গেলে ভাষাব্যবহারে মহৎ-মহৎ ভাব আনতে হবে। কিন্তু সন্তোষকুমার ঘোষ আসলে সন্তোষকুমার ঘোষই; তিনি বুদ্ধদেব বসু নন, অন্নদাশঙ্কর রায়ও নন। বুদ্ধদেবের কাব্য-ছোঁওয়া গদ্য নকোল করা যায়, আত্মসাৎ করা যায় না, সন্তোষকুমার ঘোষের ক্ষেত্রে সে-গলদ্‌ঘর্ম প্রয়াস শোকান্তিক হয়েছে। অন্নদাশঙ্কর রায় স্বভাব-গুরুমশাই, চল্লিশ বছরের সাধনায় তাঁর গদ্যে এই গুরুমশাই-বৃত্তি সাবলীলতায় উদ্ভাসিত। কিন্তু সন্তোষকুমার ঘোষ, হয়তো অজ্ঞাতসারেই, তা অনুসরণ করতে গিয়ে যা দৃষ্টান্তিত করেছেন তা নিছক ডেঁপোমি।

এ-সমস্তই ঘটছে, লেখকরা যা খুশি তাই লিখছেন, লিখে পার পেয়ে যাচ্ছেন, বাহবা কুড়োচ্ছেন, তার কারণ একদিকে সমালোচনার অভাব, অন্যদিকে সংবাদ-পত্রের ছত্রচ্ছায়া। সংবাদপত্রের মালিকানার উচ্ছেদ না-ঘটাতে পারলে বাংলা সাহিত্য শিগ্‌গিরই আরো বহুগুণ ঘোরান্ধকার নরকগত হবে।

* জল দাও—সন্তোষকুমার ঘোষ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১২। দাম: তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

২

অভিমতটি উচ্চারণ করলে গলাধাক্কা খাওয়ার ভয়, কিন্তু বিবেকবোধের তাড়নায় বলতেই হয় : গেলো পনেরো বছরে বাংলা সাহিত্য যে-অধঃপাতে নেমে এসেছে তা যেমনই শোকের তেমনই বিস্ময়বহ। প্রশ্ন করা হবে : এই প্রতি-তুলনার মান কী, কোন্ সংজ্ঞার মারফতে আমি বিবেচনা করছি। যেহেতু বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে বাঙালির যোগ ক্ষীণ হয়ে এসেছে, ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষায় অথবা বিভিন্ন বিদেশী সাহিত্যে কী ঘটছে-না-ঘটছে তার নজির টানবো না। কূপমণ্ডুককে একমাত্র মনে করিয়ে দেওয়া চলে এই কুয়োরই জল কিছুকাল আগে কতটা স্বাদু ছিল।

সাময়িক পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বেড়েছে, অনেক নতুন প্রকাশক, কুড়ি-বছর আগেকার সঙ্গে মিলিয়ে হিশেব করলে দেখা যাবে বোধহয় দশগুণ বেশি বই প্রকাশিত হচ্ছে। শ্রীযুক্ত অজিত দত্ত-র বক্তিনাথ এখন আর একক নয়, সহস্র, এবং তারা লেখা মক্সো ক'রেই নিরস্ত নয় : সে-সব রচনা ছাপা হচ্ছে, বই হয়ে বেরোচ্ছে, সংস্করণ থেকে সংস্করণান্তরে সমৃদ্ধি কুড়োচ্ছে। লোকের কেনবার সংগতি বেড়েছে ব'লেই যে বইয়ের এবং পত্রিকার বিক্রি বেড়েছে স্রেফ তা নয়, লোকরুচি অনেকটাই নেমে এসেছে, ভালো বাঁধাই ও ছাপার ছলনায় অপকর্ষের চূড়ান্ত পর্যন্ত বিকিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা-চিন্তা-অনুভাবনা-আত্মজিজ্ঞাসা সব-কিছুর মান আপাতত নিম্নগহ্বরগামী : নরকে পৌঁছবার, এমন অবস্থা চলতে থাকলে, খুব বেশি বাকি নেই। সুতরাং হয়তো আলাদা ক'রে সাহিত্যচর্চার হতদ্দশাকে ধিক্কার দেওয়া সমীচীন নয়, লাভও নেই তাতে।

কিন্তু তাই বা বলি কী ক'রে? একশো বছর আগে বাঙালি উজ্জীবনের সূচনা হয়েছিল ভাষা ও সাহিত্যসাধনার মহৎ অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে। ভাষার গভীরে ডুবে গিয়ে উচ্ছল জল-কেলির মতো আনন্দ আর নেই : কল্পনার সব-ক'টি প্রত্যঙ্গ তাতে শিহরিত হয়ে ওঠে, নতুন বিভঙ্গ শেখে, দুঃসাহসের নতুন স্তরে পৌঁছবার প্রান্তে দ্বিধাতে আর দোলায়িত হয় না। আত্মপ্রসারের সহায়ক হিশেব আত্মবিশ্বাসের চেয়ে বড়ো জিনিশ নেই। তন্নিষ্ঠ সাহিত্যসেবা বাঙালিকে গর্ব করতে শিখিয়েছিল, কান্নাসর্বস্ব অবরুদ্ধ প্রলাপের মতো গর্ব নয়, জিজ্ঞাসার স্পর্ধিত গর্ব, বিশ্লেষণে আনন্দ খুঁজে বেড়াবার মতো অহংকার, প্রজ্ঞাকে বিভাসিত স্বর্গে উত্তীর্ণ করবার মতো প্রবল দার্ঢ্য। রামমোহন-মাইকেলের সময় থেকে

হিশেব করলে অঙ্ক না-মিলে পারেই না : বাঙালিমানস ভাষাসঞ্জাত, আশ্চর্যরকম ভাষানির্ভর, সাহিত্যের প্রেরণা না-থাকলে বাঙালি আবেগ মরুপথে বহু আগেই ধারা হারাতো, বাঙালি চিন্তায় শ্রান্তির ঢল নামতো হয়তো সেই প্রায় ষাট-বছর আগে প্রথম বঙ্গভঙ্গের মুহূর্তে।

বাঙালি টিঁকে ছিল কারণ সাহিত্য ছিল উজ্জয়িনী। সে-সাহিত্য জাতিকে সংহতি শিখিয়েছিল, বিচার-বিশ্লেষণ-বুদ্ধিবিস্তারের স্বাদে জনসাধারণকে আপ্লুত ক'রে রেখেছিল। গত দেড়-দশকের অধোগতি তাই খুব নিরুত্তাপ হয়ে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। চিন্তা-শিক্ষা-ভাবনার মান নেমে আসছে, বাঙালি উচ্ছন্নে যাচ্ছে, এই সংক্রান্তিক অবস্থায় সাহিত্যসাধনার দায় বরঞ্চ তাই অত্যন্ত বেশি। কার্যকারণ সম্পর্কের এ-রকম ব্যাখ্যাই অধিকতর যুক্তিসহ : সাহিত্য তার ধ্রুবতারা থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে ব'লেই চারদিকে এত অপকর্ষের বিক্রম।

প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে তা বাংলা গদ্যের উপর উচ্ছৃঙ্খল ঘোড়সওয়ার-গিরি। উপরে যা উল্লেখ করেছি, যেহেতু প্রকাশের সুযোগ-সুবিধা অনেক বেড়েছে, প্রায় যে-কেউই গল্প-উপন্যাস লিখছেন। কিন্তু যিনি প্রথমত কোনোদিন ভাষা নিয়ে সাধনা করেননি, তাঁর পক্ষে সে-ভাষার মধ্যবর্তিতায় কাহিনী ব্যক্ত করতে যাওয়া অন্যায় বাড়াবাড়ি। আপাতবিচারে মনে-হ'তে পারে, আমিই অন্যায় কথাবার্তা বলছি, হালে যাঁরা লিখছেন, তাঁদের অনেকেই বেশ-লিখে-যেতে-পারেন-গোষ্ঠীভুক্ত, স্বাচ্ছন্দ্য তাঁদের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। এই নাগরিক গুণের উপস্থিতি মেনে নিয়েও আমি বলবো, দাও ফিরে সে-অরণ্য, লও এ-নগরী। যা সচ্ছলতা ব'লে মনে হয়, আসলে সেটা অপকৃষ্ট চটুলতা। এই চটুলতা না-থাকলে চলনসই সাংবাদিক হওয়া সম্ভব নয়, খবরের কাগজে অল্প সময়ের মধ্যে কোলাম ভরাতে হ'লে যে-ক'রেই-হোক দ্রুত স্থানপূরণের কায়দা আয়ত্তে আনা প্রয়োজন। কিন্তু মোহনবাগান ক-'গোল কাদের ঠুকে দিল যে-ভাষায় লেখা চলে, তা দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। গভীর অবসাদের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়, গদ্যপটিয়সী বলে সম্প্রতি যাঁরা নাম কিনেছেন, বস্তায়-বস্তায় গল্প-উপন্যাস লিখছেন, তাঁদের বাক্যগঠন কত দুর্বল, তাঁদের শব্দজ্ঞান কত সীমিত, কোনো গম্ভীর-আশ্চর্য বিন্যাসের দোলা সঞ্চার করা তাঁদের ক্ষমতার কত যোজন দূরে। এক নজর তাকিয়েই অভিজ্ঞানবসন্তে পৌঁছুতে হয় : একদা যাঁরা সাংবাদিক ছিলেন, এখন তাঁরা সবাই সাহিত্যিক।

আরো-একটা জিনিশ সহজেই ধরা পড়ে। যাঁরা লিখতে জানেন তাঁরা সবাই যে চিন্তা করতে জানেন, জিজ্ঞাসায় দীর্ণ হ'তে পারেন তা নয়, কিন্তু যাঁরা আদৌ লিখতেই জানেন না তাঁদের অপসৃষ্টি থেকে চিন্তাপ্রতিভা বা বিশ্লেষণ বিদ্যুৎচ্ছুরিত হবে, এমন আশা করা পুরোপুরি অর্থহীন।

কোনো শ্রুতিনির্ধারণের চেষ্টা করছি না, আমার এই উক্তির প্রমাণ মেলে সম্প্রতি কী-ধরনের কাহিনী বেশি বা কম লেখা হচ্ছে, তা থেকে। ১৯৪০ সাল থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত দেশ সমস্যা ও সংকটে ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে, কিন্তু উপন্যাস-হিশেবে যা-যা প্রকাশ করা হচ্ছে, তালিকার দিকে তাকিয়ে দেখুন, অধিকাংশই একশো-দুশো-তিনশো বছরের পুরোনো নিরাপদ ইতিহাসের পাতা-ছেঁড়া খণ্ড ঘটনার সঙ্গে গোঁজামিল দেওয়া, পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনের ভাষায় যাকে বলা হয় রম্যকাহিনী। চিন্তায় ধৃতি না-থাকলে, কল্পনা সংকীর্ণ হ'লে উপস্থিত সমস্যার সঙ্গে মুখোমুখি বোঝাপড়া সাহসে কুলোয় না, অতএব ইতিহাসে পলায়ন, অথচ ইতিহাসেই যে-বর্তমানের অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে সেরকম কোনো আলোকিত সমন্বয়ও এ-সমস্ত লেখায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

কবিতা সম্বন্ধেও প্রায় অনুরূপ উক্তি করতে হয়: এর চেয়ে মুহ্যমান স্তব্ধতা বুঝি ভালো। কারণে মনে হয় না গত দশ বছরে বাংলা কবিতা সামান্যতমও এগিয়েছে। অবশ্য কিছু-কিছু প্রভেদ আছে। কবিতা-রচনার সংখ্যা বেড়েছে, প্রাকরণিক দক্ষতা অন্তত কমেনি। যদি গড়পড়তা কথা হয়, হয়তো দেখা যাবে উত্তম কবির সংখ্যা উত্তম গল্পলেখকের অনুপাতে বেড়েই গিয়েছে। কিন্তু মুস্কিল হলো উত্তম কবি হ'লেই কবিতা উত্তম হয় না। যা অতিরিক্ত প্রয়োজন তা চরিত্রতীক্ষ্ণতার, আবেগস্বাতন্ত্র্যের। তরুণতম কবিদের মধ্যে অন্তত দশ-পনেরো জনের রচনা আমি একাকার মিলিয়ে নেওয়ার পর আর ফের আলাদা ক'রে খুঁজে বের করতে পারি না: সকলেরই এক আবেগ, এক পদ্ধতি, সমরীতিনিষ্ঠা, সমশব্দসম্ভোগ। এই সর্বজনীন অবৈকল্য গোষ্ঠীপ্রেমের পরিচয় বহন করে, কিন্তু তার বেশি আর কিছু না। কবিরা ক্ষুব্ধ হবেন, কিন্তু যে-তুলনাটি মনে আসে তা টেবিলের উপরে দাঁড়ানো ব্যায়াম-শিক্ষকের নির্দেশে কতিপয় সুবোধ বালকের শরীর সঞ্চালনের।

সাহিত্যসাধনায় যখন শ্রান্তির লক্ষণগুলি স্পষ্ট হয়ে আসে, তখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন রূঢ়, কর্তব্যঅপরাঙ্মুখ সমালোচকের। জীবনানন্দ সমালোচকের

যে-ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিলেন তার প্রত্যক্ষ কারণ ছিল, কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও বলতেই হয় সমালোচনায় অনেক ক্ষেত্রে রূঢ়তা মমতারই রূপান্তর। যাকে ভালোবাসি তার মহৎ রূপ দেখতে চাই, মহৎ ক'রে পেতে চাই তাকে, মহত্ত্বের স্বর্গে সমাসীন রাখতে চাই। শ্রেষ্ঠ সমালোচকের মন তাই সর্বদা ভয়ে-ছাওয়া, প্রেয় যাতে স্বর্গস্খলিত না-হ'তে পারে সেজন্য তাঁর অনুশাসন আবিষ্কার ও প্রয়োগ। কোথায় ফাঁক থেকে গেছে, কোথায় আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে, কোন্‌টা মেকি, কোন্‌টা সাচ্চা, কল্পনার স্পর্ধা কোথায় সার্থকতার জানু ছুঁয়েছে, কোথায় মুখ থুবড়ে পড়েছে : ক্রমানুক্রমিক পর্যায়ে সে-কাহিনী লিপিবদ্ধ করাই সমালোচনা। মহৎ সমালোচনা বাদ দিয়ে মহৎ সাহিত্যসৃষ্টি অসম্ভব। সমালোচনা সাহিত্যের বিবেক, সাহিত্যের কষ্টিপাথর।

এখানেও কথা ঢাকবার কোনো মানে হয় না : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র পর বাংলা সাহিত্যে সমালোচনা স্তব্ধ হয়ে আছে। কেউ-কেউ সমালোচনার নামে গীতি-কবিতা লিখেছেন, একেবারে হালে তুলনামূলক বিচারের প্রহসনে নানা সাহিত্য থেকে অনূদিত উদ্ধৃতির ছড়াছড়ি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু পরিশ্রমী, নিয়মনিষ্ঠ সমালোচনা প্রায় অন্তর্হিত। বিশ্লেষণ, বিবেচনা, এমনকি সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের যেখানে অভাব, সেক্ষেত্রে সমালোচনা সম্ভব নয়। অতএব মুড়িমুড়কি একাকার হয়ে যাচ্ছে, ভুঁইফোড় রাজার সম্মান পাচ্ছে।

এতগুলি কথা অবতারণা করতে হলো 'বাঙলা সনেট' নামে একটি সংকলন হাতে পেয়ে, যা 'বাঙলা সনেটের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সশ্রদ্ধ নিবেদন'। বইটির সৌষ্ঠব ভালো, বাঁধাই মনোরম। কুড়ি-বছর আগে বাংলা বইয়ের এমন দেহসজ্জার কল্পনা করা যেত না। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। ঘুরিয়ে এটাও বলতে পারি, কুড়ি-বছর আগে গ্রন্থপ্রকাশে এমন অপচয় কল্পনা করা যেত না।

এতটা রূঢ়ভাষণ কেন করছি? সংকলন সমালোচনারই একটি প্রকরণ। বাছাই করা মানে বিচার করা, অপকৃষ্ট অথবা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টদের পাশে ফেলে উৎকৃষ্টদের জড়ো করা। এরকম সংগ্রহের মধ্যে তাই একটি নিহিত মন্তব্য থাকে, মুখবন্ধ লিখে বিস্তার ক'রে না-বললেও যা হৃদয়ঙ্গম করতে বেগ পেতে হয় না। আলোচ্য সংকলনের পিছনে এমন-কোনো উদ্দেশ্য ছিল বা আছে তা মনে করলে ভুল হবে। প্রধান সম্পাদক মস্ত-এক মুখবন্ধ ফেঁদেছেন, যেটা প'ড়ে সহসা আরো-একবার প্রমাণ পেলাম

যে আজকাল যে-কোনো রচনাই ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা চলে। এমন নয়-যে মুখবন্ধটি পরিশ্রমের সঙ্গে লেখা নয়। লেখক যথেষ্ট অধ্যবসায়ের সঙ্গে সনেটের লক্ষণ ও গুণবর্ণনা করেছেন, সনেট কয় প্রকার তা বিশদ করবার চেষ্টা করেছেন, সনেটে কোন্ মিল সাধু কোন্‌টা অশ্রেয় সে-সম্পর্কে মত ব্যক্ত করেছেন, ব্যাকরণানুগ মিল্টন-শেক্স্‌পীয়র-ওয়র্ডসওয়র্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সবশেষে বাংলা ভাষায় কারা-কারা কী ধরনের সনেট লিখেছেন তার উপর বিস্তারিত টীকা। 'বাঙলা সনেটের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে' যে-গ্রন্থের প্রকাশ, তার ভূমিকা হিশেবে এরকম শাদামাটা প্রবন্ধ, যাতে কোনো আলোকপাত নেই, এমনকি সাধারণ রচনা-সৌকর্য পর্যন্ত নেই, নিশ্চয়ই খুব শোকাস্তিক ব্যাপার। মুখবন্ধটির উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন এই জন্য যে তাতে উত্তেজনার কিছু নেই, নতুন প্রজ্ঞা নেই, দুঃসাহসী এমন-কোনো উক্তি নেই যে ভুল শোধরাবার ছলেও ইচ্ছা হয় কিছু মন্তব্য যোগ ক'রে দিই। এই মুখবন্ধ না-লেখা হ'লে কোনো ক্ষতি ছিল না। লেখা হয়েছে তার কারণ বাংলা সাহিত্যের মান ঠিক এতটাই নেমে এসেছে।

তা হ'লেও কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করতেই হয়। 'সনেটের নামে অজস্র চোদ্দ চরণের কবিতা বাঙলা কাব্যের অঙ্গন ভরিয়ে তুলেছে', এই উক্তি করার অব্যবহিত পরেই সম্পাদক বলছেন যে-কবিতাগুলিকে 'মোটামুটিভাবে' তাঁর কাছে সনেট ব'লে মনে হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে সংকলন করেছেন। কিন্তু, যেহেতু সনেট একটি সুবিশেষ নিয়মবদ্ধ ব্যাপার, তাতে 'মোটামুটি'-র একেবারেই স্থান নেই: হয় সমস্ত ব্যাকরণ-ও প্রকৃতিলক্ষণ-সংযুক্ত নিটোল ব্যাপার হবে, তা হ'লে তা সনেট; নয়তো নিয়মস্খলন হবে, তখন তা সনেট হবে না; মধ্যবর্তী কোন পর্যায় নেই। সম্পাদকদ্বয় যে একশোএকুশটি কবিতা সংগ্রহ করেছেন, তার প্রত্যেকটি চতুর্দশপদী সন্দেহ নেই, তবে সত্তর-আশিটির বেশি আদপেই সনেট নয়। সুতরাং তাঁদের মুখ্য, এবং সহজতম, কর্তব্যপালনেই সম্পাদকদ্বয় অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

অথচ এমন নয় যে বাংলা কাব্যে সনেটের সমৃদ্ধি নেই। মাইকেল থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত প্রচুর সার্থক সনেট রচিত হয়েছে, এবং তাদের অনেকের সঙ্গেই বাঙালি পাঠকের আশৈশব পরিচয়। এক গ্রন্থে এই রচনাগুলি সংগ্রহিত হ'লে একটি মূল্যবান কাজ সম্পন্ন হতো। কিন্তু, ঐ যা মুখবন্ধে বলা হয়েছে, সংকলনের কাজ চলে সংকলনকর্তার 'রুচি ও বিচার অনুযায়ী'। গ্রন্থটির প্রায় অর্ধেক কবিতা বাংলার নিকৃষ্টতর চতুর্দশপদীদের কোনো সংকলন হ'লে তাতে

সম্মানের সঙ্গে স্থান পেতে পারে এমন আমার সন্দেহ। বিশেষ ক'রে সম্পাদকদ্বয় অবিচার করেছেন দেবেন্দ্রনাথ সেন, মোহিতলাল মজুমদার, অজিত দত্ত এবং বিষ্ণু দে-র রচনা নির্বাচনে; অথচ এটা নিঃসন্দেহ এই চারজনই বাংলা সনেটের প্রধানতম পুরুষ।*

* বাঙলা সনেট—জীবেন্দ্র সিংহ রায় ও শক্তিব্রত ঘোষ সম্পাদিত। কথাশিল্প, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা। দাম পাঁচ টাকা।

স্কুলে ভুল নেই

সমর সেন যখন বিখ্যাত, আমি তখনো স্কুলের ছাত্র। বাংলাদেশের মফস্বল, রাস্তায় ধুলো-কাদা কিন্তু সেই সঙ্গে আকাশে কৃষ্ণচূড়া গাছের ঝলক, কিছু রাজনীতির আলোড়ন কিছু সাহিত্যকবিতাগানের মর্মর, শান্তশ্রীমণ্ডিত ছোটো একটি বিশ্ববিদ্যালয়, ঘোড়াগাড়িসাইকেলরিক্সামুখর মফস্বল। কলকাতা, উজ্জ্বল কলকাতা, 'কবিতা', 'পরিচয়' ইত্যাদি পত্রিকা যেখান থেকে বেরোয় সেই মায়াবী কলকাতা, সেই কলকাতার একটুকু কথা শুনি, মফস্বলের হাবা ছেলে আমরা, তাই দিয়ে মনে-মনে ফাল্গুনী-বৈশাখী-শ্রাবণী সব-কিছু রচনা করি। রাজনীতি নিয়ে তর্ক, কবিতা নিয়ে জটলা। রুদ্ধশ্বাস বিস্ময়ে পরস্পরকে আবৃত্তি ক'রে শোনাই : 'রুদ্ধশ্বাস, কত পথ পার হয়ে এলাম, পার হয়ে এলাম মন্থর কত মুহূর্তের দীর্ঘ অবসর'। অথবা কালিঘাট ব্রিজের উপর লম্পটের পদধ্বনি নিয়ে উচ্ছলিত হই, গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধ'রে ব্রহ্মচারী বেশে পণ্ডিচেরি যাওয়ার প্রসঙ্গে কৌতুক খুঁজি। স্কুল থেকে আমাদের কলেজে উন্নতি হলো—মফস্বলেরই কলেজ—,সমর সেন দিল্লিতে, হয়তো সে-রাজধানী থেকেই পাঠানো কিছু ক্লান্ত-কিছু গম্ভীর-কিছু প্রত্যয়-কিছু হয়তোবা বিদ্রূপ-মেশানো সব পঙ্‌ক্তি : জোসেফ স্তালিন কোথায় ট্রাক্টরের দিন আনলেন, ভুলে-ভ্রান্তিতে-উৎকণ্ঠায় নতুন জীবনের ছাপ আমাদের চেতনায় পড়লো, দেশে স্বাধীনতা আনবেন ভদ্রলোক নন্দদুলাল সুতরাং কুরুক্ষেত্রে ক্লীবের পন্থা ধরো, যে সরায় ময়লা, দুধ দেয় যে গয়লা তাদের দোস্তি ছাড়া কেন গতি নেই, আমাদের হাত থেকে রেহাই পাবে না যে-সব নবেজান সামুরাই, নানা প্রসঙ্গ-অধ্যুষিত ঐতিহাসিক সব পঙ্‌ক্তি। এরই মধ্যে, হঠাৎ বিদ্যুতের ঝিকিমিকি-ছড়ানো আশ্চর্য পদসংযোজন : 'জড়োয়া গয়না

গায়ে ভ্রান্তির গণিকা এখনো তোমাকে ডাকে রঙিন গলিতে'।

সমর সেন কবিতা লেখা বন্ধ করলেন, আমার মফস্বলশৈশব কাটলো। তেভাগা আন্দোলন, দেশভাগ, বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা, মিছিল-বোমা-ধর্মঘট, রোজেনবর্গদের ফাঁসি, পিকাসোর পাখি-আঁকা বিশ্বশান্তি আন্দোলন, নেতাদের কেমন বুড়িয়ে যাওয়া, পুরোনো বক্তৃতার চর্বিত-চর্বণ। বাংলাদেশ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলাম আমি। সমর সেন আর কবিতা লেখেন না, কোথায় যেন গুজব শুনলাম বুদ্ধদেব বসু-কে বলেছেন, 'কবিতা এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দুটো থেকেই মুক্ত হয়েছি,' আমাদের সুতরাং পুরনো পঙ্‌ক্তিগুলিকেই সখেদে চেখে-বেড়ানো। বছরের পর বছর আরো গড়ালো, দেশে—এমনকি বাংলাদেশেও—কমিউনিস্ট পার্টি ভদ্দরলোক হলো, যাঁরা গণনাট্য-সংঘে গান গাইতেন, নাটক করতেন, তাঁরা আস্তে-ধীরে সচ্ছলতার মুখ দেখলেন, সমর সেন, ফের গুজবেই জানলাম, দিল্লির রেডিয়ো ছেড়ে কলকাতায় খবরকাগজে, খবরকাগজ ছেড়ে মস্কোতে বিদেশী সাহিত্য প্রকাশনাগারে। আমি নিজেও বিদেশে, শচীন চৌধুরীর ইকনমিক উঈকলি-তে মাঝে-মাঝে সমর সেনের মস্কো থেকে লেখা চিঠি। সমর সেনের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় পর্যন্ত নেই জেনে শচীনদার কৌতুকমেশানো বিস্ময়। চকিত হয়ে লক্ষ্য করতাম, এমনকি সমর সেনের ইংরিজি গদ্যেও সেই শাণিত, নাস্তিকতার-আভাস-আসা সুর।

আলাপ হলো পনেরো বছর বাদে, ১৯৬৩ সালে, বাংলাদেশে চাকরি করতে ফিরে এসে। চীনেদের সঙ্গে সরকারি হামলা, কমিউনিস্ট পার্টির বড়ো শরিক ফের কারাগৃহে কিংবা আত্মগোপন ক'রে, স্রেফ চটকদার দেশপ্রেমের অশ্লীলতায় ক্লেদাক্ত হাওয়া, সবাই যেন প্রহর গুণছিল এর পর কী হয়। কার সঙ্গে দেখা করতে যেন একটি সংবাদপত্রগোষ্ঠীর দপ্তরে গিয়েছিলাম, যাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম তিনিই সমর সেনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। প্রায় পনেরো বছর আগে যে-কবিতা লেখা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন সে-সব কবিতার মতোই মিতভাষী। দেশপ্রেমের-উদ্গারে-ম'ম'-করা মধ্য কলকাতার সেই দপ্তর, নিশ্বাস ফেলেন কী ক'রে তা নিয়ে আমার ঈষৎ বিস্ময়, 'ছ'মাস-আগে-অবস্থা আরো-ঢের-খারাপ-ছিল', এরকম একটা-দুটো উক্তি, আলাপ আর-বেশি এগোলো না, হয়তো ওঁর অন্যত্র যাওয়ার তাড়া ছিল, নয়তো আমার।

তারপর বছর খানেকের মধ্যে তিন-চার বার আরো দেখা হয়েছে সমর

সেনের সঙ্গে, এর-ওর-তার বাড়িতে, নয়তো কফিহাউসে। কোনোবারই কথা বিশেষ-কিছু হয়নি, শুধু বোঝা যেত ভদ্রলোক কবিতার ন্যাকামি থেকে দূরে থাকতে চান। ১৯৬৪ সাল, কলকাতায় নতুন ক'রে দাঙ্গা, বস্তিতে-বস্তিতে গরিব মুসলমান সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি পুড়োনো, 'জাতীয়তাবাদী' খবরকাগজগুলির বীভৎস ইন্ধন জোগানো। শুনলাম সমর সেন কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। আমরা বেশির ভাগ লোক আদর্শ জিনিশটাকে জীবিকানির্বাহের হিশেবনিকেশের বাইরে ফেলে রেখে সন্তর্পণে কালাতিপাত করি, সমর সেন কাজ ছেড়ে দিয়েছেন শুনে লজ্জায় বিবেক আরো-একটু কুঁকড়ে এলো।

আরো কয়েক সপ্তাহ যেতে শুনতে পেলাম কলকাতা থেকে ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরোচ্ছে—'নাউ'—, সমর সেনকে সম্পাদক হবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে, এবং ভদ্রলোক রাজি হয়েছেন। পত্রিকা বেরোতে-বেরোতে অবশ্য অক্টোবর মাস প'ড়ে গেল, আস্তে-আস্তে আমিও যেন কোন্-কোন্ ঘটনাপরম্পরায় 'নাউ'-র অন্দরমহলে প্রবিষ্ট হলাম।

সব-মিলিয়ে তিন বছরের কিছু বেশি সময় পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম ; পরিকল্পনা, প্রকাশ, উন্মেষ, প্রসার, এ-বছরের শুরু পর্যন্ত—যখন সমর সেন বিতাড়িত হলেন। এই পুরোটা সময় বিখ্যাত সমর সেনকে সম্পাদক হিশেবে খুব কাছে থেকে দেখেছিলাম, আমার কৈশোরকে খুব একটা এক-হাত নেওয়ার মস্ত সুযোগ ছিল সেটা, এবং যার আমি পূর্ণ সদ্ব্যবহারই করেছিলাম। 'নাউ'-র বোধ হয় কোনো বিশিষ্ট আড্ডা ছিল না। সমর সেনের নিজের যে-আড্ডা, তার সঙ্গে পত্রিকাটির চরিত্রের প্রতীপসম্পর্ক শেষদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল ; ভদ্রলোক এখন যে-পত্রিকা বের করছেন, তা-ও বোধহয় তাঁর আড্ডার আবহাওয়াকে দীর্ণ ক'রেই। যিনি একদা অম্লান কবুলতিতে লিখতে পেরেছিলেন : 'জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে, চেতনার ছাপ জীবনধারাকে নয়,' তিনি কী ক'রে নিজের পরিপার্শ্বকে এভাবে অতিক্রম ক'রে চিন্তার অবৈকল্যে স্থিত থাকতে পারেন, তা নিয়ে প্রায়ই আমি ভেবেছি। আসলে আমাদের বাঙালিদের আড্ডাগুলি বোধহয় নির্মোকের মতো, অভ্যাসের বশে আমরা প্রবেশ করি, বেরিয়ে আসি, অন্তর্গত ভাবনাবোধআবেগাদির সূত্রের সঙ্গে তাদের কোনো সাযুজ্য নেই।

সমর সেনকে সম্পাদকরূপে দেখে যা আমাকে অবাক করেছিল : ভদ্রলোকের ভুলে ভুল নেই। একটি জীবনদর্শন চেতনার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে,

ট্রামে-বাসে বহুতর শ্রেণীর-প্রকৃতির-সমাজের লোকের সঙ্গে স্মিত হেসে কথা বলছেন, রূঢ়তার প্রসঙ্গ কাছাকাছি আসছে না, বিমিশ্র আড্ডায় সন্ধিঅভিসন্ধিসম্পন্ন ক-খ-গ-র বিচিত্রবাণী শুনছেন, কিন্তু বুধবার সন্ধ্যাবেলা পত্রিকা যখন বেরোলো, অভীষ্টে সামান্যতম বিচ্যুতি নেই, প্রথামত চক্ষুলজ্জার জালে জড়িয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা নেই। যা বলা দরকার, তা স্পষ্ট ক'রে ব'লে দেওয়া হচ্ছে: ধাপ্পা-বুজরুকি-ন্যাকামি নির্দয়তার সঙ্গে উদ্ঘাটিত করা হচ্ছে: যে-সমাজশত্রুদের চাবকানো দরকার, তাদের চাবকানো হচ্ছে।

আমার নিজের মনে হয়, বাংলাদেশের ষাটের দশকের সামাজিক ইতিহাসে সময় সেন-সম্পাদিত 'নাউ'-র উল্লেখ না-থাকা ঘোর অসম্পূর্ণতা হবে। এই দাবিঘোষণায় হয়তো কেউ-কেউ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠবেন। একে সাপ্তাহিক, তায় ইংরেজিতে, পরম কাটতির সময়েও বাজারে বিক্রি দশ হাজার ছাপিয়ে যায়নি, এমনধারা পত্রিকার প্রভাব আদৌ সর্বব্যাপী হবার নয়, সুতরাং, পত্রিকাটির কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে কিংবা লেখা থাকা উচিত এটা বলা, অনেকেই মনে হয় বলবেন, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। কারা পড়তো 'নাউ'? দু-চারজন কেরানি, দু-চারজন স্কুল মাস্টার, কিছুসংখ্যক অপোগণ্ড ছাত্র, সদাগরি দপ্তরের একজন-দুজন মাঝারি সায়েব, তাছাড়া কয়েকটি বিশেষ দলভুক্ত পেশাদার রাজনৈতিক কর্মীরা। প্রতি সপ্তাহে নেহাৎই এঁদের জন্য কলম মক্সো করা, ইংরেজিতে শব্দের-পর-শব্দ বসিয়ে যাওয়া, এঁদেরই জন্য আবেগে উদ্গাত হওয়া, বিদ্রূপে তির্যক হওয়া, এঁদেরই লক্ষ্য ক'রে তত্ত্বের সরলীকরণ, তথ্যের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যান। দেশে ইংরেজনবিশের সংখ্যা ক্রমশ ক্ষীয়মাণ, চায়ের-কফির পেয়ালায় গরম-হ'তে-চাওয়া মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত হাড়গিলেদের জন্য কেন তা হ'লে প্রতি সপ্তাহে কথার-উপর-কথা-বসানো? বিদেশে অঙ্গুলিমেয় কয়েকজন অবশ্য 'নাউ'-র ইংরেজি বাচনের তারিফ করতেন, রচনাশৈলীতে প্রতিভার দর্শন পেতেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তাতেই কী সব? বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অলিগলিতে তার কতটুকু প্রশ্বাসপ্রবাহ?

ভেবেচিন্তেই বলছি, এবং যতটা সম্ভব আবেগনিরপেক্ষ হয়ে। কৃষিকর্মী-মজুরশ্রেণী নিয়ে যতই বক্তৃতাকণ্ডূয়ন করি, এখনো বাঙালি জীবনযাত্রায়-সামাজিক উপপ্লবে মধ্যবিত্ত মানসতা প্রধান কর্তৃপুরুষ। মধ্যবিত্ত, নাগরিক, কলকাতাসমাচ্ছন্ন বাঙালি চেতনা: লিন পিয়াও আপাতত পরাহত, এমনকি

নকশালবাড়ির প্রসঙ্গেও যদি আমাদের কারো-কারো দু'চোখ উজ্জল হয়ে ওঠে, তা হ'লেও, সেখানেও, জঙ্গল সাঁওতালের নাম ছাপিয়ে কানু সান্যালের উল্লেখ। এই অবস্থা চলবে আরো দীর্ঘ সময় ধ'রে, হয়তো আরো কুড়ি বছর, হয়তো তিরিশ বছর, যতদিন না নাগরিক প্রভাব বাঙালির জীবনকলায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে আসে, যতদিন না কৃষককুল নিজেদের স্বভাবজ চিন্তায় নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে উপনীত হ'তে পারেন, যতদিন না কারখানার মজুর কেম্‌ব্রিজে-পাশ-শ্রমিক-নেতাকে রদ্দা মেরে চেয়ার থেকে ফেলে দিয়ে নিজে সে-চেয়ারে ব'সে কেম্‌ব্রিজে-পাশ-কারখানা-মালিকের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁতখিঁচুনি দিতে পারেন। এই অন্তর্বর্তী সময়ে, সামান্য কয়েক হাজার পাঠকের জন্যই, কাগজে কালি বুলোনো, রাগে বিস্ফারিত হওয়া, ঘৃণায়-ব্যঙ্গে সপ্তাহের-পর-সপ্তাহ ধ'রে পাতা ভরানো, ভাবী সমাজের কাঠামো নিয়ে কথার-পিঠে-কথা সাজিয়ে স্বপ্নবুনন। ইচ্ছে থাকলেও আমরা স্থানকালনির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে যেতে পারি না, সুতরাং গণ্ডিকে মেনে নিয়ে যতটুকু বিবেকের দায় মেটানো সম্ভব, ততটুকুই তৃপ্তিদায়ক। তাছাড়া, অন্য কতগুলি গণ্ডির অনুশাসনও আপাতত মেনে নিতে হয়: সাধ্যের গণ্ডি, এই বৈশ্য পৃথিবীতে সামর্থ্যের গণ্ডি। সুতরাং যদি কোনো ইংরেজি পত্রিকার সুযোগই ব্যবহার করতে হয়, বাধ্য হয়ে তা-ই।

আরোপিত শৃঙ্খল মেনে নিয়েছিলেন সমর সেন। কিন্তু সেই শৃঙ্খল সত্ত্বেও ঐ তিন বছরের মধ্যে বাঙালি সমাজের জন্য যতটুকু করতে পেরেছিলেন তিনি, তার তুলনা নেই। ১৯৬৩-৬৪ সালের স্তিমিত বাংলাদেশের, নির্বাপিত কলকাতার কথা একবার ভাবুন। ভয়ংকর তমিস্রার দিন গেছে তখন: ফেউ আর সুবিধাবাদীদের রাজত্ব চলছে, প্রতিদিন খবরকাগজে কূপমণ্ডুক আস্ফালন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'চীন'-এর সঙ্গে 'রে হীন' মিল দিয়ে পদ্য ফাঁদছেন, যুদ্ধের জিগির তুলে কতিপয় তস্কর সাধারণ মানুষের সর্বস্ব নিংড়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেটুকু বলবার সাহস কারো নেই, নতুন দিল্লি থেকে অদ্ভুতকিম্ভূত যা-যা অশ্লীল মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে, সঙ্গে-সঙ্গে এমনকি এই বাংলাদেশেও তাদের ভয়াবিষ্ট পুনরাবৃত্তি, যাঁরা একদা 'প্রগতিশীল' খেতাব এঁটে শৌখিন রাজনীতি-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা করতেন, তাঁরা হীনমন্যতার কম্বলে মাথা জড়িয়ে খাটের তলায় ঘুপ্‌টি মেরে অবস্থান করছেন; স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার সমস্ত বাসনা-প্রবৃত্তি বিসর্জন দিয়ে সর্বত্র এক শুক্কার-উদ্রেককারী আর্যাবর্তপ্রীতি। হয়তো ভুল বললাম, বলা উচিত ছিল

আর্যাবর্তভীতি। সেই যে তৃতীয় শ্রেণীর খোট্টা কবি একদা গান বেঁধেছিলেন, 'জাগে নবভারতের জনতা, এক জাতি এক প্রাণ একতা', সেই জাগৃতির অশ্লীলতায় পৌঁছুতে খুব-একটা বাকি ছিল না যেন তখন।

১৯৬২ সালের অক্টোবর মাস থেকে যে-নবভারত নতুন দিল্লির কলকাঠি-নাড়ানেওয়ালারা বাস্তবে পরিণত করতে চাইছেন, তা বড়োই বীভৎস ব্যাপার: সেই ভারতবর্ষে হিন্দুয়ানির প্রচ্ছন্ন গোঁড়ামি, অন্ধতা, হিন্দিভাষার সার্বভৌমত্ব, বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে গভীর অনীহা, পরমতঅসহিষ্ণুতা, গোমাতার আরাধনা, যে-কোনো সাম্যভাবনা সম্বন্ধে উৎকীর্ণ সন্দেহ, মধ্যযুগে পুনঃপ্রস্থানের লালায়িত আগ্রহ। বর্বরতার প্রচ্ছায়ায় জোর ক'রে আমাদের হাত-পা বেঁধে একজাতি একপ্রাণ বানাবার এক মস্ত চেষ্টা চলছে। এমন নয় যে যাঁরা শাসনযন্ত্রের হাল ধ'রে আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই স্পষ্ট অভিব্যক্তিতে এ-ধরনের উদ্দেশ্য বিবৃত করছেন, এমন কেউ-কেউও নিশ্চয়ই আছেন যাঁদের মানসিকতার অনুরাগ সম্পূর্ণ অন্য, কিন্তু তা হ'লেও মনে হয় প্রয়াসের মুখ্য প্রবণতা এই বলাৎকারসাধনের দিকে।

দেশের বুদ্ধিজীবীরা হয় চুপ, নয় শেয়ালের দলে নাম লিখিয়েছেন, অনেকেরই প্রাক্তন রাজনৈতিক সৎসাহস স্তিমিত অথবা মৃত, পাঁচ বছর আগে সত্যিই ভয় ঢুকেছিল বুঝি বা আমরা অচিরে অশ্লীলতার বন্যায় ডুবে যাবো, সত্তাপরিচয়হীন হয়ে যাবো; বাংলাদেশ, এমনকি এই দু'টুকরো-হওয়া বাংলাদেশও, আর থাকবে না, ভারতের এক সামান্য খণ্ডে পরিণত হবে; হয়তো পঁচিশ বছর, হয়তো পঞ্চাশ বছর, কোনোক্রমে ভাষার আলাদা রূপটা বজায় থাকবে, তারপর তা-ও হিন্দির অপভ্রংশে রূপান্তরিত হয়ে মিলিয়ে যাবে; রবীন্দ্রনাথের গানের হিন্দি অনুবাদ আমরা গাইবো; জনসংঘের নেতারা রাজা হবেন; মার্কিনরা আমাদের সভ্যতা শেখাবে; কুচকাওয়াজ করবো।

এরকম আতঙ্ক ১৯৬৩ সালে হওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল। এমনকি বাংলাদেশেও পণ্ডিত-অধ্যাপকরা ভয়ে নীল হয়ে আছেন, নয়তো 'জাতীয়তাবাদী' খবরকাগজ-গুলির পুজা-আরাধনা ক'রে দু'পয়সার ব্যবস্থা করছেন, যা চিরাচরিত মধ্যবিত্ত প্রস্থান। সমর সেন 'নাউ' পত্রিকা মারফৎ মানসিকতার মোড় ফিরিয়ে দিলেন, নপুংসকরা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলো। কিছুটা বিদ্রূপে, কিছুটা ব্যঙ্গে, কিছুটা তাচ্ছিল্যে, কিছুটা ঘৃণায়, আর্যাবর্তমন্যতাকে দু'দিনেই নাজেহাল-নাস্তানাবুদ

করলেন ; যে-সাহসে আমাদের জন্মগত অধিকার, তাকে ফিরিয়ে আনলেন। সমাজতন্ত্রের যে-স্বপ্ন বাদ দিয়ে নতুন ব্যবস্থার বিন্যাস অসম্ভব, সেই স্বপ্ন তার নিটোলতা নিয়ে ফিরে এলো। মোহ্যমান-ঘোর-থেকে-মুক্ত এই বাংলাদেশে গত তিন-চার বছরে তারপর অনেক-কিছুই ঘটেছে : অনেক দৃপ্ত ভঙ্গির কথাকলি, অনেক বিপ্লবী বিন্যাসের তরবারি ঘুরোনো। কিন্তু নতুন ক'রে সাহসের সঞ্চার ক'রে দিয়েছিলেন সেই সমর সেন, যে-সমর সেন তিরিশ বছর আগে আরেক ধরনের সাহস দেখিয়েছিলেন, সেই কবিতার রাজ্যে।

এখনো অভিযোগ হবে, অতিকথন করছি। ব্যক্তি তথা বস্তু ইতিহাসের ক্রীড়নক মাত্র, যে-সাহস সমর সেন তখন যুগিয়েছিলেন তা ঘটনাচক্র একটু অন্যরকম হ'লে হয়তো অন্য-কেউ যোগাতেন, সে-সাহসের ধারক 'নাউ' না হয়ে অন্য-কোনো পত্রিকা হতো। কিন্তু ইতিহাসে প্রত্যয় এবং ভবিতব্য-ভক্তি আলাদা ব্যাপার। পালাবার পথে ধুলো-ওড়ানোর দঙ্গলে ভিড়ের অভাব হয় না, বিশেষ ক'রে মধ্যবিত্ততায় সংহত বাংলাদেশে হয় না। পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে তেমন লাভ নেই, লোক-পরিবাদে নেমেও নেই। ঠিক ঐ মুহূর্তে সমর সেন এগিয়ে না-এসে শ্রীযুক্ত অমুক কিংবা শ্রীমতী তমুক এগিয়ে আসতেন কিনা তা নিয়ে এখন তর্ক বৃথা, তাঁদের অন্তত সে-মুহূর্তে দেখা পাওয়া যায়নি। গবুচন্দ্রমন্ত্রীপ্রতিম হয়ে অনেকেই হয়তো এখন বলতে পারেন, তাঁদের মনেও বরাবরই সাহস দেখাবার সংকল্পটা ছিল, সমর সেন কী ক'রে টের পেয়ে আগে-ভাগে বাজার জমিয়ে বসেছিলেন, আসল কৃতিত্বটা কিন্তু তাঁদেরই প্রাপ্য। তাঁদের তৃপ্তিরোমন্থনে আমি ব্যাঘাত ঘটাবো না।

অবশ্য অন্য-একটি কথা বলতে হয়। বাঙালি সাহসের উত্তরাধিকার একা সমর সেনে নিশ্চয়ই বর্তায়নি, সেরকম অন্যায় দাবি করার অভিপ্রায়ও আমার নেই, এইমাত্র উপরে যা লিখেছি তা সত্ত্বেও নেই। কিন্তু 'নাউ'-তে সাহসের সঙ্গে আরেকটি উপাদানের অন্বয় ঘটেছিল : রচনার উজ্জ্বলতা। সমাজশত্রুদের গাল পাড়তে গেলেও যে লেখায় একটা বাঁধুনি দরকার, চিন্তার মূল সূত্রটি দিয়ে অন্যকে প্রভাবিত করতে গেলে ব্যাখ্যার মধ্যে যে সংহতি-প্রাঞ্জলতা-বস্তুতত্ত্বজ্ঞান দরকার, অনেকেই তা ভুলে থাকেন। ফলে অনেক মহৎ ভাবনা অসংলগ্ন আবেগের আড়ালে ঢাকা পড়ে, যা স্থির অন্বীক্ষায় ব্যক্ত করা প্রয়োজন ভাষার বিযুক্তিতে তা অব্যক্ত থাকে। বামতাত্ত্বিকরা ভাষা তথা কলাকুশলতার এ-দিকটা নিয়ে আদৌ

মাথা ঘামাতে চান না, তাঁদের মধ্যে বহুসংখ্যক এমনকি বাচনভঙ্গির ব্যবহারিক উপযোগিতা পর্যন্ত অস্বীকার ক'রে যাবেন। এ-ব্যাপারে সমর সেন পথপ্রদর্শক হয়ে রইলেন: ঘোর প্রতিক্রিয়াপন্থীরাও এটা, অনিচ্ছার সঙ্গে হ'লেও, স্বীকার করেছেন 'নাউ' পত্রিকার মতো সংস্কৃত, বুদ্ধিদীপ্ত সাংবাদিকতা গোটা ভারতবর্ষে এর আগে চোখে পড়েনি, নিহিত বক্তব্য প্রবল ভয়ংকরী হওয়া সত্ত্বেও সমর সেনের সম্পাদনা-উৎকর্ষের তুলনা নেই।

তিন বছরের একটু বেশি সময় 'নাউ' পত্রিকায় আমরা আসর জমিয়েছিলাম, পত্রিকার শুরু থেকে যে-তারিখে মালিকরা সমর সেনকে তাড়িয়ে দিলেন সেদিন পর্যন্ত। অবিমিশ্র সুখের সময় গেছে সেটা, অবিমিশ্র সাহসে বিস্ফোটিত হবার সুখ। কিন্তু আমরা নিয়তিকে অত্যন্ত বেশি প্রলুব্ধ করছিলাম, সুতরাং যা হবার তা-ই হলো; যে-পত্রিকার নিশ্বাসওংকার কোনো-কিছুই তাঁকে বাদ দিয়ে ভাবা যায় না, সমর সেনকে সেই পত্রিকা থেকেই গলাধাক্কা দিয়ে বিদায় করা হলো। এক হিশেবে অবশ্য আমি খুশিই হয়েছি: শ্রেণীসংঘাতের মৌল লক্ষণগুলি আস্তে-আস্তে বিকশিত হচ্ছে, সমর সেনকে 'নাউ' থেকে তাড়ানো তার স্পষ্ট প্রমাণ। আপনার শ্রেণীস্বার্থকে লোকটা দিনের-পর-দিন ব্যাঘাত ক'রে যাচ্ছে, অথচ আপনি মুখচোরা বিনয়ে সেটা সহ্য করছেন, এরকম হওয়াটাই প্রকৃতি-বহির্ভূত। আমাদেরও অন্দরমহলে, আমরা তৈরি কি অসংবৃত তা বাহ্য, শ্রেণীযুদ্ধ দামামা বাজিয়ে অনুপ্রবেশ করেছে: মস্ত শুভসংবাদ সেটা।

না, 'নাউ' থেকে সমর সেনের অপসারণে আমার বিন্দুমাত্র বিস্ময় সঞ্চার হয়নি, আমাকে যা ঈষৎ অবাক করেছে তা এই বিতাড়নের ব্যাপারে এই ভূখণ্ডের গুদোমঠাসা প্রগতিওয়ালা-বিপ্লবওয়ালাদের নিরুত্তেজ ভাব। বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, যিনি স্বীয় অবৈকল্য-নিষ্ঠা দিয়ে সাংবাদিকতার মান মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বহু ঊর্ধ্বে তুলে নিয়ে গেছেন, সেই সম্মানীয় ব্যক্তিকে, বলাকওয়া নেই, এরকম পত্রপাঠ বিদায়ের প্রসঙ্গে যেন তাঁদের কোনো সামাজিক কর্তব্য নেই; এক আশ্চর্য-অদ্ভুত আসক্তিহীনতা, যেন পৃথিবীতে যথার্থই কোনো ব্যথা নেই, সমর সেনই শুধু অযথা মৃত্যু খোঁজেন। লোকসভা-রাজ্যসভায় যাঁরা টেবিল চাপড়ে প্রত্যহ দাপাদাপি করেন, তাঁদেরও মুখ দিয়ে রা'টি বেরোয়নি; ময়দানের পাটাতনে যাঁরা গোধূলিসন্ধ্যায় বিপ্লবের রক্তবন্যা বইয়ে দেন, তাঁরাও চুপ; বুদ্ধিজীবীঅধ্যাপকদের যে-সংকুল সম্প্রদায় চেকোস্লোভাকিয়ায় সব গেলো-

সব গেলো ব'লে খবরকাগজে সুদীর্ঘ বিবৃতি সাতশো আশি স্বাক্ষর অলংকৃত ক'রে পাঠান, সমর সেনের ব্যাপারে তাঁরা নীরব, এবং সে-নীরবতায় রবীন্দ্রনাথ-কথিত পূর্ণিমানিশীথিনীর কোনো দ্যোতনা নেই।

হয়তো এই বিস্ময়েরও কোনো মানে নেই। আরো-কিছুদিন হয়তো এরকমই হবে। মধ্যবিত্তমদির বাংলাদেশ. ভদ্দরলোকের ভয়, ভদ্দরলোকের ঈর্ষা, ভদ্দরলোকের লোভ, ভদ্দরলোকের পরশ্রীকাতরতা, ভদ্দরলোকের নিজের-বুঝ-আগে-বোঝার প্রবণতা। এই সমাজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সমর সেন দৃপ্ত সাহস দেখিয়েছেন, সাহস দেখিয়েছেন ব'লে এখন জবাই হয়েছেন, কিন্তু তাতে আমার-আপনার কী: আমরা কলেজে-কি-অফিসে যাবো, পান চিবোবো, একে-ওকে খোশামোদ ক'রে বাড়তি দু-পয়সার ব্যবস্থা করবো, আখেরে সুবিধে হ'লে দুটি-তিনটি শৌখিন বক্তৃতা দেবো, রাত্রিতে আমাদের ঘুম খুব নিটোল হবে, প'ড়ে মরুকগে সমর সেন।

কবিতা বাদ দিয়ে মার্ক্স

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ভদ্রলোক জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সুতরাং, এই ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে, একটা-কিছু করতে হয়। এদেশে-বিদেশে সর্বত্র, রাম-শ্যাম-যদু-মধু সবাই, কোনো-কিছু করছে, আমরা যদি কিছু না-করি, বড়ো লজ্জাজনক ব্যাপার হবে। সুতরাং ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সভা : সভাপতির গলায় আনুষ্ঠানিকভাবে মালা-অর্পণ, 'মার্ক্সপন্থী' বুদ্ধিজীবীদের থুথু-ছিটোনো প্রাজ্ঞভাষণ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে কবিতা-পাঠ, চাই কি সুচিত্রা মিত্রকেও কাকুতি-মিনতি ক'রে জুটিয়ে নিয়ে এসে একটা-দুটো গান গাইতে রাজি করানো, তাছাড়া উৎপল দত্ত অথবা শম্ভু মিত্রকে দিয়ে একটু আবৃত্তি, উৎপল দত্ত হ'লে কমিউনিস্ট বিঘোষণার ইংরেজি পাঠ থেকে কয়েকটি অনুচ্ছেদ আবৃত্তি···

এবং সুতরাং মার্ক্সস্মারক সংখ্যাও। ভদ্রলোকের জন্মতারিখ একশো পঞ্চাশ বছর হলো, সুতরাং অন্তত একশো পৃষ্ঠার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে হয়, নইলে মান থাকে না। সমস্তটাই কর্তব্যবোধের তাড়না। মুখে যতই বুলি কপচানো হোক, আসলে আমরা বাঙালিরা আষ্টেপৃষ্ঠে পাঁজি-মোড়া জন্তু; তারিখ আর তিথি পুজো ক'রে আমাদের দিনযাপন। বারো মাসে তেরো পার্বণের পালা এখনো : তবে, উপসর্গের বহর বেড়েছে ব'লেই হয়তো, তেরো প্রায় একশো তেরোয় গিয়ে ঠেকেছে। আমার আরো যা সন্দেহ, এই ভিড়ে লক্ষ্যগুলি হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম, তারিখ-রূপ উপলক্ষগুলিই এখন প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলকাতার অনেক গৃহস্থবাড়িতে গিয়ে দেখেছি, মা মোহনানন্দ কিংবা আনন্দময়ীতে জড়িয়ে আছেন, ছেলে মাও ৎসে-তুঙে। এই উভয়বিধ জড়ানোতেই কোনো-রকম অভিজ্ঞার স্বাক্ষর নেই, অথচ দুটিই সমান খাঁটি। ভক্তি এবং বিশ্বাসের

জোয়ারে বোধের পলিমাটি কোথায় ভেসে গেছে। এমন কি, পরোক্ষে এটাও প্রায় বলা চলে, আধার নিয়ে বৃথাই মাথা ঘামানো, ভক্তির কোনো আশ্রয় চাই, নইলে বাঙালিমানস বাঁচে না, সে যে-কোনো আশ্রয়ই হোক না কেন।

আমাদের মার্ক্সকৃত্যও অনেকটা একই তাগিদে: তারিখপুজো, সেই সঙ্গে কিছু অন্ধভক্তির আবেগনিষ্কাশন। জানি, প্রতি-আক্রমণে আমাকে ছেঁকে ধরা হবে। কোথাকার বিশ্বনিন্দুক হাজির হয়েছি আমি, বাঙালিদের ত্রুটি ধরা ছাড়া যার অন্য-কোনো আপাতজিজ্ঞাসা নেই? বাঙালিরা তা-ও তো মার্ক্সকে স্মরণ ক'রে সভা করছে, বই ছাপাচ্ছে, বাংলাদেশের বাইরে ভারতবর্ষের অন্যত্র তো এটুকুও হচ্ছে না। সিংহল-পাকিস্তান-ব্রহ্মদেশ-শ্যাম-কম্বোজেই বা এমন কী জগঝম্প? তুলনায় আমরা তো অনেকটাই এগিয়ে।

এখানেই আমার আপত্তি। প্রতিবেশীদের চেয়ে দু'পা এগিয়ে আছি, এই সান্ত্বনায় যদি শান্ত হ'তে চাই, তা হ'লে আর তারপর বলবার কিছু থাকে না। কিন্তু মার্ক্সচর্চা কি শুধুই রাজশেখর বসু যাকে বলেছিলেন দীপক-সংঘ-কোরক-সংঘের কোঁদল, তাতেই আটকে থাকবে? আমাদের ধ্যানে-অধ্যয়নে কোনো প্রভাস ফেলবে না? চিরাচরিত নামোচ্চারণের বাইরে নতুন-কোনো ভাবনা-অনুভাবনা দোলা দেবে না?

একটু না হয় বিশদ ক'রেই আমার অভিমান ব্যক্ত করি। জর্মন ভাষা অবশ্যই আমরা জানি না, যে দু'একজন ঐ ভাষা আপ্ত করেছেন তাঁরা সংখ্যায় ধর্তব্যের মধ্যেই নন। কিন্তু তা হ'লেও অনূদিত—ইংরেজিতে অনূদিত—রচনাবলীর সাহায্যে বেশ-খানিকটা এগোনো সম্ভব ছিল, এখনো সম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যমালায় মার্ক্স নিয়ে বিস্তৃত না হ'লেও পর্যাপ্ত উদ্যোগের সুযোগ ছিল, এখনো আছে: দর্শনে আছে, ধনবিজ্ঞানে আছে, ইতিহাস-সমাজবিজ্ঞানে পর্যন্ত আছে। অথচ যা হয়ে আসছে তার নমুনা তুলে দেখুন, আধপৃষ্ঠা-একপৃষ্ঠায় নমোনমো ক'রে মার্ক্সকে সেরে দেওয়া হচ্ছে। একেবারে হালে, ধনবিজ্ঞানের শিক্ষকমণ্ডলী একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠেছেন, ধ্রুপদী ধনবিজ্ঞানসাহিত্যের পাঠ্যে মার্ক্স থেকে একটা-দুটো অধ্যায় জুড়ে দিচ্ছেন; এখানেও কিন্তু আমার সন্দেহ, এই পরিবর্ধন বিবেকদংশনের পীড়নে নয়, নেহাতই লোকলজ্জাহেতু: বিলেতে-মার্কিনদেশে মার্ক্সের প্রসঙ্গ পাঠ্যমালায় শোভা পাচ্ছে, আমরা যদি কোনো-একটা ব্যবস্থা না-করি, লজ্জায় পড়তে হবে।

'প্রগতিপন্থী', সামাজিক-ব্যবস্থা-ঢেলে-নতুন-ক'রে-সাজানোতে-আস্থা-রাখেন এমন কয়েকজন অধ্যাপক মার্ক্সচর্চার বর্তিকাটি বাংলাদেশে গত তিরিশ-চল্লিশ বছর ধ'রে জ্বালিয়ে রেখে গেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকের অবশ্য পরের মুখে ঝাল খাওয়ার মতো অবস্থা: ক, খ, গ, ঘ-র বইতে মার্ক্সীয় তত্ত্বের নির্যাস বিবৃত, সেই সারাংশটুকু আত্মসাৎ ক'রেই তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ খুশি থেকে গেছেন। মার্ক্সীয় তত্ত্বগত সমস্যাগুলির বাস্তব প্রতিভাসের ঠিক মুখোমুখি তাঁদের হ'তে হয়নি, কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর সূত্রেও তাঁদের মার্ক্সীয় অভিজ্ঞার গভীর কন্দরে প্রবেশ করতে হয়নি। সুতরাং ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে কি অন্যত্র যে-অধ্যাপকরা ঐ পঁচাশি-বছর-আগে-মৃত জর্মন পণ্ডিতটির কীর্তির মহত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বিষম খান, তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই মার্ক্সীয় তত্ত্বের গহনতার সঙ্গে অপরিচিত।

বেশির ভাগ, সবাই নন। কিছু-কিছু পণ্ডিত-মনীষী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছক-কাটা চৌহদ্দির বাইরে গিয়ে মার্ক্স নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। এই অধ্যয়নের প্রায়-সমস্তটাই প্রেমের আবেগ থেকে। অনেক অসুবিধার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তাঁদের। নিজেরা যখন ছাত্র ছিলেন, কী দেশে, কী বিদেশে, বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্ক্স-অনুশীলনের কোনোরকম ব্যবস্থাই ছিল না। ঐতিহ্যাশ্রয়ী ধনবিজ্ঞানীরা তখন নবধ্রুপদী মাতোয়ারায় নিমগ্ন, বম-বোয়ার্কের 'কার্ল মার্কসের ইতিকথা' অমোঘ ব'লে প্রায়-সবাই মেনে নিয়েছেন, সুতরাং মার্ক্সীয় চিন্তার সারাৎসারই আপাতত তখন ধূল্যবলুণ্ঠিত-অনাদরে ঢাকা। যেহেতু হেগেল-কাণ্টের সোপানাবলীর একটা আলাদা মোহাচ্ছন্নতা বরাবরই ছিল, দর্শনচর্চায় অতএব একবার মার্ক্সের বুড়ি ছুঁয়ে আসতেই হতো, কিন্তু তা-ও কিছু-নির্লিপ্ততা-কিছু-অনীহামাখানো এক অভিজ্ঞানযাত্রা। এবং দেশে সমাজবিজ্ঞান কাকে বলে তা নিয়ে ভাবনা মাত্র একেবারে হালে দু'একজনকে করতে দেখা যাচ্ছে; মার্ক্সের সমাজচিন্তা নিয়ে কোনোরকম বিস্তৃত আলোচনা সূত্রপাতের সম্ভাবনাও তখন অকল্পনীয় ছিল। সবচেয়ে যা সমস্যাকীর্ণ ব্যাপার, এমনকি যাঁরা হেগেল পড়েছিলেন তাঁরা স্রেফ তত্ত্বের ভারাতুরতা চাখবার জন্যই পড়েছিলেন, ঐ তত্ত্ব থেকে সঞ্জাত, ঐ তত্ত্বের শরীরের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত, আন্বীক্ষিক শৈলী নিয়ে কেউই তেমন মাথা ঘামাননি। অথচ এই শৈলীর অপরিচয়ে মার্ক্স-অধ্যয়ন নিষ্ফল পণ্ডশ্রমের নামান্তর। যুক্তির কাঠামোই যদি না-বোঝা গেল, তা হ'লে কোন্-কোন্ সূত্রের

সাহায্যে কোন্‌-কোন্‌ উপসংহারে প্রব্রজ্যা তা আয়ত্ত করা দুরূহ বুদ্ধিচর্চা। কারো নামোল্লেখ করতে চাই না, কিন্তু দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী দুই দশক জুড়ে বাংলা দেশে যে-সব পণ্ডিতঅধ্যাপক মার্ক্স নিয়ে এখানে-ওখানে সাময়িক পত্রিকায়—এবং কখনো-কখনো বই ছাপিয়ে—টিকাটিপ্পনি প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগ আলোচনা ভীষণ উটকো ব'লে ঠেকে এখন, পূজোর উপচার প্রচুর, পূজোর উপান্তে কোথায় গন্তব্য তার হদিশ নেই অসংলগ্ন, প্রায়শই-ছেড়ে-যাওয়া মন্তব্য, যুক্তির সেতুগুলি কেমন নড়বড়ে, যে-কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে এরকম একটা আশঙ্কার দোলা, কেউ ঝাঁকুনি দিলেই যেন সমস্ত তত্ত্ব-তথ্য-বাণীর বোঝাসমেত অথৈ জলে পড়বো।

আরো-এক সমস্যা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণাগারের সীমাবদ্ধতার মধ্যে যাঁরাই মার্ক্স নিয়ে পড়াশুনা করেছেন, একদেশদর্শিতার প্রকোপ এড়ানো তাঁদের পক্ষে মুস্কিল হয়েছে। যিনি ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপক, তিনি মার্ক্সের অর্থনীতিগত সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে ব্যাপৃত হয়েছেন, দর্শনের অধ্যাপক ভূতচৈতন্যবাদচিন্তার পূর্বসূরীদের বলা-কওয়ার সঙ্গে নাড়ির যোগ খুঁজেছেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষক অনুসন্ধান করেছেন শাদামাটা তথ্য আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে, ঐতিহাসিক হয়তো হাতড়ে দেখতে চেষ্টা করেছেন কমিউনিস্ট বিঘোষণা প্রকাশ এবং চার্টিস্ট আন্দোলনের তারিখগত কাকতালীয়তার অন্য-কোনো ব্যাখ্যা সম্ভব কিনা। কিন্তু এই এতগুলি বিভিন্ন নদী এক মহাসমুদ্রে জড়ো করার মতো কোনো উদ্যোগই চোখে পড়েনি। কারণ হয়তো ব্যবস্থাপনার অভাব, স্ব-স্ব ক্ষুদ্র আয়োজনে আর কতদূর এগোনো যায়, অধ্যাপকরা নিজেদের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থেকেছেন। এই ত্রুটির অন্য বড়ো কারণ বোধ হয় একটু-আগে যা উল্লেখ করা হয়েছে : মার্ক্সীয় অন্বীক্ষার সম্পূর্ণ অবয়ব সম্বন্ধে ধারণা, অন্তত সে-সময় পর্যন্ত, এতই অস্পষ্ট ছিল যে এক নদী থেকে আরেক নদীতে গড়িয়ে যেতে না-পারলে যে উপলব্ধিতে শূন্যতা থেকে যাবে তা নিয়ে কোনো জিজ্ঞাসাই উৎকীর্ণ হয়নি।

পণ্ডিতমহলের বাইরে, বাংলাদেশে মার্ক্সচর্চার অন্য-এক ঐতিহ্য আছে, প্রায়-সমান্তরাল ঐতিহ্য হিশেবে যাকে গণ্য করা চলে। কারাগারের অন্তরালে যে-রাজনৈতিক কর্মীরা বছরের-পর-বছর দিনযাপন করেছেন, তাঁদের অনেকেই মার্ক্সীয় শাস্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন, নিজেদের চেষ্টায় অন্ধকার কুঠুরিতে ব'সে

পরস্পরের সহযোগিতায়—কখনো-কখনো একান্ত নিভৃতে—মার্ক্সের গ্রন্থাবলী পাঠ করেছেন, মার্ক্সীয় ভাষ্যাবলী বোঝবার চেষ্টা করেছেন, নিজেদের বোঝবার সাহায্যকল্পে, এবং সমানুকম্পায়ীদের বোঝাবার মহান্ উদ্দেশ্যে, বিশেষ টীকাযুক্ত আলোচনাগ্রন্থ রচনা করেছেন। এই মহান-আশ্চর্য অধ্যবসায়ের কাহিনী কোথাও লিখিতভাবে উপস্থিত নেই, কিন্তু তাতে ইতিহাসেরই ক্ষতি। স্বনির্ভর শিক্ষা, তদ্গত ছাত্রের মন নিয়ে পাঠাধ্যয়ন, অধ্যায়ের পর অধ্যায় ধ'রে, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধ'রে। অনেক বিজ্ঞানের স্রোতধারার সমন্বয় মার্ক্সীয় চিন্তায়, একেবারে বাইরে থেকে হঠাৎ কেউ যদি প্রবেশের চেষ্টা করেন, এখানে-ওখানে একটু-আধটু প্রায়ই ঠেকে যেতে বাধ্য, কোনো জায়গায় যুক্তির প্রবাহ আপাতদুরূহ, কোথাও ভাষা উচ্চাবচ, অন্য-কোথাও হয়তো এমন-কোনো উল্লেখ বা ইঙ্গিত যার উৎস রাজবন্দীদের একজনেরও জানা নেই। অথচ এরই মধ্যে কোনোক্রমে রাস্তা কেটে এগোতে হবে; বাইরে থেকে সাহায্যের প্রশ্নই আসে না। রাজনৈতিক কর্মীরা হতোৎসাহ হননি; যেখানে উপলব্ধির ফাঁক, সেখানে নিজেদের বিচারে যা স্বচ্ছতম মনে হয়েছে, তা বসিয়ে ভরাট ক'রে নিয়েছেন; যেখানে তত্ত্বের ব্যাখ্যায় নিজেদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিয়েছে, নিজেদের আলাদা-আলাদা বিশ্লেষণ, কিছুমাত্র না-দ'মে গিয়ে, ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বেশ কয়েক বছর জুড়ে, বাংলাদেশের অনেকগুলি কারাগারে, এমনিভাবে মার্ক্সচর্চা ব্যাপ্তি পেয়ে গেছে।

কিন্তু এ-গৌরবকাহিনীর একটি কৃষ্ণপক্ষও আছে। অকরুণ, তথা কর্কশ, শোনালেও বলতেই হয়, নিষ্ঠা এবং সংহতি দুটো আলাদা জিনিশ, একটি দিয়ে অন্যটির অভাব মেটানো সম্ভব নয়। কারাগারের পরিবেশে যে-কোনোপ্রকার অধ্যয়নেই প্রতিযোজনা মুশকিল, সুতরাং মার্ক্সচর্চাতেও কিছু-কিছু অগোছালো এলোপাথাড়ি বিহার অপ্রতিরোধ্যভাবে ছায়া ফেলেছিল। টুকরো-টুকরো জ্ঞান, বিচ্ছিন্ন নানা উপলব্ধি, কোনো অংশে উজ্জ্বল অভিজ্ঞান, অন্য-কোথাও নিরেট অজ্ঞতা, এমনতরো ব্যাখ্যা যা মার্ক্সের মৌল চিন্তার একশো যোজনের মধ্যেও না। তাছাড়া, এই পড়াশুনার মধ্যে একটা রুদ্ধশ্বাস, ধর্মান্ধ ভাব ছিল, যা বিজ্ঞানবীক্ষার পক্ষে তেমন শুভকর নয়। আজ থেকে ষাট বছর আগে স্বদেশী যুবকেরা যে-উচ্ছ্বাসের ভরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' পাঠ করতেন, কিংবা চল্লিশ বছর আগে ম্যাকসুইনীর জীবনী অথবা উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের

আত্মকথা' পড়তেন, অনেকটা সে-ধরনের প্লাবিত আবেগের সঙ্গে মার্ক্সের বই রাজনৈতিক কর্মীরা গলাধঃকরণের প্রয়াস ক'রে গেছেন। গ্রহণের পলিমাটির যেখানে এরকম আলতো অবস্থা, উপলব্ধির শিকড় সেখানে খুব বেশিদূর এগোতে পারে না, দর্শনের অন্তঃসার একপাশে প'ড়ে থাকে, দার্শনিক উপসংহারের গীতলতা আসর জমিয়ে বসে।

দ্বিতীয় এক অসুবিধার উল্লেখ করছি। কারাগারের আবদ্ধ জীবনে অহম-নিষ্কাশনের পথ অঙ্গুলিমেয়, সুতরাং মার্ক্সের অনুশীলনে নেমে অনেকেরই তাত্ত্বিক প্রবৃত্তি বিস্ফারিত হতো। আমি-আপনার-চেয়ে-ভালো-টীকাকার, আপনার-ব্যাখ্যা-যুক্তিসহ-নয়, মার্কস-এটা-বোঝাতে-চাননি-ওটা-বাতলাতে-চেয়েছিলেন, এই প্রকার তর্ক অচিরে ব্যাপ্তি পেত, অধ্যয়নরতদের ঝোঁক গিয়ে ঠেকতো তত্ত্বের ব্যাকরণিক বিশ্লেষণে। বৈয়াকরণমন্যতা থেকে অন্য-এক উপসর্গের জন্ম: শাস্ত্রীয় উচ্চারণের যথাযথ ব্যাখ্যা থেকে সামান্যতম ব্যত্যয় হবার উপায় নেই, ফলে মার্ক্সীয় বিচারের যা প্রধান শিক্ষা—এমন কি মার্ক্সীয় বিচারও শেষ পর্যন্ত দ্বান্দ্বিক গতি মেনে নিয়ে এগোবে, প্রতিনিয়ত তাকে পরিবেশের পরিবর্তনশীল প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্যযুক্ত করতে হবে– তা অনেকেরই মনের কোণে তলিয়ে যেত। এই ক্ষতির ধাক্কা এখনো আমরা সামলাচ্ছি: রাজনৈতিক নেতারা নিরেট ব্রাহ্মণদের কায়দায় কাষ্ঠমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে যাচ্ছেন, স্থান-কাল-পাত্রভেদে মার্ক্সীয় বিচারও যে ঈষৎ বদলাতে বাধ্য, সে-খেয়াল তাঁদের নেই, এখনো তাই তিন-চার-দশক-আগে-কারাকক্ষে-সদ্যশেখা বস্তা-পচা অর্ধতত্ত্বের কপচানি।

রাজনৈতিক দলগুলি কতটা দায়িত্ব নিতে পারবেন—কিংবা নিলেও কতটা সফল হ'তে পারবেন—তা প্রত্যয় ক'রে বলা মুশকিল, কিন্তু মার্ক্সবাদে নিষ্ঠাশীল পণ্ডিত-মনীষী-অধ্যাপকদের মস্ত-এক সামাজিক দায়িত্ব এই অবস্থায় আছে, মার্ক্সের জন্মতারিখ দেড়শো বছর গড়িয়ে যাওয়ার উপলক্ষসংক্রান্ত উদ্যোগ-আয়োজনে সে-দায়িত্বপালন সামান্য অঙ্গীকৃত হ'লে সবদিক দিয়ে ভালো। বৈজ্ঞানিক-সূত্র মেনে নিয়ে মার্ক্স-অধ্যয়ন এ-পর্যন্ত বাংলাদেশে অনারব্ধ, এখন থেকে শুরু করলে মস্ত উপকার হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে—ইতিহাসে, রাষ্ট্র ও ধনবিজ্ঞানে, সমাজতত্ত্বের চর্চায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণে, এমনকি সাহিত্যে—মার্ক্সীয় অন্বীক্ষাপ্রকরণাদি আবশ্যিক অন্তর্ভুক্তির জন্য দাবি তোলা আদৌ অযৌক্তিক নয়। যে-চিন্তার প্রভাবে পৃথিবীর অর্ধেকটা জ্বলছে-জ্বলবে-জাগছে-পুড়ছে-পোড়াচ্ছে,

যে-চিন্তা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর বাদে প্রায় সব-ক'টি মহাদেশকেই গ্রাস করতে উদ্যত হবে, সেই চিন্তার মর্মকথার অনুসন্ধান প্রাথমিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার প্রথম সোপান হওয়া উচিত। মার্ক্সীয় অন্বীক্ষা, মার্ক্সের রচনাবলী থেকে প্রয়োজনানুগ পাঠ, মার্ক্সের ভাষ্যকারদের বিশ্লেষণের অনুধ্যান, মার্ক্সীয় বিচারের বিভিন্ন প্রশাখার ফলিত প্রয়োগ: শৃঙ্খলার সঙ্গে সাজিয়ে এ-সমস্ত কিছুই আমাদের শিক্ষার অঙ্গীভূত করতে হবে। মানছি, দাবি তোলা সোজা, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এই দাবির গ্রহণীয়তা স্বীকৃত হ'তে বহু প্রহর কেটে যাবে। তা হ'লেও হাত-পা গুটিয়ে থাকার কোনো মানে হয় না, মার্ক্সচর্চার সামাজিক মূল্য মনে-মনে আওড়ালে সমাজবিপ্লব এতটুকুও এগোবে না, সন্তানসন্ততিদের জন্য আমরা কী ধরনের শিক্ষা চাই, সেই আত্মজিজ্ঞাসার মধ্য দিয়েই আন্দোলন গ'ড়ে তুলতে হবে, যাতে আমাদের বিদ্যায় বিজ্ঞানের ছায়া পড়ে, আমাদের চিন্তায় মার্ক্সীয় প্রজ্ঞা প্রসাদ বিলোয়।

যেখানে সমাজের অধিকাংশ মানুষের জীবনমরণ নিয়ে টানাপোড়েন, শৌখিনতার ঋতুও সেখানে শেষ। শৌখিন মার্ক্সীয় বিলাসের দিন অপগত, এখন আমাদের দায়ে প'ড়ে, মন এবং বোধকে সংহত, শানিত ক'রে নিয়ে মার্ক্সীয় শাস্ত্রাধ্যয়ন করতে হবে। মার্ক্স কী বলেছিলেন, কেন বলেছিলেন, কেমন ক'রে বলেছিলেন, যা বলেছিলেন যুগে-যুগে তার রকমফের হ'তে পারে কিনা, আমাদের আচারে-বিচারে-চেতনায় মার্ক্সীয় অনুশাসন থেকে কোথায় তফাত হচ্ছে—কেন হচ্ছে—যা হচ্ছে তা ক্ষালনের কী উপায়, এমন বহুতর প্রশ্নের অন্বীক্ষাগত উত্তর আমাদের নিজেদেরই জেনে-খুঁজে বের করতে হবে। সম্প্রতি এক পণ্ডিত অনেক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আবিষ্কার করেছেন, মার্ক্সের সমস্ত ভাষ্য জুড়ে একুনে একশো বাহাত্তরটি ভবিষ্যৎবাণী ছিল, তাদের দেড়টির বেশি নাকি বাস্তবে মেলেনি, সুতরাং মার্ক্স নস্যাৎ: এ-ধরনের উক্তির কোনো অর্থ হয় কিনা তা নিয়েও ভেবে দেখা দরকার। কিন্তু সব-কিছুর জন্যই সব চেয়ে আগে প্রয়োজন যুক্তিগত প্রশিক্ষার। মার্ক্স নিয়ে বাংলাদেশে প্রচুর কবিতা-গান-বাষ্পবিহ্বল ন্যাকামি হয়েছে; এখন থেকে সংহত মন নিয়ে একটু লেখাপড়া-পড়াশুনা-চিন্তাভাবনা হোক। পণ্ডিতি পাদটীকার কথা বলছি না, নেহাতই শাদামাটা উপলব্ধির কথা বলছি, সাধারণ মানুষও যাতে বুঝতে পারে অমুক দেশাই কিংবা তমুক গান্ধি কেন শ্রেণীশত্রু, এবং যদিও সে নিজে, অহোরাত্র পরিশ্রমের পরেও, অর্ধভুক্ত,

মুষ্টিমেয় কিছু অসাধু লোক স্রেফ কিছু না-ক'রেও কী ক'রে ফুলে কলা গাছ হচ্ছে।

মার্ক্সকে অবশ্যই স্মরণ করবো, তাঁর জন্মতিথি উদ্যাপন করবো, কিন্তু কবিতার দিন শেষ হয়েছে। এবং দোহাই, ঐ প্রখ্যাত অধ্যাপকটিকে পাটাতনে হাজির করবেন না, যিনি বক্তৃতা শুরু করবেন, 'কার্ল মার্ক্স, তিনি মহাপুরুষ ছিলেন, তিনি এক ভীষণ পণ্ডিত ছিলেন '।

একটি ভাষাসমস্যা সম্পর্কে

কোথায় যেন পড়েছিলাম লেনিন অবসর সময়ে তুর্গেনিভ ও বালজাক পড়তে ভালোবাসতেন, ভালোবাসতেন এমনকি ভিক্টোরীয় ইংরেজি গদ্যের তারিয়ে-তারিয়ে রসাস্বাদন। ভালো গদ্য, ভালো কবিতা, যা থেকে ভাষার সৌকর্য উপভোগ সম্ভব, তাঁর প্রিয় ছিল। ভালো লেখা না-পড়লে ভালো লেখা লেখা যায় না, এরকম কোনো প্রস্তাবে অবশ্যই তাঁর তা হ'লে সায় থাকতো। রুশ ভাষা আমাদের অনেকেরই জানা নেই, লেনিনের পুরো রচনা আমরা পড়েছি ইংরেজি অনুবাদের মারফৎ, কিন্তু যা বিস্মিত করে তা গদ্যের প্রাঞ্জলতা, অনুবাদের বাধার অন্ধকার ভেদ ক'রেও যা চমক দেয়। বাল্যে-কৈশোরে প্রবল উৎসাহে যখন মার্ক্স পড়তে গিয়ে প্রতিহত হয়ে ফিরেছি, ভাবগম্ভীর দুরূহ গদ্যের প্রাচীর ভেদ করতে অক্ষম হয়েছি, লেনিন প্রতিবার আমাদের উদ্ধার করেছেন তখন। পরিচ্ছন্ন, স্পষ্ট গদ্য, যা ভাবনাকে আড়াল করে না, স্পষ্ট করে; দূরকে আরো দূরে হটিয়ে দেয় না, হাত ধ'রে সমীপবর্তী করে; ঘোরানো-প্যাচানো চতুরালি নয়, শব্দকল্পদ্রুমের কালোয়াতি নয়, অথচ ব্যাকরণঅশুদ্ধ সস্তা বুকনির তরল প্রবাহও অনুপস্থিত। বিপ্লব যদিও স্রেফ ছেঁদো কথার ফলিত প্রয়োগ নয় কথার নির্ভর না-থাকলে বিপ্লবের সারাৎসার লোকমানসে ছড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব হতো, যে-কোনো যুগেই অসম্ভব হতো। রচনার প্রসাদগুণ অবশ্য সব বিপ্লবনায়কের প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত থাকে না, এটা প্রায় আকস্মিক ঘটনাক্রমের ব্যাপার। কিন্তু লেনিনের ক্ষেত্রে রাজযোটক ঘটেছিল। তাই যাঁরা বলেন লেনিন আর যা-ই হোন, সাহিত্যিক ছিলেন না, তাঁদের আমি দুয়ো দেবো। প্রমথ চৌধুরী সেই কবে বলেছিলেন, 'সহিত' থেকে 'সাহিত্য': যা আমাকে নতুন চিন্তার

'সহিত' হ'তে সাহায্য করে, তা-ই সাহিত্য; যা সমাজের অন্যান্যদের সঙ্গে অন্বিত হ'তে সহায়তা করে, তা-ই সাহিত্য। এই কষ্টিপাথরের বিচারে লেনিনের রচনাসমগ্র তুঙ্গতম সাহিত্যসৃষ্টি। ভদ্রলোক কখনো মিল দিয়ে একটা-দুটো প্রেমের কবিতা লিখেছিলেন কিনা সেটা সম্পূর্ণ অবান্তর: যা-যা লিখেছেন, তা মার্ক্সীয় মূল্যতত্ত্ব নিয়েই হোক বা কুলকদের শোষণপদ্ধতি নিয়েই হোক বা সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণনীতি নিয়েই হোক, সে-সব রচনা উজ্জ্বলতাপ্রাঞ্জলতা-যুক্ত কিনা সেটিই আসল অন্বিষ্ট হওয়া উচিত।

মাঝে-মাঝে মনে হয় আমার, একদিকে কোলচাক-ডেনিকিনদের, অন্যদিকে চার্চিল-সম্প্রদায়ের, বাঁদরামো শুরু না-হ'লে হয়তো বিপ্লবোত্তর রুশ সাহিত্যের রূপ সম্পূর্ণ অন্যরকম হতো। শলোকভের প্রথম পর্বের গদ্য, মায়াকভস্কির উচ্ছল গীতিতরঙ্গ, এমনকি কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাব-ঘোষণা ইত্যাদির বাঙ্ময়তা, সব-কিছুতেই প্রচুর নন্দন-আনন্দ ছিল সেই প্রথম কয়েকটি বছর। পরিশুদ্ধ মুক্তির আনন্দ, প্রশ্ন, পরীক্ষা, সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা, ভাষার সৌকর্য, বক্তব্যের ভঙ্গিকে সুচারু করার ইচ্ছা, আশ্চর্য-সব কাণ্ড হচ্ছিল তখন। প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র, বহিঃশত্রুর আক্রমণ সেই পর্বে দ্রুত উপসংহার টেনে আনলো। ঘরে আগুন ধরলে ভাষা নিয়ে বিলাসিতা করাটা মানায় না, এটাও নন্দনতত্ত্বের ব্যাপার। আসল জিনিশটা পাশে সরিয়ে রেখে যাঁরা নেহাৎ শৈলী নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইলেন এই ঘোর দুর্বিপাকেও, তাঁদের সম্বন্ধে স্বভাবতই সন্দেহান হ'তে হলো। ছোটো মেঘ থেকে বড়ো মেঘ, বড়ো মেঘ থেকে ঝড়-জল-বাত্যা, পঞ্চাশ বছর ধ'রে অতঃপর কমিউনিস্ট দেশগুলিতে ভাষার শ্রী-ছাঁদ অবহেলিত হয়ে এসেছে। শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, ভাষাচর্চার ব্যাপারেও, সৌন্দর্যের প্রতি অনীহা সমাজতন্ত্রের নিহিত বাণীর সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে পড়েছে যেন। লেনিন বেঁচে থাকলে মহা দুঃখ পেতেন বোধ হয়। (অবশ্য সঙ্গে-সঙ্গে এটাও বলতে হয়, দুঃখ পেলেও মানিয়ে নিতেন তা, কারণ লোকস্বার্থ সব-কিছুর উপরে, ভাষার ন্যাকামি যদি প্রধান সামাজিক কর্তব্যকে ব্যাহত করে, তা হ'লে অবশ্যই তা বধ্য।)

মুশকিল হয়েছে আমাদের, তোতাকাহিনী-দেশের আমাদের। বছর দশেক আগে পর্যন্ত, আমাদের কমিউনিস্ট আন্দোলন সোভিয়েট দেশের চিন্তার শৃঙ্খলে বাঁধা ছিল। অনেকটাই রাজা-পারিষদ সম্পর্ক, অথবা সেই মুক্তকচ্ছঋষি-শিষ্য

সম্পর্ক। ভদ্রলোকরা কমিউনিস্ট আন্দোলনের হাল ধ'রে ছিলেন, এখনো অনেক ক্ষেত্রে আছেন। ভদ্রলোকের অপরাধবোধ স্বভাবতই তুলনাগতভাবে দেখলে একটু বেশি। সোভিয়েট দেশের 'গণ-সাহিত্য' অচিরে আমাদের ভদ্রলোক-সাম্যবাদীদের আদর্শ হয়ে দাঁড়ালো: শাদামাটা, নিরেট কাহিনী, শাদামাটা নিরেট ভাষা। প্রথম পর্যায়ে এ-ধরনের অত্যাচার তেমন ছিল না: গোপাল হালদার-হীরেন মুখুজ্যেরা পার পেয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা নিজেদের স্বভাবজ ভঙ্গিতেই বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, নিগড়ে আটকা পড়েননি। ধরা পড়েননি প্রথম পর্যায়ের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও, তাঁর সমাজমন্তব্য বেশ কিছুদিন পর্যন্ত সুতীক্ষ্ণ প্রতিভার নিজস্বতায় ঋদ্ধ হয়ে তবে প্রকাশ হয়েছে। সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে পেরেছেন: সমর সেন কিছুদিন বাদে অবশ্য লেখাই ছেড়ে দিলেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিজের মুন্সিয়ানায়, মাঝে-মাঝে প্রচুর বাজে লিখেও, মোটামুটি উৎরে গেছেন। কিন্তু গভীর গাড্ডায় পড়েছেন বাকি সবাই, সাধারণ পর্যায়ের অগুনতি সাম্যবাদী বাঙালি লেখকরা, সবাই ভদ্রলোক, সবাই পাপবোধভারাক্রান্ত।

পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটছি। এতদিন পর্যন্ত, সমাজতন্ত্রের জন্য আন্দোলন, মোটামুটি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কুক্ষিগত ছিল। পড়াশুনো ক'রে ছেলেরা-মেয়েরা কমিউনিস্ট বনতো: তত্ত্বকথা পড়ে। সাম্যবাদী-সাহিত্য জিনিশটা তাই ঠিক অভিজ্ঞতার নির্যাস ছুঁইয়ে পুষ্পিত-বিকশিত হলো না, হলো কর্তব্যবোধের তাড়নায়। আক্ষরিক অনুশাসন মেনে নিয়ে সাহিত্যসৃষ্টির অধ্যবসায় শুরু হলো: ভাবটা প্রায় এরকম: আমরা কমিউনিস্ট, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ঐ ওদের মতো যদি দিস্তায়-দিস্তায় সাম্যবাদী গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ তৈরি করতে না-পারি, গভীর লজ্জার ব্যাপার হবে সেটা। গেলো পঁচিশ বছরে মোটামুটি এই ঐতিহ্যের ধারা অব্যাহত আছে।

ঐতিহ্য না ব'লে সোভিয়েট সাহিত্যরীতির ভূত বলাই হয়তো শ্রেয়। ভূতে-পাওয়া ব্যাপারটা যদি নিছক বিষয়ের প্রসঙ্গে সীমাবদ্ধ থাকতো, তেমন ক্ষতি হতো না তাতে। নামতা পড়ার মতো ক'রে কিছু-কিছু গল্প-কবিতা লেখা হতো, একটু উদ্ভট ঠেকলেও লেখার গুণে, ভাষার ধারে, সম্ভবত উৎরে যেত। সাম্য-বাদের নানা খুঁটিনাটি সমস্যা নিয়ে প্রবন্ধ-আলোচনা রচিত হতো, ভাষা স্বচ্ছন্দ-গতি হ'লে সবাই আগ্রহসহ পড়তাম, প্রত্যালোচনায় যোগ দিতাম, সব-মিলিয়ে

উপকারই হতো। মধ্যবিত্তদের জন্য মধ্যবিত্তদের লেখা, শুধু একটা ভাণ থাকতো সমস্যার উপজীব্য সমাজের নিম্নবিত্ত-বিত্তহীন শ্রেণী; যাঁরা ফলিত শ্রেণীত্যাগে বিশ্বাস করতেন, তাঁরা না-হয় ধ'রেই নিতেন নিজেদের একান্ত সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত হচ্ছেন।

যা ঘটেছে তা আরো মারাত্মক। জনগণের সঙ্গে নাড়ির যোগ সহজে আসে না, কিন্তু নাড়ির সন্ধান প্রশংসনীয়, এই আর্ষ বাক্য শিরোধার্য ক'রে যাঁরা এগিয়ে গিয়েছিলেন, অর্থাৎ যাঁরা সাম্যবাদী সাহিত্যের ডাকসাইটে পথিকৃৎ হিশেবে খ্যাত, তাঁরা ধ'রেই নিয়েছিলেন ভাষাকে যথাযথ লোকায়ত ক'রে আনতে না-পারলে পুরো সৃষ্টিকর্ম ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। ভাষার উপর তাই ঘোড়-সওয়ারগিরি শুরু হলো। বিপদ এলো প্রধানত তুটো দিক থেকে। যেহেতু সাম্যবাদী সাহিত্য মানে সাধারণের জন্য সাহিত্য, সুতরাং যে-কোনো সাধারণ লোক কাগজে মক্সো করতে পারেন, এ-ধারণার বশবর্তী হয়ে কাতারে-কাতারে বাঙালি মধ্যবিত্ত যুবকযুবতী একটা সময়ে, ধরুন ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত এক দশক জুড়ে, অযথা কালাপচয় করেছেন। এই ঝোঁক আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেছে, কিন্তু অন্য বোঝাটা থেকেই গেছে। সাধারণের জন্য যেহেতু সাহিত্য, অতএব শিল্পসৌষ্ঠবের দরকার নেই, যেমন ক'রে হোক—ভুল ব্যাকরণ কি ভুল বানান হ'লেও ক্ষতি নেই—লিখে গেলেই হলো, এই তুর্মর অভিমত জায়গা জুড়ে বসেছিল বছর পঁচিশেক আগে; তার প্রতিপত্তি এখনো অব্যাহত। সোভিয়েট সাহিত্যকলার আক্ষরিক অনুসরণের এটাই আসল উত্তরাধিকার।

কী বলা হলো তা-ই মুখ্য, কী ক'রে বলা হলো তা ভুলে যাও। অথচ কার্যক্ষেত্রে দেখা যাবে যেমন-তেমন ক'রে বলা হ'লে কী বলা হলো তা-ও ভুলে যাবার আশঙ্কা। আসলে এই ধারণা, সাধারণ মানুষকে যেমন-তেমন ক'রে উদ্দেশ করলেই হলো, সেই মানুষকে অপমান। আমাদের তথাকথিত 'সাম্যবাদী' সাহিত্যের ঐতিহ্যে ধ'রেই নেওয়া হয় সাধারণ মানুষের রুচিজ্ঞান নেই, সৌন্দর্যপিপাসা নেই, শুধু মোটা ভাত-রুটি-কাপড়ের সমস্যার কথাগুলি কোনোক্রমে একবার তাকে ব'লে দিলেই হলো, কারুকার্যের প্রসঙ্গ অবান্তর। মানছি, সৌন্দর্যের সংজ্ঞা শ্রেণীভেদে অন্যতর হবে, কিন্তু তা ব'লে সাধারণ মানুষের আদৌ কোনো রুচিবিচার নেই এটা সর্বনেশে প্রস্তাব। কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই ভুলটি সাহিত্যের ক্ষেত্রেই বিশেষ ক'রে হলো কেন, কলার অন্যান্য বিভাগে তার কালো ছায়া কেন পড়লো

না, সেটিও গবেষণার বিষয় হ'তে পারে। বাংলাদেশের লোক-ঐতিহ্য গণনাট্য সংঘের নৃত্যে-সংগীতে-অভিনয়ে আশ্চর্য স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে, হয়নি শুধু সাহিত্যেই। বাংলা ভাষায় লোকায়ত সাহিত্যের প্রবাহ কোনোদিনই তেমন স্রোতস্বিনী ছিল না তা ব'লেও এই অঘটন ঘটতে পারে ; অন্য যে-কারণ খুঁচিয়ে বের করা যায় তা ঈষৎ অকরুণ : এমন হ'তে পারে সোভিয়েট-মোহ আমাদের সাম্যবাদী সাহিত্যিকদের যতটা আচ্ছন্ন করতে সক্ষম হয়েছিল, অন্যদের ক্ষেত্রে কী কারণে ততটা পারেনি। বেশি লেখাপড়া শেখার অশুভ পরিণামের অন্তত একটি উদাহরণ আপাতত হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে তাই।

আমার মনে অন্তত কোনো সন্দেহ নেই : মজুরকৃষক নিয়ে বাংলা ভাষায় পঁচিশ-তিরিশ বছরে যা-যা লেখা হয়েছে, সব-মিলিয়ে তা একটি বিরাট অপব্যয়িত অধ্যায়। মজুরকৃষকদের মধ্যে ইত্যাকার লেখা পড়বার জন্য আদৌ মাথাব্যথা দেখা দেয়নি, সাক্ষরতার প্রশ্ন না হয় না-ই বা তুললাম। এ-সমস্ত রচনা পড়েছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী, অর্থাৎ যাঁরা লিখেছেন তাঁরাই। জাদুমুগ্ধ বৃত্তের বাইরে অসার্থক লেখা থেকে বরঞ্চ উল্টো ফল হয়েছে : অনেকেই প্রতিহত হয়ে ফিরেছেন। সামান্য একটি ছোটো সংখ্যাবিশ্লেষণ থেকে এই ক্ষতির পরিমাণ অনুমান করা চলে। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের অন্তত অর্ধেক, কিংবা সম্ভবত তারও বেশি, বিভিন্ন মার্ক্সবাদী দল-উপদলগুলিকে সমর্থন ক'রে থাকেন ; অথচ সাহিত্যিককুলের দিকে তাকিয়ে দেখুন, সাম্যবাদে-আস্থা-রাখেন এমনতরোরা ঘোরতর সংখ্যালঘু। প্রতিক্রিয়ার প্রতি প্রবণতা সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যান্য মধ্যবিত্তদের তুলনায় একটু বেশি এই যুক্তি মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। নিয়মের নিগড়ে বাঁধা পড়তে হবে, বোধ হয় এই ভয়েই অনেক সাহিত্যিক প্রতিপক্ষে যোগ দিয়েছেন।

সাম্যবাদী সাহিত্য যা তৈরি হয়েছে তা অতএব বেশির ভাগই না-ঘরকা না-ঘাটকা। শ্রমিককৃষক নিয়ে সার্থক সাহিত্য চোখ পড়েনি : শ্রেণীভুক্ত না-হয়েও একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়দের মতো বিরাট প্রতিভার পক্ষেই 'হারাণের নাতজামাই' লেখা সম্ভব হয়েছিল, অন্যান্য অধিকাংশ প্রয়াসই নকলনবিশি থেকে গেছে। অথচ মধ্যবিত্তদের শ্রেণীসমস্যাকে আলাদা ক'রে তেমন আমল দেওয়া হয়নি ব'লে এ-ক্ষেত্রেও মহৎ সাহিত্যের সম্ভাবনা রুদ্ধ থেকেছে। ধ্ব'সে-পড়া ভদ্র-লোকদের স্থিতিপ্রলয় নিয়ে ভগ্নাংশিক আলোচনা হয়েছে এ-প্রবন্ধে ও-প্রবন্ধে, রচিত

হয়েছে একটা-দুটো গল্প, সমাজচেতনার আভাযুক্ত অল্প-কিছু কবিতা। কিন্তু কোনো প্রয়াসই মহত্ত্বের কাছাকাছি পৌঁছুতে পারেনি। যাঁদের হয়তো ক্ষমতা ছিল, সেই সঙ্গে কল্পনাও, তাঁরা প্রতিপক্ষে; পরিষ্কার এদিকে যাঁরা, তাঁরা সাহিত্যের সৌকর্য নিয়ে মাথা ঘামাননি কোনোদিন, অথবা বিষয়ের বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে এমন আবদ্ধ থেকেছেন যে মধ্যবিত্ত সমাজসমস্যার নিহিত সত্যটি তাঁদের কাছে বরাবর অধরা থেকে গেছে।

এঁদেরই মধ্যে দু-একজন যাঁরা এলেমদার ছিলেন, তাঁরা ধারে কেটেছেন, অথবা কিছুদিন বাদে সুবিধাবাদের পথ ধরেছেন। আমার বক্তব্য একটি উদাহরণে স্পষ্ট হবে। ইচ্ছা ক'রেই আমি সমরেশ বসুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি। কুড়ি-বাইশ বছর আগে যিনি 'সাম্যবাদী' হিশেবে নাম কিনেছিলেন তাঁর বর্তমান পরিণতি আমাকে বিচলিত করলেও আদৌ বিস্মিত করে না। ব্যক্তিগত ঝোঁকের ব্যাপারগুলি ছেড়ে দিচ্ছি: কমিউনিস্ট আন্দোলনে বরাবরই বহু বিমিশ্র লোকের ভিড়, নায়ক-উপনায়ক-চতুর-ধুরন্ধরের প্রবেশ-প্রস্থান, আন্দোলন যতদিন নিকষভাবে মধ্যবিত্তশ্রেণী-আশ্রয়ী, এমনটি হ'তেই থাকবে। কিন্তু সমরেশ বসুর ইতিহাসের অন্য-একটি দিক আছে ব'লে আমার সন্দেহ। সাম্যবাদী গুরুমশাইরা গোড়ার পর্বে সাহিত্যনবিশদের যে-পাঠ দিতেন, তাতে মস্ত-একটা ফাঁকি ছিল। বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনার আদৌ প্রয়োজন আছে ব'লে কারো মনে হয়নি, বিষয়ের বাঁধা-ধরা ফিরিস্তি সকলেরই তো জানা; অতএব প্রশিক্ষণে চাপটা গিয়ে পড়তো বাইরের ঠমকের উপর। ভাষাকে লোকায়ত করতে হবে, শ্রমিককৃষকের ভাষা সাহিত্যে যাতে অনুপ্রবেশ করতে পারে তা নিয়ে সদাসচেষ্ট থাকতে হবে, বুকনি-লব্জ-কেরামতি-বাক্‌সাফাই ইত্যাদির প্রয়োগে দক্ষ হয়ে উঠতে হবে, তা হ'লেই অভীষ্ট সিদ্ধ। অবশ্য চাষী-মজুরের ভাষা হিশেবে শেষ পর্যন্ত সাহিত্যের বাজারে যা চালু হয়েছে তার সঙ্গে উক্ত নিম্নবিত্তদের মুখের ভাষার কোনোই সাযুজ্য নেই, সে-ভাষার ছন্দ-স্পন্দন সম্পূর্ণ আলাদা, বাইরে থেকে তার অনুলিখন সম্ভব নয়। প্রয়াস ক'রে যা শেখা যায় এবং মধ্যবিত্ত-অধ্যুষিত সাহিত্যের পাতায় পরিবেষণ করা চলে, তা এক ধরনের আধো-ভদ্র আধো-অভদ্র মিশ্রণ। এই মিশ্রণ বিশেষ কারো ভাষা নয়— চাষীমজুরের তো নয়ই—, নেহাৎই ভদ্রলোকের সাহিত্যাশ্রয়ী তার অভিযাত্রা। সাম্যবাদসম্মোহিত মধ্যবিত্তদের দুধের সাধ ঘোলে মেটানোর পক্ষে হয়তো

যথেষ্ট এ-ভাষার দ্যোতনা, কিন্তু তার বাইরে তার অন্য-কোনো ভূমিকা নেই।

ইতিহাস মাঝে-মাঝে প্রতীপ রসিকতা করে। সমাজতন্ত্রের সারাৎসার সম্বন্ধে মাথা না-ঘামিয়ে, দেশের বিবিধ শ্রেণী-সম্পর্কের বিজ্ঞানসহ বিশ্লেষণ শিকেয় তুলে রেখে, নিছক অপরমুখাপেক্ষী হয়ে এগোতে গেলে দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী, যা অভিলক্ষ্য ঠিক তার বিপরীত প্রান্তে পৌঁছে যেতে হয়, সমরেশ বসু ও তস্য সম্প্রদায় দ্বারা এ-জিনিশটি দৃষ্টান্তিত হচ্ছে। আঙ্গিকসর্বস্বতায় ও-পক্ষে যেমন ঘোর সর্বনাশ, এ-পক্ষেও তাই। প্রকট কায়দাকানুন চোখ-ধাঁধানোর পক্ষে ভালো, কিছু কিছু ঠোঁট-আওড়ানো বুলি-কপচানোর পক্ষেও ভালো, কিন্তু 'সমাজধর্মী' সাহিত্য নিছক আঙ্গিকের হাওয়া খাওয়া নয়। আরো গভীরে যেতেই হবে। যেখানে এই গভীরের অভিজ্ঞতা নেই, সাহিত্যকর্ম সেখানে ব্যর্থ। ব্যর্থতা থেকে ক্লান্তি, ক্লান্তি থেকে তিক্ততা, তিক্ততা থেকে বিচ্যুতি, বিচ্যুতি থেকে সুবিধাবাদের অন্ধকারে হঠাৎ-প্রস্থান: মোটামুটি সমরেশ বসুদের এটাই ছক-কাটা উপাখ্যান। সমরেশ বসুর ভাষাব্যবহার বদলায়নি, প্রাকরণিক সরঞ্জাম অবিকল একই আছে, যা ঘটেছে তা ভরণের প্রকৃতি-পরিবর্তন। যে নির্বিকার দায়িত্ববোধে সমরেশ বসু একদা চটমজুর-মজুরনীর ইতিকথা লিখতেন, অনুরূপ বোধের শিকার হয়েই খেলো যৌনপ্রসঙ্গবিধৃত, জনতাবিরোধী গ্রন্থকীট যান্ত্রিক দক্ষতায় এখন বাজারে ছাড়ছেন। ঊর্ধ্ব হিতাহিত এই দক্ষতা, 'সমাজধর্মী' সাহিত্য আন্দোলনের চরম অসাফল্যের কলঙ্ককাহিনীর স্বাক্ষরবাহী।

অথচ জনৈক সমরেশ বসুর বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, ইতিহাসের প্রতি পর্বে-উপপর্বে এ-ধরনের ছুটকো বিচ্যুতি ঘটবে; আগেও ঘটেছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। আমার প্রধান ভাবনা উটকো অবস্থায় আমরা যারা আছি, তাদের নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ কোথায় কী প্রসঙ্গে যেন লিখেছিলেন: মূর্খ আমরা, জানি না কহিতে কথা। আশেপাশে তাকিয়ে দেখুন, ময়দানের বক্তৃতার ভাষা শুনুন, দেয়ালের-পর-দেয়াল জুড়ে শ্লোগানের নির্ঘোষ পড়ুন, পড়ুন বিপ্লবের-তপ্ত-হল্কা-ছোঁয়া বাংলাদেশকে-ছেঁকে-ধরা পত্র-পত্রিকা-ইস্তাহার। শ্রীছাঁদহীন ভাষা, অবহেলায় লালিত ভাষা, যেন পুরো দায়-দায়িত্বটা একমাত্র তাঁদেরই যাঁরা উদ্দিষ্ট, কষ্ট ক'রে বুঝে নিন কী বলা হচ্ছে। নিম্নবিত্ত-বিত্তহীন-নিরক্ষররা এখনো পরিধির বাইরে, তাঁদের অছি হিশেবে আমরা মধ্যবিত্তরা বিপ্লব ফাঁদছি, শ্রেণীশত্রু খতম করছি, শহর অবরোধ করছি। কিন্তু যে-ভাষায়

করছি তা হৃদয়ঙ্গম করা সর্বহারাদের সাধ্যাতীত, তাঁরা যদি তা সত্ত্বেও আমাদের অনুগমন করেন তা নেহাৎই অনুমানে ও অনুভবে। কিন্তু এই অন্তর্বর্তী সময় খুব বেশিদিন টিঁকবে না। ঘটনার প্রবাহ আরো-একটু এগিয়ে গেলে আমাদের মতো ফড়েদের পালা ফুরোবে, যে-জারজ ভাষায় আমরা আসর গরম ক'রে রাখছি তা-ও সঙ্গে-সঙ্গে ঝ'রে পড়বে। বাংলার লোকঐতিহ্য নিজেকে স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত করবে তখন, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ভাষা দৃঢ়প্রত্যয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবে, ব্যাকুল বাদলসন্ধ্যায় কপোলকল্পিত সামন্তধর্মীমধ্যবিত্তবাচনভঙ্গির যতিপাত ঘটবে।

কিন্তু যতদিন না ঘটছে, ততদিন? তাছাড়া, ইতিহাস যদিও, কখনো-সখনো থমকে-থাকা সত্ত্বেও, এগোবেই, এই এগিয়ে-চলার ধারাক্রমে আকস্মিকতা তথা কাকতালীয়তার ভূমিকা তুচ্ছ করবার মতো নয়। উঁছা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সর্দারপনা অসহ্য, কিন্তু আপাতত, শত ত্রুটি-বিচ্যুতি চোখে পড়লেও, অন্য-কোনো পথ নেই। মধ্যবিত্তদের চিন্তা-ভাবনার প্রণালী সম্পর্কে অনবচ্ছিন্ন বিশ্লেষণ ইতিহাসবোধের তাগিদেই দরকার। ভাষাব্যবহারের ক্রমবর্ধমান অবনতি-অপকৃষ্টি সেজন্যই গা-ছমছমে ব্যাপার। 'সাম্যবাদী' সাহিত্য, যা একদা মধ্যবিত্তদের পত্রিকায় সীমিত ছিল, এখন তা পরিব্যাপ্ত দেয়ালের লিখনে, মিছিলের চিৎকারে, বিপ্লবী নির্দেশের গোপন সংজ্ঞায়। মধ্যবিত্তশ্রেণীভুক্ত বিপ্লবীরা সমরেশ বসু-গোত্রের কাউকে, হাতের মুঠোয় পেলে, অবশ্যই বোমা মেরে মাথা উড়িয়ে দেবেন—অথবা রামদা দিয়ে কুপিয়ে খতম করবেন—, কিন্তু ভালো ক'রে কান পেতে শুনুন, তাঁদের নিজেদের বাচনের সঙ্গে সমরেশ বসুর বাচনের কোনো তফাৎ নেই, যেন সমরেশ বসুরই মন্ত্রশিষ্য তাঁরা। যে অর্ধ-নিরক্ষর অর্ধ-অসাধু বিন্যাস 'সমাজধর্মী' সাহিত্যপ্রয়াসের উত্তরাধিকার, তা একদিকে যেমন সমরেশ বসু দখল ক'রে বসেছেন, অন্যদিকে আমাদের ভাববাষ্পব্যাকুল তরুণ সম্প্রদায়ও করেছেন। বাগবাজারের দেয়ালে যাঁরা স্রেনিসত্রু নিধনের পরে সোসণহিন সমাজের ঘোসণা প্রচার করেন, তাঁরা 'বিবর'-এর পৃথিবী থেকে আদৌ দূরে নয়।

মস্ত সমস্যা এটা। বানান অসুন্দর হ'লে, ব্যাকরণ ঘোর অশুদ্ধ হ'লেই আমরা সাধারণের কাছাকাছি পৌঁছে যাবো, এই ধারণাকে আমি প্রতিবিপ্লবী কুসংস্কার ছাড়া অন্যতর আখ্যা দিতে পারি না। যে-কোনো সাধনার মূলে প্রযত্ন, নিষ্ঠা।

যে-ভাষার মধ্যবর্তিতায় বিপ্লবের বাণী প্রচার করতে চাইছি, তাকে আমি কোন্ সাহসে অপমান করি? ভাষা প্রত্যক্ষ হোক, স্পষ্ট হোক, আটপৌরে হোক, হোক তা নিরাভরণ, নিরাবরণ; কিন্তু ইচ্ছাকৃত কুশ্রী বিকৃতি তার কেন ভাগ্য-লিখন হবে? মার্ক্স যাঁদের 'লুম্পেন' বলে বর্ণনা করেছিলেন, তারা কখনোই বিপ্লবের ধারক হ'তে পারে না, তাদের ভাষাতেও তাই বিপ্লবের দ্যোতনা থাকা অসম্ভব; একমাত্র সর্বনেশে রোমান্টিক ভাবুকতাই বিপরীত-কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে পারে।

বাংলাদেশের নগরেপ্রান্তরে আপাতত এই লুম্পেন নৃত্য চলছে। পাপবোধ-বিধুর মধ্যবিত্তদের শ্রেণীচ্যুত হবার ইচ্ছা অন্য-সমস্ত বাসনাকে ছাড়িয়ে। কিন্তু রাতারাতি সে-জাদু সংঘটিত হবার নয়। জনগণের সঙ্গে সত্তাকে বিলীন ক'রে মিশে যেতে পারার অক্ষমতা থেকেই এ-লুম্পেনপ্রবৃত্তির জন্ম। সম্প্রতি লুম্পেনে-লুম্পেনে যে-হানাহানি চলছে, তা যেমন না-শ্রেণীযুদ্ধ, না অন্য কোনো নৈতিক সংঘর্ষ, নিছক অতি সাধারণ পাড়াটে নোংরামি, বিপ্লবের ছিটেফোঁটা আভাস পর্যন্ত তাতে নেই, ভাষার রাজনৈতিক প্রয়োগঘটিত ব্যবহারের বর্ধমান নিকৃষ্টিও সেরকম বিপ্লবের প্রসঙ্গশূন্য, নেহাৎই অপগত মানের ব্যাপার। লাঠিও ভাঙছে, সাপও মরছে না।

আমরা তা হ'লে কী করবো? বিপ্লবের গতি তীক্ষ্ণতর হ'লে কৃষকমজুরের দল আমাদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করবেন, মোড়লি থেকে আমরা বাদ পড়বো, আমাদের লুম্পেনি ভাষাও গলাধাক্কা খাবে। কিন্তু আপাতত কী করা, যতদিন তা না হচ্ছে, যতদিন বামুনবদ্যিকায়েতরা সর্বহারার ভূমিকা আত্মসাৎ ক'রে সংগঠন গড়ছে, কারখানা অচল ক'রে দিচ্ছে, দেয়ালের গায়ে পোস্টার আঁটছে? পঁচিশ বছর আগেকার ঘোরানো-প্যাঁচানো ন্যাকা-ন্যাকা ভাষাবিন্যাস অবশ্যই অসহ্য, কিন্তু সমান অসহ্য একদা-'সমাজধর্মী' সাহিত্যের সমবেশ বস্তু-প্রতিম ঐতিহ্য। বক্তব্যের সঙ্গে ভাষাকে সমান্তরাল স্বাভাবিকতায় স্থাপন করতে আমরা যদি অসফল হই, জাতীয় কলঙ্ক হবে সেটা। দেরাজ থেকে ঝেড়ে আমাদের মাঝে-মাঝে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের লেখা নতুন ক'রে আদ্যোপান্ত পড়া উচিত, ভাষার শরীরে চিন্তার দ্যুতি কী আশ্চর্য অবলীলায় প্রোথিত। মানিকবাবুর গদ্য থেকে যদি রাম-শ্যাম-যদু-মধু কারোরই কিছু শেখবার না-থাকে, তা হ'লে বুঝতে হবে গোড়াতেই গলদ, গাধাকে পিটিয়ে ঘোড়া বানানো যেমন অসম্ভব, আমাদের

মতো নির্ভেজাল মধ্যবিত্তদের দিয়ে অনুকম্পায়ী ভাষাব্যবহারও তেমনি অসম্ভব, শেষ পর্যন্ত সমরেশ বসুতেই আমাদের গতি। অচিরে একদিন সমাজের অধমর্ণদের দল এসে সবাইকে জ্বলন্ত উনুনে ছুঁড়বে, সে-অবস্থাতেও আমাদের ঠোটে লুম্পেনি বুলি লেগে থাকবে, নামতা পড়তে-পড়তে নরকে যাবো।

আপাতত এই সমস্যার চিন্তা থেকে আমি মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

বাংলাদেশ

বাংলাদেশের আরো অগণিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্তের মতো, প্রারম্ভিক অন্ধ গান্ধিভক্তি থেকে শেষ বয়সে আমার বাবার অয়ন ঘটে কমিউনিস্ট পার্টির সন্নিকট বৃত্তে। ১৯৬৪ সালের যে-সপ্তাহে কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে দু'ভাগ হয়, সেই সপ্তাহেই আমার বাবা মারা যান। ঘনবদ্ধ তমিস্রার সময় গেছে সেটা, আন্দোলন ছত্রভঙ্গ, পরিপার্শ্ব নির্জীব; ভদ্রলোক মৃত্যুর অব্যবহিত আগে মনে পড়ে দুঃখ ক'রে বলেছিলেন: যা ব্যাপার-স্যাপার ঘটে গেলো, গোটা পঁচিশ বছরের মধ্যেও আর দেশে কমিউনিজম আসবে না।

কিন্তু মাত্র পাঁচ বছরেই ভেল্কিবাজি হয়েছে। আসলে ইতিহাস নিজের নিয়ম বেয়ে এগোবেই। সাময়িক বাধা মাঝে-মাঝে কিছু অস্থৈর্যের সঞ্চার করতে পারে মাত্র, তার বেশি কিছু না। এই পাঁচ বছরে বাংলাদেশের পটভূমি যেমন বদলেছে, মানসিকতার রঙও আশ্চর্য দ্রুততায় পরিবর্তিত হয়েছে সেই সঙ্গে। দ্রুত, ক্ষিপ্র, তীক্ষ্ণ, কোলাহলদীর্ণ এক আবর্তের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি। ইতিহাস খানিকটা সময় থমকে থেকে হঠাৎ ফের বেগবান হয়েছে ব'লেই হয়তো, এক সঙ্গে অনেক-কিছু ঘটছে, তাল-বেতাল, প্রকট-অস্ফুট, মোলায়েম-রূঢ়, মহান্-ক্লেদাক্ত। একটি বিশেষ গ্রহের আবহের আনুগত্য থেকে অন্য-এক মূল্যের আবহে পৌঁছুবার ক্রান্তিলগ্নে এরকম এলোপাথাড়ি ঘটনা-উপঘটনা অনিবার্য। সামাজিক উপপ্লবের প্রথাটি কোনোদেশেই ঠিক মধ্যবিত্ত আচারকলা-শিষ্টতা-ভদ্রতা মেনে নিয়ে এগোয় না। আর যা-ই হোক, গণিতের অনুশাসনে সমাজ কখনোই বাঁধা পড়ে না: যদি পড়তো, তা হ'লে একমাত্র পদার্থবিজ্ঞানী ছাড়া কারো প্রয়োজনই থাকতো না এই পৃথিবীতে।

রোজ কাগজ খুলে আপাতত আমাদের বিঘ্নিত শান্তির খবর পড়তে হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে দামাল অশান্তি, কলকারখানায় ঘেরাও-ধর্মঘট, ছাত্রমহলে উচ্চগ্রাম অবিনয়ী প্রতিবাদ, সদাগরী পাড়ায় কেরানিদের শক্তির আস্ফালন। ভীষণরকম গোলমাল, করালবদনী তারা শ্মশানে নৃত্যরতা হ'লে যে-ধরনের প্রলয়াভাস আমাদের কল্পনায় আসে, হুবহু যেন সেরকম অবস্থা। অবিকল নৈরাজ্য নয়, কিছু-কিছু অসুবিধা ঘটলেও, অধিকাংশ শ্রেণীর লোকই এখন পর্যন্ত মোটামুটি খাচ্ছে-দাচ্ছে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটি অর্ধস্বচ্ছ অনুভাবনা যে আর খুব বেশিদিন এভাবে চলতে পারবে না, বিস্ফোরণ ঘটবেই। এই বিস্ফোরণের আশঙ্কায় কেউ ভয়ে কুঁকড়ে আসছেন, কেউ শিলীভূত ক্রোধে রুদ্ধবাক হচ্ছেন; অন্য কেউ-কেউ বিস্ফোরণের প্রত্যন্তে নীলাকাশ-কাশফুল ইত্যাদির স্বপ্ন দেখছেন, তেমন-কেউই নিরপেক্ষ চিন্তায় উৎক্ষিপ্ত নেই আর।

তার অর্থ শ্রেণীবিভাজনের দিকে ক্রমশ আমরা এগোচ্ছি। ঢালাও উক্তি করা হলো। মানছি, যা-যা ঘটছে তাদের মধ্যে অনেক উচ্চাবচতা আছে, অমুক তত্ত্বের তমুক প্রশাখার ফলিত দৃষ্টান্ত কেউ খুঁজতে গেলে অযথা হন্যে হবেন, নয়তো গোঁজামিল দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আপাতপরস্পরবিরোধী অনেক কিছুর সমন্বয় ১৯৬৯ সালের বাংলাদেশে: যে-মীমাংসাই উপস্থিত করি না কেন, তার পরিপন্থী কোনো ভগ্নাংশিক সিদ্ধান্ত অন্য-কেউ নিশ্চয়ই প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে হাজির করতে পারবেন। সুতরাং আমি পাদটীকা নিয়ে ঝগড়ায় নামবো না, খুব সাধারণভাবে শাদামাটা কতগুলি লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করবো। লক্ষণগুলি দেখেই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো: ছায়া পূর্বগামিনী।

দেখে-শুনে প্রথমেই যা মনে হয়, বাঙালি সমাজে মিহিন মধ্যবিত্তদের প্রভাব কমছে, একদা যাঁরা ভদ্রলোক-নামে অভিহিত হ'তেন, তাঁদের একটা বড়ো অংশ শ্রেণীস্খলিত হয়ে প্রথাগত ছোটোলোকদের কাছাকাছি যাচ্ছেন। দেশভাগ না-হ'লে এই পরিবর্তন অসম্ভব ছিল। দুটো ঘটনাক্রমের ফলে ভদ্রশ্রেণী কৌলিন্যহৃত হয়েছেন, এখনো হচ্ছেন। কলোনিতে-স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে-শহরের বস্তিতে জড়ো-হওয়া শরণার্থী সম্প্রদায় বিগত দুই দশকে মস্ত ক্রান্তির মধ্য দিয়ে গেছেন। বামুন-বদ্যি-কায়েতরা পূর্ববঙ্গের ভিটেবাড়ির নিটোল সুখস্বাচ্ছন্দ্যের স্বপ্নগর্ব-অহমিকা আস্তে-আস্তে ভুলেছেন; গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ ইত্যাদির স্মৃতি ফিকে হ'তে, হ'তে একেবারেই মিলিয়ে গেছে; বর্তমানের প্রকট দারিদ্র্য-খিন্নতার

মধ্যে যে-ছেলেমেয়েরা আস্বাস্থ্যে-বিরক্তিতে বড়ো হয়ে উঠেছে, পূর্ববঙ্গের অভিজাত রূপকাহিনী তাদের কাছে উপহাসকথার পরিচয় নিয়ে প্রতিভাত হয়েছে। যেখানে স্মৃতি নেই, সেখানে জড়তাও নেই। কলোনির শিশুসম্প্রদায় তাই সমতায় মিলতে পেরেছে, বিত্তহীনদের অভাবের সমতায় পরস্পরের কাছাকাছি চ'লে এসেছে। খাদ্যে-পোশাকে-শিক্ষার সুযোগে-অবস্থানের মালিন্যে একেবারে কাছাকাছি এসে যাওয়া: একদা যাঁরা জমিদার ছিলেন, শৌখিন সদাগর ছিলেন, রাজপুরুষ পরিবারের অঙ্গীভূত ছিলেন, টিটাগড়ে-যাদবপুরে তেলেনিপাড়ায়-শক্তিগড়ে-রানাঘাটে-কল্যাণীতে তাঁরা সবাই এখন কলোনির অকৌলিন্যের সমান অংশভাক্।

এটা এক দুঃসহ অভিজ্ঞতা, কিন্তু দুঃসহ বলেই হয়তো, তার গাম্ভীর্যেরও পরিসীমা নেই। শরণার্থীশ্রেণীর বহির্গত যত পরিবর্তন ঘটেছে, মানসিকতার রূপান্তরের প্রকোপ তার চেয়ে বরঞ্চ উদ্দামতর হবেই। প্রায়ই অনুশোচনা হয় আমার, বাংলাদেশের এই ভয়ংকর সামাজিক উপপ্লব নিয়ে তেমন-কোনো মহৎ উপন্যাস লেখা হলো না, হৃৎপিণ্ড দীর্ণ ক'রে বেরিয়ে এলো না কোনো উথাল-পাথাল মহাকাব্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আত্মহত্যার অধিকার' আজ থেকে চল্লিশ বছর আগেকার পটভূমিতে একটি বিশেষ জরাজীর্ণ অবক্ষয়ের মর্মকথা বিধৃত করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে যে-প্রলয়ঝড় ব'য়ে গেছে, তার কাহিনীর দ্যোতনা আরো অনেক বেশি ব্যাপক, অনেক বেশি ইতিহাসমুখর। এবং এই ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে আত্মঘাতমগ্নতার আভাস মাত্র নেই। যেখানে স্মৃতি নেই, অবমাননার পরিসরও শূন্য সেখানে: বাংলাদেশের উদ্বাস্তু সন্তানেরা অতএব আত্মগ্লানি থেকে ভুগছে না, নিজেদের পরিকীর্ণ ক্লিন্নতা অভ্যস্ততার সঙ্গেই গ্রহণ করেছে, কিন্তু তাই ব'লে বর্তমান অবস্থাকে স্বাভাবিক হিশেবে গ্রহণ করবার প্রবৃত্তি নেই তাদের। এই প্রবৃত্তি-না-থাকাটাই আসলে স্বাভাবিক: থমথমে হিংসা, পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ, ক্লেদাক্ত হানাহানির অভাব ঘটলেই কেমন-কেমন ঠেকতো।

অন্য যে-ক্রান্তি সাধিত হয়েছে তা বৃত্তির লোকায়নে। অর্থনৈতিক দুর্দশার চাপে একদা-ভদ্রলোকের ছেলেরা কারখানায় ঢুকে মুসলমান-নমঃশূদ্র-হাড়ি-বাগ্দীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গতর খাটছে, সংগঠন করছে, মিছিলে সোচ্চার হচ্ছে, সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে ফরাশ-পিয়ন-চাপরাশি ইত্যাদি কাজে

বামুন-কায়েতের ছড়াছড়ি, যেমন অন্যপক্ষে বড়োসাহেব-বড়োবাবুদের মধ্যে প্রচুর 'ছোটোলোক' শ্রেণীর ভিড়। ট্রাম-বাস কণ্ডাক্টর-ড্রাইভারদের লিস্টি দেখুন, রেলোয়ের ফায়ারম্যান-পয়েণ্টসম্যানের লিস্টিও, কিংবা পুলিশের জমাদার-কনস্টেবলের তালিকাও। পেটের তাগিদে শ্রেণীভেদ-বর্ণভেদ একাকার হয়ে যাচ্ছে। রেস্তরাঁ-চায়ের দোকানের ছোকরাগুলোর পরিচয় নিতে গেলেও একই বিস্ময় : হয়তো আবদুল্লা রসুলের সঙ্গে গলাগলি হয়ে কাজ করছে মিলন বাঁড়ুয্যে, তাদের সঙ্গে গভীরতম দোস্তি যে-ছেলেটির তার নাম শুনতে পাবেন বাগেশ্বর ডোম। বড়োলোকরা নামছে, ছোটোলোকরা উঠছে, নতুন-এক ভারসাম্যের দিকে সমাজ এগোচ্ছে। সদ্গোপের ছেলে কবিতা লিখছে, বিশুদ্ধ বদ্যিসন্তান ছুতোরের কাজ করছে, তিরিশ বছর আগে এরকম ঘটনাপরিক্রম কল্পনা করা মুশকিল ছিল। অবশ্য নানাধরনের অসমতা এখনো আছে : রাস্তায়-মিছিলে-কারখানায়-দপ্তরে কাজের আঙিনায় যে-নিরঙ্কুশ মিশ্রণ চোখে পড়ে, পারিবারিক ক্ষেত্রে তা সম্ভবত এখনো তেমন ব্যাপক রূপ নেয়নি। কিন্তু প্রবণতায় ভুল নেই, জীবনযাত্রার নানা খুঁটিনাটি যেহেতু সমমাত্রিক হ'তে চলেছে, ব্যবহারিক বাকি আড়ালগুলিও আস্তে-আস্তে তাই মিলিয়ে যাবে।

ঐতিহ্যের গালে চড় মেরে বাঙালি সমাজ হঠাৎ জঙ্গম হয়ে উঠেছে, এবং, প্রধান পরিণতি যা দেখা দিচ্ছে, গরীবশ্রেণীর আপতিক ওজন ক্রমবর্ধমান। প্রতীপ ঝোঁকও যে এখানে-ওখানে সোচ্চার হচ্ছে না তা নয়। যাঁরা বস্তিতে-কলোনিতে, তাঁদেরই কোন জ্যাঠতুতো বা মামাতো গোষ্ঠী মওকা পেয়ে অবস্থা ঘুরিয়েছেন, বাড়িতে এয়ার-কণ্ডিশনার লাগিয়েছেন, টেরিকটের নাতিশীতোষ্ণ মসৃণতায় চামড়ার আরাম উপভোগ করছেন, ঘেরাও হবার আতঙ্কে নীল হয়ে আসছেন, মিহিন মহিলাদের নিয়ে মসৃণ ব্যভিচারের সোনালি স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু, বাংলাদেশে অন্তত, এঁরা অতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। দীর্ঘ কুড়ি বছরের কংগ্রেসী শাসনের অযোগ্যতার জন্যই হোক, অথবা দেশজ অদক্ষতার জন্যই হোক, লাইসেন্স-পারমিটের মরীচিকাময় গোলকধাঁধায় বাঙালিরা বেশিদূর এগোতে পারেনি ; এদিকে-ওদিকে দু-একজন সদাগরি চাকরিতে উন্নতি দেখিয়েছে, একজন-দুজন নতুন দিল্লিতে মস্ত রাজপুরুষ হ'তে পেরেছেন, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। মহারাষ্ট্র-পঞ্জাব-তামিলনাড়ু ইত্যাদি নানা অঞ্চলে প্রথমদিকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার, পরে প্রতিরক্ষার হুজুগের ফিকিরে, মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্তরা নিজেদের

ব্যাপার-স্যাপার যেমন গুছিয়ে নিতে পেরেছেন, বাংলাদেশের উক্ত শ্রেণী তার শতাংশও পারেননি। এমনকি রাজেন মুখুজ্যে-গোছের প্রাচীন পুরুষরা একযুগ-দুযুগ আগে যতটুকু গুছিয়ে রেখে যেতে পেরেছিলেন, তাঁদের বংশধরেরা তাতে উল্লেখযোগ্য কোনো সংযোজন তো করতে পারেনইনি, অনেক ক্ষেত্রে তা ব'সে-ব'সে ধ্বংস করেছেন মাত্র।

সুতরাং নিতান্তই গুটিকয় লোক এখন বাংলাদেশে মধ্যবিত্তসুলভ সচ্ছলতা প্রাচুর্যের স্বপ্ন দেখে থাকে; লেখাপড়া-করে-যে, গাড়িঘোড়া-চড়ে-সে, এই ভাবালুতার ঋতু শেষ হয়েছে। ছোটোলোকদের স্বপ্ন-দেখার পদ্ধতিটি অন্যরকম, স্বপ্নের সারাৎসারও ভিন্ন হ'তে বাধ্য। কারখানার মজুর ফোরম্যান হবার মতো অভীপ্সা নিয়ে সময় নষ্ট করে না, দপ্তরের পিয়ন অফিসারের আসনে বসবার কল্পনা নিয়ে নিজেকে প্রসারিত করতে চায় না; তাদের চিন্তার প্রধান উপজীব্য সপ্তাহ-কি-মাসান্তে একটু-বেশি রুজি, কাজের পরিবেশে ঈষৎ-একটু নিয়ন্ত্রণের হ্রস্বতা, একটু ভালো মাথা গুঁজবার জায়গা; এদেরই মধ্যে যারা নিজেদের জীবনের গ্রন্থিগুলির সঙ্গে ইতিহাসের গতিরেখাকে মিলিয়ে নিতে শিখেছে, তারা হয়তো সামান্য একটু আরো এগিয়ে আস্ত সমাজব্যবস্থার পাল্টানোর কথাই ভাবছে, কিন্তু এই ভাবনার উপসংহারে রাজপুত্তুররাজকন্যা-জড়ানো বিলাসব্যসন নেই। বাংলাদেশে স্বপ্নও গরিবিয়ানার দিকে ঝুঁকছে।

আবহাওয়া তাই কর্কশ হয়ে উঠছে। চিক্কণতা-পেলবতা ক্রমশ ক'মে আসছে, অভাবের কথাবার্তাই এখন বেশি; ঘাম-কাদা ছেঁড়া-জুতো ছেঁড়া-জামার প্রসঙ্গ, শালা-বান্‌চোত-গোছের সম্বোধনের মাত্রাবৃদ্ধি, চিরাচরিত উপদেশামৃতকণায় সন্দেহ, বড়োলোকদের সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য-ঘৃণা-ক্রোধ। এরই পাশাপাশি, গ্রাম্যতা-বোধের বর্ধমান প্রসারণ লোকের ভিড়, স্থানসংকুলান হয় না বাঙালিদের, পশ্চিম বাংলার সীমিত গণ্ডির মধ্যে চারকোটি লোক কোনোক্রমে গাদাগাদি-ঠাসাঠাসি ক'রে থাকে। শহর-গ্রামের অপরিচয় আস্তে-আস্তে তাই ঘুচছে: জীবিকার জন্য ট্রেন ঝাঁকিয়ে আসতে হয় কলকাতায়, কিন্তু যেহেতু থাকবার ঠাঁই হয় না সেখানে, দিনান্তে ফিরতে হয় পল্লীর উপান্তে। শহর, শহরাঞ্চল, কলোনি, কারখানার ব্যারাক, গ্রাম: একটি বিশেষ ঢালুরেখায় ক্রমশ পরম্পরমণ্ডিত হওয়া। গ্রামচেতনা বেড়ে যাওয়ার অন্যতর কারণ অবশ্য রাজনৈতিক। ভাগচাষী-মজুরচাষী বহুদিন মুখ বুঁজেই প'ড়েছিল: মাঝে-মাঝে, কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলনের ফলে,

এখানে-ওখানে বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়েছে, কখনো নিষ্পেষণের ফলে, কখনো নেতাপর্যায়ের লোকেদের সুবিধাবাদের ফলে, তা অচিরে মিলিয়ে গেছে। কিন্তু ইদানীং প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেছে। মাথাপিছু ভোট, কিছু-কিছু প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, কিছু-কিছু সংহত আন্দোলন, সব-মিলিয়ে পল্লীঅঞ্চলের হাভাতেরা নিজেদের মধ্যে একটি অন্য শক্তি আবিষ্কার করতে পারছে। সংগঠন, প্রায় অমোঘ নিয়মেই, জোরালো হচ্ছে; দাবি প্রবলতর হচ্ছে; দাবির প্রকাশ ক্রমশই রূঢ় থেকে রূঢ়তর। এমনকি যদি যুক্ত ফ্রণ্ট ইতিমধ্যে সরকার দখল ক'রে না-বসতোও, অবস্থার এমন মোড় ফিরেছে যে ১৯৫৯ সালে বিধান রায়ের পুলিশ যে-ধরনের অবলীলাক্রমে কৃষকমিছিলের উপর গুলি চালিয়ে নিধনযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিল, তার পুনঃসংগঠন আদপেই আর এখন সম্ভব নয়, তার আগে পুরো বাংলাদেশ জ্ব'লে-পুড়ে-ধ্ব'সে যাবে।

যুক্তফ্রণ্টের উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে গ্রামে-গ্রামে ক্ষমতা-হস্তান্তরের পর্ব উপস্থিত চরমে উঠেছে: এতকাল ধ'রে বড়োলোকদের-অপশাসন-মানা গ্রাম ছোটোলোকদের দখলে চ'লে যাচ্ছে। এ-ব্যাপারেও অবশ্য বহু মিশ্র লক্ষণ চোখে পড়ছে। এক-ধরনের পটপরিবর্তন ঘটছে, এক দল নিঃস্ব হচ্ছে, আরেক দল শূন্য-স্থান পূর্ণ করছে; কিন্তু ঘটনাপরম্পরা এমন যে কোনো নির্দিষ্ট সমাজবিপ্লব ব'লে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়; বিবিধ আবিলতা প্রবেশ করেছে, কার মনে কী আছে সব সময় বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব নয়, আবর্তের সুযোগ নিয়ে বহু এ-ও-সে সুবিধা গুছিয়ে বসছে। তাছাড়া, বিপ্লব বিখণ্ডিত বস্তু নয়, কোনো-বিশেষ পল্লী ও তার আশেপাশে বিপ্লব সুসম্পন্ন-সংগঠিত, আপাতত অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীরা আঙুল চুষুক, তা হবার নয়; শহরে-কারখানায় পালাবদল হলো না, একমাত্র গ্রামেই শুধু হলো, তা-ও যুক্তিগ্রাহ্য নয়; অধিকন্তু যা বলা চলে, আমাদের রাজ-নৈতিক অবস্থান এমন যে শুধু বাংলাদেশেই ক্রান্তিকাল এসে গেছে, ভারতবর্ষের বাকি ভূখণ্ড আপাতত অন্যভাবে নিয়োজিত, তা-ও দুরূহ প্রস্তাব: যদি-না রাজ-নৈতিক-সামরিক-গঠনতান্ত্রিক নিয়মকলার ভিত্তিসুদ্ধ উপড়ে ফেলা যায়, তা হ'লে দেশের অন্যান্য অংশকে বাদ দিয়ে স্রেফ বাংলাদেশের পক্ষে বিপ্লবের শোভাযাত্রায় সামিল হওয়া ভীষণ কঠিন হবে।

সুতরাং ক্রান্তির প্রান্তরেখায় আপাতত আমরা দাঁড়িয়ে, দুমদাম কিছু পটকা ফাটালেই পারিজাত-ছাওয়া সমাজতন্ত্রের রাজ্যে পৌঁছে যাবো এমন দাবি করা

বাতুলতা হবে। গ্রামে-শহরে-কারখানায়-রাস্তায়-বস্তিতে নিশ্চয়ই এক প্রগাঢ় অন্য আবহ সঞ্চারিত হয়েছে। মধ্যবিত্তদের দীর্ঘ প্রহর বাংলাদেশে শেষ, ঐতিহ্য-গতভাবে যাঁদের আমরা ছোটোলোক ব'লে এসেছি, তাঁরা ক্রমে-ক্রমে ক্ষমতার শীর্ষ এবং উপত্যকা দুই-ই দখল করবেন। দখল করার আয়োজন সমাপ্ত, যবনিকা ইতিমধ্যে উঠেও গেছে। এই অধ্যায়টি নিস্তরঙ্গ হবার নয়: একটি বিশেষ শ্রেণী তাদের বনিয়াদি দখল থেকে বিচ্যুত হচ্ছে, নতুন আরেক শ্রেণী বেধড়ক যেখানে পারছে ক্ষমতা দখল ক'রে বসছে, রলরোল-আর্তনাদ বাদ দিয়ে এত-সব সম্পূর্ণ হবে, তা হ'তেই পারে না। এই অন্তর্বর্তী সময়ে শান্তি ব্যাহত হবে, উৎপাদন ব্যাহত হবে, দক্ষতা ব্যাহত হবে। অনেক রকম চুরি-চামারি ঘটবে, চতুরালি-হাতসাফাইয়ের বিরাম থাকবে না, ভেকধারী অনেক নারীপুরুষও দেখা দেবেন, মোহিনী-মায়ায় দু'দিন সাধারণ লোকদের ভোলাবেন, কাজ হাসিল হ'লে কেটে পড়বেন। ঠিক নিরাশ্রয়ে না-হলেও, নিরালম্ব-বায়ুভূত অবস্থার মধ্যেই আপাতত কিছুটা সময় আমাদের অবশ্যহেলন।

এরকম এলোমেলো জট-পাকানো অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যেতে-যেতেই একদিন পরিস্রুত স্বচ্ছতার দেখা মিলবে। ছোটোলোকদের শক্তি বেড়েছে ব'লেই সমাজতন্ত্রের কাছাকাছি আমরা যাচ্ছি, তা অন্তত এখনো কিছুতেই বলা চলে না। কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে যখন চোখে পড়ে শ্যামাপূজো-বিশ্বকর্মাপূজোর সমারোহও বাড়ছে, তখন সংখ্যাতত্ত্বকে গাল না-পেড়ে নৃতত্ত্ব নিয়ে ব্যাপৃত হওয়া উচিত। সমাজতন্ত্রের জন্য যাঁরা আন্দোলন করছেন, অর্থ-নৈতিক কাঠামোটা তাঁরা মস্ত নাড়া দিতে সফল হয়েছেন, রুজির লড়াইতে খুব বিস্তারিতভাবে চেতনা সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। কিন্তু ফাঁক থেকে গেছে। বাঙালিমানস প্রথাগত সাংস্কৃতিক দায়ভাগ থেকে এখনো মুক্ত হ'তে পারেনি: যিনি কমিউনিস্ট, তিনিই ফের মাদুলি পরছেন, যিনি ময়দানের সভায় গলা ফাটিয়ে মৈত্রীর-সৌভ্রাত্রের প্রবচন শোনাচ্ছেন, কলেজে-পড়া-মেয়ে পালিয়ে মুসলমান বিয়ে করছে ব'লে তাঁর এখনো ক্ষোভ উদ্রেক হ'তে দেখি। মধ্যবিত্ত মানসতা এখানে-ওখানে টিঁকে আছে ব'লেই স্বভাবে-আচরণে এধরনের পারম্পর্যের অভাব, এই ব্যাখ্যাও বোধহয় এ-ক্ষেত্রে যথেষ্ট না। কতিপয় প্রথাপ্রণালী-ব্যবস্থার মোহ হয়তো চট ক'রে ঘোচবার নয়। ইতিহাসচেতনা, শ্রেণীচেতনা প্রখর হ'লেই ঐ মোহ মিলিয়ে যাবে, তা না-ও হতে পারে। এখানেই

ভারসাম্যের প্রশ্ন আসে: যতদিন ঐতিহ্যাশ্রিত-সংস্কারমোহজড়িত বাধাগুলি চেতনার বৃহদংশ জুড়ে থাকবে, সামগ্রিক বিপ্লবের ততদিন আশা নেই। রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের দায়-দায়িত্ব এখানে তাই মস্ত ব্যাপক।

তবে সর্ষের ভিতর ভূত থাকলে সমস্যা আরো কঠিন। বাংলাদেশ আজ যে-অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, দেশভাগের পরবর্তী ঘটনাক্রমের আমোঘ নির্দেশেই হয়তো পৌঁছেছে, কিন্তু কমিউনিস্ট আন্দোলন বাদ দিয়ে ঠিক গেলো একুশ-বাইশ বছরের ইতিবৃত্ত লেখা সম্ভব নয়। এবং, এখন থেকে যে-বিশেষ গতিক্রম কল্পনায় ছক কাটা চলে, সেই রাস্তা ধ'রে এগোবার কালেও কমিউনিস্টরাই দিগ্‌নির্দেশ করবেন, এটা প্রায় ধ'রে নেওয়াই চলে। তা হ'লেও কথা থেকে যায়। নেতৃত্ব দেবেন কারা? আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত জনতার চেহারা বদলে যাচ্ছে, একদা যা মধ্যবিত্ত ভিড় ছিল, এখন সেখানে ছোটোলোকদের প্রকট উপস্থিতি। অথচ, যুক্তফ্রণ্টের প্রধান পুরুষদের দিকেই তাকিয়ে দেখুন, নেতাদের কোনো গোত্রান্তর চোখে পড়ে না। সমস্যা এখানে। এখন থেকে যদি নিম্নশ্রেণীর ভিড়ই আন্দোলনে উত্তমর্ণ, তবে নায়করাও ভিন্ন হতে বাধ্য: মধ্যবিত্ত সংস্কার দিয়ে ছোটোলোকদের গতির আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। আপাতত কিছুদিন এই দ্বন্দ্ব উপলক্ষ ক'রেই বাংলাদেশে একটা সংকট চলবে: গতকাল যাঁরা প্রগতিশীল ছিলেন, তাঁরা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবেন; ছোটলোকদের স্তর থেকেই নেতৃত্ব মাথা তুলবে। রাতারাতি এই অন্তর্বিপ্লব সংসাধিত হবে না, অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে। কিন্তু এই অপেক্ষা বাদ দিয়েও কোনো উপায় নেই। অনেক নোংরামি, নির্মমতা, চোরা-গোপ্তা আক্রমণ, এই অপেক্ষার ইতিহাসে জড়িয়ে থাকবে। বাংলাদেশের পলি-মাটিতে সম্ভ্রান্ততার বীজ সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর আগে পাওয়া দুষ্কর: আবহমান কাল শূদ্রের দেশ ছিল এটা; সেই নিকষ শূদ্রত্বেই বাংলাদেশ তা হ'লে ফিরে যাবে।

কিন্তু শূদ্রত্ব মানেই অবৈকল্য নয়। মধ্যবিত্তের সংস্কার বিত্তহীনদের উপরেও বর্তায়। তাছাড়া, শ্রেণীচেতনা অপরিস্ফুট থাকলে নানা ঝুটঝামেলা জায়গা জুড়ে বসে, কিংবা বসতে পারে। কেউ-কেউ হয়তো এমন হিশেবও দাখিল করবেন, বাংলাদেশের ছোটোলোকদের মধ্যে যত অর্থপ্রসঙ্গরহিত অপপ্রথা-অপবিশ্বাসের ছড়াছড়ি, মধ্যবিত্তদের মধ্যে তার শতাংশও না।

এ-সব সংশয় স্বীকার ক'রে নেওয়া ভালো। বড়োলোকদের দিন গেছে,

অভিজাত হোটেলের ব্যাংকেট ঘরে কি ঘোড়দৌড়ের মাঠে যত নর্তনকুর্দনই হোক না কেন, সমস্তই পরিশিষ্ট কাহিনী। এমন কি মধ্যবিত্তদের যে-অধ্যায় বাংলাদেশে ১৯০৫ সালে শুরু হয়েছিল, তা-ও প্রায় পরিণতির মুখে : ধিকিধিকি ক'রে বড়ো জোর আর দশ-পনেরো বছর মধ্যবিত্ত উজ্জ্বল-আলোকিত থাকবে, তারপর নিশ্চিহ্ন নিভে যাবে, শূদ্রযুগে প্রবেশ করবো আমরা। অন্তর্বর্তী বছরগুলি আবিলতায় ভরা থাকতে বাধ্য। একটি শ্রেণী ক্ষমতাচ্যুত হচ্ছে, আরেকটি শ্রেণী উপরে উঠে আসছে : কারো সন্ধ্যাই কারো প্রভাতকে আশীর্বাদ জানাবে না, কারো পূরবীই কারো বিভাসকে সম্ভাষণ করবে না। গান্ধিজির শতবার্ষিকী বৎসরে কথাটা বলতে ভালো শোনায় না, কিন্তু হৃদয়পরিবর্তন তত্ত্বটি যদি না স্বপ্নময় ভাবালুতা ব'লে পাশে সরিয়ে রাখা যায়, তা হ'লে বলতে হয় নির্ভেজাল বুজরুকি। শ্রেণীসংঘর্ষের ঠিক মাহেন্দ্রমুহূর্তে আমরা অবস্থান করছি ব'লেই, আপাতত বাংলাদেশ জুড়ে এত নৈরাজ্যলক্ষণ : শক্তিতে-শক্তিতে সম্মুখ-সমর, গোধূলিমুহূর্তে মনে হয় পৃথিবী যেন মাধ্যাকর্ষণহীন হয়ে ইতস্তত ছুটোছুটি করছে, নয় তো বিশৃঙ্খল বিষাদে থমকে দাঁড়ানো। ন-যযৌ-ন-তস্থৌ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা আরো কাতর : বুদ্ধির বিচারে তার আবেগ নিম্নগামী, স্বার্থের সংকেতে তা ঊর্ধ্বগামী, অতএব উতরোল দ্বন্দ্বের যন্ত্রণাভোগ থেকে মুক্তি নেই।

১৯৬৯ সালের পশ্চিম বাংলা, শাদামাটা বিচারে মনে হয়, এই অবস্থানে স্তম্ভিত। খবরকাগজ যাঁদের দখলে তাঁরা সর্বনাশের ক্রমঅগ্রসরমান ভাবমূর্তি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, আত্মরক্ষার তাগিদে এরকম দিনের-পর-দিন ধ'রে তাঁদের প্রলয়বিঘোষণা। নিজের নাক কেটে যদিই বা পরের যাত্রাভঙ্গের সম্ভাবনা, সুতরাং রবীন্দ্র-সরোবরপ্রতিম কলঙ্ককাহিনী বুনন। কিন্তু সংকটের লক্ষণগুলি আরো-নানা বিভঙ্গে পরিব্যাপ্ত। যুক্তফ্রণ্টের আভ্যন্তরীণ কলহকোলাহল, পল্লীতে-পল্লীতে দামাল রক্তবন্যা, কারখানায় হিংস্র উন্মত্ততা, ডালহৌসীতে বিস্ফোটিত উদ্ধতি, শিক্ষায়তনে অহরহ হামলা-হাঙ্গামা, খেলার মাঠে, বাসের ভিড়ে সামান্যতম সূত্র ধ'রে চরম পরিস্থিতির উদ্ভব, সমাজের সর্বত্র নিয়ম-নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পিত অবাধ্যতা : সব-কিছুই ক্রান্তিমুহূর্তের নিহিত অস্থিরতাকে প্রকাশ্যে ব্যক্ত করছে। সময় অস্থির, মীমাংসা অনিশ্চিত, তাই এত তত্ত্বের আরক্ততা, সকলের মুখেই একই ভাষণ : আমার-পথ-নির্ভুল-তোমার-পথে-মৃত্যু, আমার-ব্যাখ্যা-

আর্ষ-তোমার-ব্যাখ্যা-মিথ্যা। অহম্‌ নিয়ে, অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি, সংকট একেবারে তুঙ্গে, তাই একদিকে অন্ধ বিশ্বাস, অন্যদিকে নিশ্ছিদ্র ঘৃণা। বোঝা-পড়ার ঋতু শেষ হয়ে এসেছে, একটু ছেড়ে, একটু দু'পা এগিয়ে গিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে সন্ধি এখন থেকে অসম্ভব প্রস্তাব। বাংলাদেশ ক্রান্তির কন্দরে ঢুকে পড়েছে : এখন থেকে সুতরাং শুধুই যুদ্ধ।

এই-ই তা হ'লে ১৯৬৯ সালের, এবং আগামী বেশ-কয়েক বছরের, বাংলাদেশ, যতদিন পর্যন্ত না এক কিংবা অপর পক্ষ নিঃশেষ হয়ে যায়, অথবা পরাজিত বিনয়ে আত্ম-সমর্পণান্তে নতজানু হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করে। প্রত্যহ হত্যা, প্রত্যহ ষড়যন্ত্র, প্রত্যহ ঘেরাও-আস্ফালন-আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ। সমাজের সেই পুরোনো ছোটো-লোকেরা আস্তে-আস্তে দেশটাকে দখল ক'রে নিচ্ছে। যা ঘটছে, আগামীকাল ঘটবে, তা এই ক্রান্তির চিৎকার।

অন্য কতগুলি প্রশ্ন অবশ্য থেকে যায়। সংকটের সাঁড়াশিতে পিষ্ট হচ্ছি আমরা, অন্য-এক চেহারা নিয়ে উত্তর-মুহূর্তে পরস্পরকে সম্ভাষণ করবো, নীতিনিয়ম আচারকলা সমস্ত-কিছুই বদলে যাবে তখন। কিন্তু ইতিমধ্যে কী হাল হবে বাংলাভাষার, সাহিত্যের, সংগীতকলার, সংস্কৃতির অন্যান্য প্রশাখার? কবিতা কি অন্যরকম হয়ে যাবে তখন? রবীন্দ্রসংগীতের পুরোনো ব্যঞ্জনা মিলিয়ে যাবে? বাঙালির বচনে-শব্দচয়নে-ক্রিয়াপ্রয়োগেও ব্যত্যয় ঘটবে?

পূর্বাহ্ণ থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকা ভালো, অনেক-কিছুই অনেক-রকম ভাবে বদলাবেই, এই পরিবর্তনকে যাঁরা মূঢ় প্রতিজ্ঞার সঙ্গে বাধা দিতে যাবেন, ইতি-হাসের নিয়মে ছত্রভঙ্গ হবেন তাঁরা। সংগোপন অলিন্দে আশ্রয় নিয়ে যাঁরা কবিতার নাম ক'রে এক ধরনের সমাজার্থহীন শব্দসর্বস্ব খেলা খেলছেন, কবিতার প্রতীক তাঁদের ছেড়ে অনেক দূরে চ'লে যাবে, অলিন্দের প্রকোষ্ঠে তাঁরা মুখ থুবড়ে প'ড়ে থাকবেন। রবীন্দ্রনাথের গানের পুঞ্জিত আনন্দ অব্যাহতই থাকবে, কিন্তু গানের অনুষঙ্গ আমূল বদলে যাবে, ব্যবসাদারদের ভাড়াটে কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে প'ড়ে গান উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নেবে। বাংলাভাষার প্রকরণে মেঠো হাওয়া লাগবে; বিদেশী ভাষার প্রভাব, নিদেনপক্ষে কিয়ৎক্ষণের জন্য হ'লেও, কমবে। চিত্রে-নাটকে ঋজুতা আসবে, ন্যাকামির পালা হ্রস্বতর হবে। হঠাৎ যেন আমরা সংস্কৃত-র দুরুচ্চার্য তৎসমতা ছেড়ে পালি-র উপত্যকায় উত্তীর্ণ হবো। দেশ যেখানে ছোটোলোক হয়ে যাচ্ছে, দেশের বচন-বিভঙ্গও

লোকায়ততর হবে। এই কথা চিন্তা ক'রে যাঁরা এখন থেকেই শোকগ্রস্ত হ'তে চান, হোন : ক্রান্তি বড়ো নিষ্ঠুর নিয়তি।

যে-প্রশ্নের আমি উত্তর খুঁজে পাই না, তা অন্যদের প্রসঙ্গে। বাংলাদেশে যদি ক্রান্তি এতদূর গড়িয়ে যায়, ধাপের-পর-ধাপ বেয়ে, স্তরের-পর-স্তর চিরে ইতিহাস এগিয়ে চলে, ভারতবর্ষের অন্যত্র কী প্রতিক্রিয়া হবে তার? নতুন দিল্লির প্রভু-পাদরা কি সুবোধ বালকের মতো বাংলার প্রব্রজ্যা নিরীক্ষণই ক'রে যাবেন শুধু, না কি আতঙ্কে ফুঁসে উঠে প্রলয় সংহত করতে এগিয়ে আসবেন? যদি বাইরে থেকে আক্রমণের উদ্যোগ হয়, তা কোন্ উপায়ে প্রতিহত করা হবে? যদি আমাদের পুরোপুরি ছোটোলোক হয়ে যাওয়ার প্রবণতাকে বাইরের পৃথিবীর লোকেরা আটকে দিতে চায়, আমরা তা হ'লে কী করবো? সংগ্রাম না সমর্পণ? প্রাগন্বীক্ষিক যুক্তি যদিও সংগ্রামের কথাই বলবে, সংগ্রামে নিযুক্ত হ'লে আমাদের ইতিহাসের গতি কোথায় কী অবস্থায় কতদিন আটকা থাকবে, অঙ্ক ক'ষে তা বলা একেবারেই সম্ভব নয়। ঠিক একই রকম অসম্ভব, সীমান্তের ও-প্রান্তে, আর যাঁরা আরো ছ'কোটি বাঙালি আছেন, তাঁদের সঙ্গে কোনো সাযুজ্যে কখনো উপনীত হ'তে পারবো কিনা সে-জিজ্ঞাসার পূর্বমীমাংসা করা।

পিছনে কী ছিল ক্রমশ ভুলে আসছি, সামনের দিকে তাকালে চোখে ঘোর লাগে, থমথম অবস্থানে আমরা : ক্রান্তি, শ্রেণীস্খলন, দ্বন্দ্বের বিদীর্ণ যন্ত্রণা : ১৯৬৯ সালের বাংলাদেশের এরকম উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। যাঁরা ছোটোলোক হ'তে ভয় পান, পাঁকে-নোংরামিতে-ইতরামোতে যাঁদের বিবমিষা আসে, তাঁদের বিশেষ আশা নেই। আমার জ্যামিতিতে সব-ক'টি সম্ভাব্য রেখা সমান তীক্ষ্ণতায় আপাতত স্পষ্ট নয়, কিন্তু মনে হয় তেমন ক্ষতি নেই তাতে, নেতারা দ্বিধাথরো-থর হ'লেও ইতিহাস এগোবেই, বাইরে থেকে ভ্রূকুটি হ'লেও ইতিহাস অবিচল, বাংলাদেশের ছোটোলোক ব'নে যাওয়া মনে হয় রোধ করা যাবে না।

একটি প্রেমের গল্প

প্রিয়বরেষু নির্মাল্যবাবু, মলিন দিনগুলি মলিনতর হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ আসলে অন্যমনস্ক অবস্থায় ছিলেন, রেখো না ভয় মনে নয়, রেখো না আশা মনে। এখনো এখানে-ওখানে সমাজবিপ্লবের আসন্নতা নিয়ে সুযোগ পেলেই বক্তৃতা ফাঁদি, প্রবন্ধ মক্সো করি, কিন্তু সে-সব তো এক ধরনের বুজরুকি। সমাজবিপ্লব মানে আমাদের শ্রেণীর লোকদের সমূল উৎপাটন, আগাগোড়া চেঁছে-পুছে নতুন ক'রে অর্থ-ব্যবস্থার বিন্যাস। বহুদিনের মধ্যেও তা হবার নয়। মানিকবাবু 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় কুমুদকে দিয়েই বোধ হয় বলিয়েছিলেন, যেখানে কোনোক্রমে খেয়ে-প'রেই বেঁচে থাকা যাচ্ছে না, কবিতা লিখতে ইচ্ছে-হওয়াটা তো সেখানে মস্ত অসম্ভবের ব্যাপার। আমরা দু'কান কাটা, তাই এখনো দিব্যি গা এলিয়ে আছি। দেখুন, কী তোফা ব্যবস্থা, যাদের আদৌ কিছু নেই তাদের আরো শুষে-পিষে যাদের অঢেল আছে তাদের আরো অঢেল অর্পণ করার কী মিহিন আয়োজন, অথচ সমস্ত-কিছুই ঘটছে সমাজতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার ভণিতায় ভর ক'রে। সমাজের দরিদ্রতর শ্রেণী প্রতি মুহূর্তে চরম খিন্নতার দিকে আরো-একটু নামছে, চাল-গম-তেল-মাছ-কেরোসিন-নুনের অগ্নিমূল্য, পরিবর্ধমান জরাজীর্ণতা। এরই মধ্যে,আমরা যারা বুকনি ফাঁদি, অথবা যারা ফাঁদি না, মোটামুটি আরামেই টিকে আছি; শখের বিবেকের বালাই যাদের নেই, তারা উপরন্তু বর্ধিষ্ণু সাচ্ছল্যের মুখ দেখছে। এমন অবস্থায় আপনার-আমার-নির্মল চন্দ্রের মতো লোকদের সমাজ-বিপ্লব নিয়ে বাগাড়ম্বর কুরুচিপূর্ণ কাব্যচর্চারই সামিল। আমরা বই প'ড়ে শ্রেণীত্যাগ প্রসঙ্গ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়েছি, কিন্তু তা-ও তো বিশুদ্ধ রসিকতা। শ্রমিককৃষকনিম্নমধ্যবিত্তদের আন্দোলনে আমাদের ভূমিকা শূন্যের কোঠায়।

এমনকি হয়তো আরো-একটু বলা চলে। আমাদের পর্যায়ের কেউ-কেউ বেশি বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দেশে, বিশেষ ক'রে এই পশ্চিমবাংলায়, বামপন্থী আন্দোলনের যে-সর্বনাশ ঘটিয়েছেন মাত্র কয়েক বছর আগে, সাম্প্রতিক ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। সেই ক্ষতির এখনো তো মাশুল গোণা হচ্ছে। অতএব বিনীত হ'তে শেখা ছাড়া আমাদের উপস্থিত অন্য-কোনো ভূমিকা নেই। যদি শ্রমিককৃষকদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে না-পারি, তা হ'লে যেন স'রে গিয়ে একপাশে নিচু হয়ে মিছিলের জন্য পথ ক'রে দিই। যদি মিছিলে যোগ দেওয়ার মতো সাহস না থাকে, তা হ'লে অন্তত যেন মিছিলে মিশে যাওয়া কেন অনুচিত, তা নিয়ে তত্ত্ব না-ফাঁদি। সুনীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন নয় এটা, সাধুতা-অসাধুতার প্রশ্ন। কেউ যেন আমাদের বিবেকের কান ধ'রে সন্নত হ'তে শেখায়, অহংবাদ ভুলতে শেখায়, কী ক'রে নম্রতা বানান করতে হয় তা শেখায়।

শৈশব-কৈশোর-যৌবনের আকাশকুসুমগুলিকে মধ্যবয়সে এভাবে দলিত হ'তে দেখে কারো-কারো হয়তো চিত্তস্থৈর্য স্খলিত হয়ে পড়ে। তারা আত্মগ্লানি ভুলতে চায়, কোনো অভূতপূর্ব মাদকতায় ডুবতে চায়। তাই কি ইদানীং শুঁড়িখানায় এত ভিড়? যে-রাজনৈতিক দাদা রোদে পুড়ে, জলে-ভিজে, দিনের-পর-দিন অর্ধেক বেলা খেয়ে মাঠে-ঘাটে জাহাজের জেটিতে কারখানার কালিমায় একদা আন্দোলন সংগঠনে তদ্গত থাকতেন, যিনি ছিলেন আমাদের আদর্শ, চিন্তার-ভাবনার লক্ষ্যবিন্দু, তাঁকে পর্যন্ত দেখি ধূসর সন্ধ্যায় খালাসিটোলার ভিড়ে একাকার হয়ে যেতে। মলিন দিনগুলি মলিনতর হচ্ছে। এবং ঠিক সে-কারণেই বোধ হয়, স্মৃতিতে প্রহৃত হয়ে, ফিরতে ইচ্ছে করে তিরিশ বছর আগের কলকাতায়, আমার মতো গেঁয়ো মফস্বল থেকে সন্ত-আগত তরুণের কাছে যে কলকাতা প্রতিভাত হয়েছিল তার আশ্চর্য সুষমা নিয়ে। কলকাতা, উনিশশো তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ সাল, দুর্ভিক্ষের-মহামারীর ঋতু সেটা, কিন্তু কলকণ্ঠাসা সেই মহাসর্বনাশের শরীর ভেদ ক'রেও জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার নিটোল অঙ্গীকার ইতস্তত ছড়ানো সে-কলকাতায়। সংগঠন, সংগঠন, ইওরোপে হিটলার পিছু হটছে, নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলার গ্রামে-গঞ্জে কৃষক-সভা মন্ত্রোচ্চারণের মতো তেভাগার বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছে, কলকাতার ট্রামের মজদুর, ব্যারাকপুরের চটকলের কর্মী, হাওড়াকুলটির লোহা-পেটানো শ্রমিক সংঘবদ্ধতার জাদুসূত্র শিখছে, মানিকবাবু সন্ত-সন্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে তাঁর নিরাসক্ত গল্পের মধ্য

দিয়ে আগুনের ফুল্‌কি ছড়াচ্ছেন, সমর সেন দিল্লি থেকে স্বীকারোক্তি পাঠাচ্ছেন দুধ দেয় যে-গয়লা, যে-ধাঙড় সরায় ময়লা তাদের দোস্তিই একমাত্র পরমা গতি, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ভীরুতার মুখে লাথি মেরে লাল ঝাণ্ডা ওঠাবার জন্য পাড়ার ছেলেদের ঠেলছেন, জ্যোতিবাবু কাঁধে একটা হ্যাভারস্যাক ঝুলিয়ে বাংলা-আসাম-বিহারের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়াচ্ছেন ব্যূহগঠনের উদ্দামতায়, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশাবলি মানবার জন্য কী কাতার-কাতার ভিড়, ময়মনসিংহের মহারাজকুমার স্নেহাংশুকান্ত আচার্যচৌধুরী আমাদের সবাইকে চমকিত ক'রে বিষয়আশয় পার্টিকে লিখে দিয়ে জনতার দিকে হাত বাড়িয়ে দাঁড়াচ্ছেন, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের তিন কন্যা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিকে প্রাণচঞ্চল ক'রে তুলছেন, হাজার-হাজার ছেলেমেয়ে আন্দোলনে জড়ো হচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে পল্লীতে-প্রান্তরে, পার্টির নির্দেশ-অনুযায়ী ডেরা বাঁধছে শ্রমিক-ঘাঁটিতে। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়ে, সরকারি-সদাগরি দপ্তরের কেরানিকুল, সাধারণ গৃহস্থবধূ, সবাই আস্তে-আস্তে যেন বুঝতে শিখছে জীবন আর স্বপ্ন দুটো আলাদা ব্যাপার নয়, স্বপ্নকে সফল করতে হ'লে জীবনের জটিলতাকে বিশ্লেষণ করতে হবে, আমার জীবনের সমস্যা তোমার ও অন্যান্য পড়শীর সমস্যার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে, সে-দেখার উপলব্ধির আলোয় বুঝে নিতে হবে যে আমার-তোমার-পড়শীর সমস্যা আসলে একই সমস্যা, সুতরাং জোট বাঁধতে হবে, জীবনকে যদি বৃহত্তর, মহত্তর, সমৃদ্ধতর, সম্পূর্ণতর কোনো সুষমায় নিয়ে যেতে চাই, জোট বাঁধতে হবে, যেদিন জোট বেঁধে পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাঁধ মিলিয়ে তাৎক্ষণিকের দুঃখসুখব্যথাবেদনা ভাগাভাগি ক'রে নিয়ে এগোতে শিখবো, সেদিন থেকে আমাদের স্বপ্ন আমাদের জীবনের সঙ্গে একীভূত হ'তে রাজি হবে; আপাত-রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেরিয়ে আরো-অনেকদূর আমাদের এগোতে হবে; যদি এগোতে পারি, সমাজব্যবস্থার খোলনল্‌চে বদলে যাবে, বদলে যাবো আমরা সবাই, আমি-তুমি-পড়শী, আমরা পৌঁছে যাবো আমাদের সম্মিলিত স্বপ্নের জীবনে। এরই মধ্যে, ঝাঁকে-ঝাঁকে হয়তো খবর আসছে চীন থেকে, লাল ফৌজ অপ্রতিহত এগোচ্ছে নদী-পাহাড় ডিঙিয়ে, চিয়াং কাইশেকের তস্করদল লেজ গুটিয়ে ফরমোজা-মুখো, সাংহাই আমাদের, উত্তেজনায় আমরা থরথর ক'রে কাঁপছি, চীনের স্বপ্নের নীলে আমাদের নীলিমা মিশে যাচ্ছে।

ভাবুন, কী জোরদার আন্দোলন তখন, আবেগের কী উত্তাল জোয়ার।

সপ্তাহের-পর-সপ্তাহ ধ'রে, পেশাদার নাটককে কলা দেখিয়ে, 'নবান্ন'র অভিনয় চলছে, লোক ভেঙে পড়ছে। 'নবান্ন'র পর 'ছেঁড়া তার'। সেই সঙ্গে বটুকদা —জমিদারের ছন্নছাড়া খেয়ালি ছেলে বটুকদা, বেহিশেবী বটুকদা, আজ-পর্যন্ত-আদর্শের-কাছে-বিকিয়ে-থাকা বটুকদা—'নবজীবনের গানে' সুর দিচ্ছেন, 'মধুবংশীর গলি'তে কী মস্ত মজার সন্ধান পেয়েছেন। এদিকে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ, ওদিকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, ঢেউয়ের পরে ঢেউ, আমরা অভিভূত, কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছি, সেই সঙ্গে অথচ মনে প্রত্যয়, আমাদের স্বপ্নের কাছাকাছিই কোথাও যাচ্ছি।

ভাবুন, জর্জ বিশ্বাস-সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে কী ঐশ্বর্য ছিল তখন, কী দার্ঢ্য ছিল। জর্জ বিশ্বাস একটি মোটর সাইকেল চেপে সারা শহরে ঘুরে বেড়াতেন তখন, দুপুরের কোনো-একটা নির্দিষ্ট সময়ে ধর্মতলায় মোটর সাইকেল থেকে নেমে, একটি বিশেষ পান-সিগারেটের দোকান থেকে পান কিনে খেতেন, আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম, কারণ হয়তো আগের দিন সন্ধ্যাতেই কোনো সভায় তাঁর গান শুনেছি, সেই আশ্চর্য কণ্ঠবৈভব, গানের দামাল ঢেউ: রবীন্দ্রনাথের গান, রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়িয়ে গণনাট্যের গান, ঢেউয়ের পর ঢেউ। এবং ক্লান্তিহীনা সুচিত্রা মিত্র, যখন-যে-অবস্থায় আছেন, অনুরোধ-মাত্র যে-কাউকে গান শোনাচ্ছেন, এক অনির্বচনীয় লাবণি ঝ'রে-ঝ'রে পড়ছে। খুব সম্ভব সেটা ১৯৪৮ সাল, ফেব্রুয়ারি মাস, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুবসম্মেলনের শেষ দিনে সন্ধ্যায় ময়দানে শোভাযাত্রার শেষে সভা, সুচিত্রা মিত্র প্রারম্ভসংগীতের জন্য উঠে দাঁড়িয়েছেন, কী কারণে হঠাৎ মাইক্রোফোন বিকল, কিন্তু সুচিত্রা মিত্র বেপরোয়া-অনমনীয়া, একা নিরাভরণ কণ্ঠে গেয়ে চলেছেন 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি', ইন্দ্রধনুর স্তবকের মতো, সেই গানের রেশ ময়দানের আকাশকে সৌভাগ্যবতী ক'রে তুলছে, খোলা আকাশের নিচে, অদূরে চৌরঙ্গীর সদ্য-জ্ব'লে-ওঠা আলোর দীপাবলি, আমরা স্তব্ধ, আমরা মোহ্যমান।

কী আশ্চর্য সময় গেছে তখন, 'মিছিলে দেখেছিলাম একটি মুখ', এই পঙ্‌ক্তির পাশাপাশি হঠাৎ কলকাতার রাস্তায় মিছিলে, একেবারে পুরোভাগে, কাঁধে তেরছা-ক'রে ঝুলোনো কাপড়ের থলি, গীতা মুখোপাধ্যায়, দু'চোখে আগুনের ঝলক, স্লোগান দিতে-দিতে এগোচ্ছেন, স্লোগানের ধ্বনিতরঙ্গের উচ্চাবচতার

সঙ্গে ডান হাত বৃত্তায়ত ভঙ্গিতে উপরে উঠছে, নামছে, হাতের সরু রুলি কজির অনুশাসন দীর্ণ ক'রে প্রতিবার বেরিয়ে আসতে চাইছে, মোহিত হয়ে তাকিয়ে আছেন আপনি। একটু আগেই হয়তো গীতা মুখোপাধ্যায়কে কমলালয়ে শিষ্ট ভঙ্গিতে ব'সে চা খেতে দেখেছেন, নিহিত এত আগুনের সামান্যতম আভাসও অথচ তখন আপনি পাননি।

মহম্মদ ইসমাইলের চুলগুলি এখন সম্পূর্ণ শাদা হয়ে গেছে, উনিশশো চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ সালে কিন্তু অনেক কালোর ঝিলিক ছিল, তাঁকে এসপ্লানেডের গুমটি থেকে পার্কসার্কাসের ঘাঁটি পর্যন্ত অবিশ্রান্ত ঘুরতে দেখা যেত, লড়াকু ট্রামকর্মীদের জোট আরো যাতে দৃঢ় করা যায়। এক সকালের কথা মনে পড়ছে, মে মাস, হাওয়ায় প্রথম গ্রীষ্মের ঝলক, আগের দিন জর্মানির পতন ঘটেছে, বার্লিন সোভিয়েট সেনাদলের কুক্ষিগত, হিটলার বিষপানে আত্মহত্যা করেছে, সকালের রোদ্দুরে রুপুলি ট্রামগুলি উদ্ভাসিত, লাল ঝাণ্ডায়-ঝাণ্ডায় প্রতি ট্রামের অবয়ব একাকার, এমনি-একটি ট্রামে ড্রাইভারের পাশে দাঁড়িয়ে পরিচ্ছন্ন হিন্দুস্থানী জবানে ইসমাইল বক্তৃতা দিচ্ছেন, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, কমরেড স্টালিন জিন্দাবাদ। ঠিক যেখানে ট্রামটি দাঁড়িয়েছিল, কয়েক মাস বাদে ঠিক সেখানেই গুলি চলে, রশীদ আলি দিবস, সারা দুপুরবিকেলসন্ধ্যারাত্রি ছাত্রমজুরকরণিকের সম্মিলিত শক্তির প্রহরা, হাওয়াতে কীসের প্রতিশ্রুতি, বিপ্লব অত্যাসন্ন, বিপ্লব ঘটছে, এই আমাদের নিয়েই ঘটছে, আমরাই, ঠিক এই মুহূর্তে, ইতিহাস রচনা করছি, দয়া ক'রে অহিংস নেতারা তাঁদের শান্তির ললিত-বাণী পকেটে পুরে ফিরে যান।

সেই আমার প্রথম পরিচয়ের কলকাতা, প্রথম প্রেমের কলকাতা, ত্যাগের অঞ্জনমাখা কলকাতা, আদর্শের-গহনতায়-ডুবে-থাকা কলকাতা, বিপ্লবকে-একাই-দু'হাত-দিয়ে-তুলে-নিয়ে-আসতে সক্ষম কলকাতা। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীর যোদ্ধারা মুক্তি পেলেন, গণেশ ঘোষ-অম্বিকা চক্রবর্তী-অনন্ত সিং, কমিউনিস্ট পার্টিতে নিয়োজিত করেছেন নিজেদের তাঁরা, আমরা জেলখানার দ্বারপ্রান্ত থেকে প্রত্যুদ্গমন ক'রে নিয়ে এলাম তাঁদের। বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে, কফিহাউসে, এ-কলেজে ও-কলেজে উচ্ছ্বাসের জোয়ার। চৌরঙ্গী পাড়ার কোন্ সিনেমাঘরে কী-এক ঈষৎ সোভিয়েট-বিরোধী ছবি এসেছে, আমরা দঙ্গল বেঁধে প্রতিবাদ জানাতে গেছি, মধ্য কলকাতায় যানবাহন স্তব্ধ হয়ে গেছে। কলকাতা যেন কখনোই দ'মে

থাকবার নয়, ব্যাহত হবার নয়। মাঝে-মাঝে এই রূপময়ী,স্বপ্নময়ী কলকাতা থেকে দূরে চ'লে গেছি, কিন্তু কিছুতে-কেন-যে-মন লাগে না, ছুটে এসে আবার কলকাতায় প্রবেশ করেছি, স্থিত হয়ে বসবাস করেছি, ছিটকে বেরিয়ে গেছি আবার কবে একদিন, ফের নিশ্চিন্ত অভ্যাসে ফিরে এসেছি, কলকাতা পরিচিত সখার মতো পুনরালিঙ্গন করেছে। বছর যতই গড়িয়ে গেছে, আমাদের ভাবনায় যুক্তির দায়ভাগ কল্পনাকে একটু-একটু ক'রে কোণঠাসা করেছে, কিন্তু স্বপ্ন তা হ'লেও নিটোলই থেকেছে। আন্দোলন ক্রমশ ব্যাপ্তি পেগেছে, শাখাপ্রশাখায় দেশের অভ্যন্তরে অনেক দূর নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে, কেউ-কেউ, প্রথম দিকে যাঁরা তদ্গতভাবে যুক্ত ছিলেন আন্দোলনের সঙ্গে, তাঁরা স্তিমিত হয়ে গেছেন. কেউ-কেউ হারিয়ে গেছেন-মিলিয়ে গেছেন, কিন্তু অঙ্কে তা হ'লেও ভুল হবার নয়, বিশ্বাসে তা' হলেও ঢল নামবার নয়, নতুন মুখ এসেছে, নতুন ক'রে গড়া হয়েছে স্বপ্নের পরিখা, অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যেতে-যেতে আন্দোলন এক দুর্মর রূপ পেয়েছে, ইতিহাস আমাদের দিকে, একটু শুধু ধৈর্য শেখো, অবৈকল্য শেখো। এত ত্যাগ ব্যর্থ হবার নয়, পুঞ্জীভূত নিষ্ঠার প্রতিফল ফলবেই, ইতিহাসের নিয়ম কখনো উটকো খাতে ব'য়ে যেতে পারে না।

মাত্র কয়েক বছর আগে পর্যন্তও, মনে-মনে, কিংবা দৃঢ় প্রকাশ্য উচ্চারণে ঘুরে-ফিরে, এই আশা নিয়ে সময় ক্ষেপণ করা সম্ভব ছিল। কলকাতা, পশ্চিম বাংলা, চাই কি একদিন সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ কল্লোলিনী-তিলোত্তমা হবে, আমরা কলকাতায় যারা অধিষ্ঠিত তারা, এবং পশ্চিম বাংলার খেটে-খাওয়া মজুর-কৃষক-করণিক, আমরা পথ দেখাচ্ছি, আমরাই নিয়ামক, অন্য সবাই, আজ হোক-দু'দিন বাদে হোক, আমাদের অনুসরণ করবে, সমস্বরে সবাই নবজীবনের গান উচ্চারণ করবে, মরুবিজয়ের কেতন দুর্দাম উৎসাহে আকাশে উড়বে। এখানে-ওখানে ব্যক্তিগত স্খলন-পতন অবশ্যম্ভাবী, কারো সাহস অন্য-অনেকের সাহসের চেয়ে কম কিংবা বেশি, কারো কর্তব্যবোধ অন্যান্য-অনেকের কর্তব্যবোধের তুলনায় তীক্ষ্ণ অথবা ভোঁতা, কারো আন্তরিকতা অন্য কারো-কারো আন্তরিকতা থেকে উন্নততর অথবা নিকৃষ্টতর, কিন্তু এ-সমস্তই তুচ্ছ, যা মূলের ব্যাপার তা আন্দোলনের সামগ্রিক ঝোঁক। যদি প্রধান লক্ষ্য ঠিক থাকে, আনুশাসনিক নিগড়ে বিচ্যুতি না-আসে, সংগঠন সব-মিলিয়ে নিটোল প্রবাহে এগোয়, তা হ'লে ইতিহাস আমাদের প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। কলকাতা আপাতবিচারে

মলিন থেকে মলিনতর হচ্ছে, পশ্চিম বাংলা নানা সমস্যায় জর্জরিত, লড়াই ক'রে-ক'রে জীবিকানির্বাহের দৈনন্দিন পীড়নে দীর্ণ হ'তে-হ'তে জনসাধারণ বিস্ফারিত-জিহ্বা, ইতস্তত একজন-দু'জনের বিভ্রান্তিবোধ, কিন্তু বিপ্লবের বীজাণু এরই মধ্যে জড়ো হয়ে আছে, কিছুই ফেলা যাবে না, এই অপাতবিভ্রান্তি থেকেই, হঠাৎ দমকা হাওয়ায়, মুক্তি।

যখন বক্তৃতা দিতে যাই, একে-ওকে-তাকে কূটতর্কে পরাভূত করতে বদ্ধপরিকর হই, এধরনের কথাবার্তা তখন অবশ্যই বলতে হয়, এখনো বলতে হয়। কিন্তু তেমন-যেন ভরসা পাই না আর, মনে হয় যেন নিজের সঙ্গেই প্রতারণা করছি, মনকে স্রেফ চোখ ঠারছি; কারণ মধ্যবয়সী আমাদের আর-কোনো করণীয় নেই, এতদিনের আকাশকুসুমচয়ন ব্যর্থ, ব্যর্থ, এই কবুলতি করতে হ'লে এই আসন্নসায়াহ্নে কোথায় এখন আশ্রয় ভিক্ষা করতে যাবো? আমাদের বড়ো দেরি হয়ে গেছে, সময় শেষ, তাই পুরোনো খুঁটিটাকেই শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধরি, অথচ ভিতর থেকে যেন আর তেমন উৎসাহের সমর্থন নেই, বিশ্বাসের সম্মতি নেই, আত্মস্থতাবোধ কে যেন দুমড়ে-মুচড়ে চ'লে গেছে। এবং যেহেতু আমরা ধর্মচ্যুত, অতএব আমাদের দিয়ে আর-কিছু হবার নয়; যাদের এখনো ইতিহাসে আস্থা আছে, আসলে ইতিহাসে আস্থা রাখা ছাড়া যাদের গতি নেই, সেই শ্রমজীবীশ্রেণী, তাদের হাতে দায়িত্ব-নির্ভর অর্পণ ক'রে আমাদের বিলীন হয়ে যাওয়া উচিত, অন্তত ইতিহাসের কাছে একদা-সমর্পিত এই সামান্য অঙ্গীকারটুকু যেন আমরা এখন পালন করি, আমাদের দিয়ে যেহেতু আর-কিছু হবার নয়।

এই উপলব্ধি, আমার কাছে অন্তত, গেলো কয়েক বছরের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। নিরক্ষর, দরিদ্র, শতাব্দীর শোষণে নির্জীব জনতার দেশ: রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার করতে হ'লে অন্যতর, উচ্চতর শ্রেণী থেকে বিবেকসম্পন্ন কেউ-কেউকে এগিয়ে এসে আন্দোলন শুরু করতেই হয়, এটাও ইতিহাসেরই বিধান, সে-বিধানানুযায়ী জাদু ঘটেছে সোভিয়েট ইউনিয়নে, চীনে, ভিয়েৎনামে, কিউবায়। সুতরাং মধ্যবিত্তপর্যায়ভুক্তদের নেতৃত্বে আমাদের নিজেদের দেশে আন্দোলন কেন প্রতিহত হবে চট ক'রে তার উত্তর খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। হয়তো, যে-ধৈর্যের অধ্যবসায় প্রয়োজন, আমাদের তা পরাহত: ধৈর্য, তিতিক্ষা, নানা অবস্থায় অবিচল থাকা, অহমিকাকে ক্ষুরধার তরবারি দিয়ে শতচ্ছিন্ন ক'রে বিসর্জন দেওয়া, ধোঁকার টাটিতে ম'জে না-যাওয়া, কিংবদন্তীর সংক্ষিপ্ত

প্রণালীর মোহিনীমায়ায় আচ্ছন্ন না-হওয়া, উচ্চারিত ত্রুটিগুলি আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে যে পরিমাণে বর্তেছে, তা হয়তো প্রলয়ংকর। তাই এ-দেশের গরিবদের, বিত্তহীনদের ঠেকে শিখতে হবে, আন্দোলনের প্রকৃতি-পরিভাষা খোল-নল্‌চে বদলে নিতে হবে, সংগঠনের চেহারা ফের ঢেলে সাজতে হবে, তিরিশবছরের মধ্যবিত্তামদির আন্দোলনের পাপক্ষালণ ক'রে ফের নতুন ক'রে সব-কিছু গড়তে হবে। সে-গড়ার কাহিনীতে আমরা উহ্য।

একবার তাকিয়ে দেখুন চারদিকে, এত জল ঘেঁটে, এত পথ হেঁটে কোথায় আমরা পৌঁছেছি, আশাহীন এ-কোন্ ঊষর-বন্ধ্যা ভূমিতে। দু'তিন দশক আগে যে-উৎসাহের উত্তরাধিকার আমাদের গর্ব ছিল, তা এখন নির্জীব খোলস হয়ে প'ড়ে আছে। যদি প্রশ্ন করেন প্রথম যৌবন থেকে এই পরিণত মধ্যবয়স পর্যন্ত সময়ক্ষেপণের কী ফলশ্রুতি, এক বিশাল-নিশ্ছিদ্র শূন্যতা ছাড়া আমাদের অন্য-কিছু দাবি করবার থাকবে না। একদা আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম, কিন্তু প্রথম বয়সে যে-কেউই তো স্বপ্ন দেখে; আমাদের স্বপ্নে কোনো পাপ ছিল না, খাদ ছিল না, কিন্তু প্রথম বয়সে যে-কারো স্বপ্নেই সাধারণত পাপহীনতা ব্যাপ্তি অধিকার ক'রে থাকে। আমাদের পুত্রপুত্রীভ্রাতুষ্পুত্রভ্রাতুষ্পুত্রীদের জিজ্ঞেস করুন। আমাদের স্বপ্নের সঙ্গে তাদের স্বপ্নের কোনো সাযুজ্য নেই, তাদের ধ্যানধারণা গ্রহান্তরের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ, শ্রেণীচ্যুতির প্রসঙ্গ পর্যন্ত হয়তো তাদের কাছে উপহাস্য ব'লে মনে হয়। আমাদের উত্তরাধিকারের সংক্ষিপ্তসার আপাতত এই সংকীর্ণ বিন্দুতে স্থিত হয়েছে।

কনিষ্ঠদের সঙ্গে কথা বলে দেখুন, সমাজবিপ্লব নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই, নিজেদের নিয়ে নিমগ্ন তারা, পৃথিবী ছোটো হয়ে এসেছে, পৃথিবীর সংজ্ঞা-বিশেষণ-বিশেষ্য-ব্যাকরণপ্রয়োগ আমূল পরিবর্তিত। মিছিলে বেরিয়ে আপনি-আমি সময় নষ্ট করেছি, কনিষ্ঠেরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েছে। মিছিল নয়, তারা ভিড় করছে হিন্দি সিনেমার বাইরে। সমাজচেতনা জড়িয়ে আমাদের আকাশকুসুমরোপণ বিপ্লবকে আদৌ ত্বরান্বিত করেনি, সুতরাং আর কেন, কনিষ্ঠেরা, হয়তো ভেবেচিন্তেই, নিজেদের স্বপ্নভাবনাআশাআকাঙ্ক্ষাব্যথা-বিহ্বলতার প্রতিভাস খুঁজছে শর্মিলা ঠাকুর-রাজেশ খান্নার নর্তনকুর্দনে। আপনার-আমার পুত্রকন্যাভ্রাতুষ্পুত্রভ্রাতুষ্পুত্রীরা আমাদের দেখে বুঝে নিয়েছে, আদর্শ ফাঁকা বুলি, কয়েক দশকের টানাপোড়েনের উপান্তে আদর্শ ও আদর্শহীনতা

এক হয়ে যায়, তার চেয়ে হিন্দি সিনেমা শ্রেয়, আদর্শের প্রতারক দুর্ভাগ নেই তাতে। সেখানে, দু'ঘণ্টা-তিনঘণ্টার জন্য, যদি রঙিন স্বপ্নের দেশে, দায়িত্বহীন, ভেসে বেড়াতে চাও, এসো; যদি প্রাত্যহিকতার বুক-ঠেলে-উথলে-ওঠা নিরাশা কয়েক প্রহরের জন্য ভুলতে চাও, এসো; যদি গোষ্ঠীকে ভুলে নিজের একাকিত্বে উচ্ছৃঙ্খল হ'তে চাও, এসো। তাকিয়ে দেখুন, তিরিশ বছর আমরা শ্লোগানে গলা ফাটিয়েছি. স্তোকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করেছি নিজেদের, যারা আমাদের উপর আস্থা আরোপ করেছে তাদের; আর এখন, আমাদের সন্তান-সন্ততিরা কীরকম স্বতঃসিদ্ধতার সঙ্গে বিপ্লবের প্রতীপ হাওয়ায় ভেসে যেতে উদ্‌গ্রীব: তাকিয়ে দেখুন। যা হারিয়ে যাওয়ার তা আগলে ব'সে আর কতকাল প্রতীক্ষায় রইবেন, অন্তত আমাদের সন্তানসন্ততিরা তাতে আর রাজি নয়, কী গভীর উপেক্ষায়, কত ত্বরিতগতিতে দেখুন তারা অন্যচারী।

আমাদের অতএব, মেনে নেওয়া ভালো, অবসিতভূমিকা, আমাদের প্রবেশ-প্রস্থান নিয়ে কাউকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। গাছেরটাও পাড়বো-তলারটাও কুড়োবো তা হয় না, হ'তে পারে না। স্বপ্নে বিশ্বাস রেখেছি, অথচ প্রতীক্ষার ব্রত কখনো শিখিনি, তিতিক্ষায় নিজেদের শক্ত করিনি, প্রতিনিয়ত মনে হয়েছে লাঠির সঙ্গে লটকে নিয়ে এই মুহূর্তেই বুঝি আমাদের সুললিত স্বপ্নটিকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনা যায়। যায় না। ইতিহাসের কোনো গোঁজামিল সম্ভব নয়। এই সত্যটা শিখতে এই এতগুলি দিন লেগে গেলো বলেই আমাদের উপস্থিত আশাভঙ্গ, এবং সন্তানসন্ততিরা আমাদের আয়ত্তের বাইরে। এক-জায়গায় দাঁড়িয়ে পা তুলছি, পা নামাচ্ছি; অভ্যাস, তাই এখনো মিছিলে যাচ্ছি, প্রবন্ধ মক্সো করছি, কিন্তু ঘুরে-ফিরে একই ধুয়ো, নিয়তি কেন বাধ্যতে। যাঁদের গর্বে একদা আমরা গরীয়ান হয়ে উঠতাম, এমনকি তাঁদের উদাহরণেও আর সঞ্জীবনীর সন্ধান নেই, রোগশোকতিক্ততায় জর্জ বিশ্বাস, নিঃশেষিত-ম্রিয়মাণ যেন, ধর্মতলায় মোটরসাইকেল থেকে নেমে ফুটপাতের সেই দোকানে তাঁকে আর কোনোদিন পান কিনতে দেখা যাবে না। সুচিত্রা মিত্রকে এখনো দেখা যায়, সভায়-সমিতিতে, কিন্তু দোহাই, আমার উক্তিতে অপরাধ নেবেন না তিনি, যে-কারো সভায়-সমিতিতে, হয়তো বা সমাজবিপ্লবের সম্ভাবনাকে গলা টিপে রোধ করবার জন্য আয়োজিত যে-সভা, তাতেও, কিন্তু এই যান্ত্রিক গতানুগতিকতায়

কোনো বিদ্যুৎই আর চমক দিয়ে যায় না, আমরা যথাসর্বস্ব স্মৃতি নিয়ে এককোণে মুখ থুবড়ে প'ড়ে থাকি।

(আজ থেকে তিন দশক আগে, ভয়চকিত মফস্বলের ছেলে, কলকাতায় এসেছিলাম, একই সঙ্গে কলকাতার, এবং সমাজবিপ্লবের স্বপ্ন দেখার, প্রেমে পড়েছিলাম। এতদিন বাদে সন্দেহ হচ্ছে, না, ঠিক প্রেমশেষের ঋতু এটা নয়, কিন্তু আশাশেষের ঋতু। কলকাতা কোনোদিনই আর কল্লোলিনী-তিলোত্তমা হবে না; সমাজের কাঠামো নিশ্চয়ই অচিরভবিষ্যতে বদলাবে, ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম মেনে নিয়েই বদলাবে; কিন্তু আমাদের কল্পিত বিভঙ্গে তা বদলাবে না, সেই ক্রান্তির মুহূর্তে আমাদের দিকে কেউ তাকিয়েও দেখবে না, আমরা ইতিহাসের উচ্ছিষ্ট।) এক বন্ধু সেই তিরিশ বছর আগে আমাকে কলকাতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, আমরা দু'জন উথাল-পাতাল ক'রে এক-সময় কলকাতাকে খুঁজে ফিরেছি, তার অলিতে-গলিতে নাড়িতে-নক্ষত্রে জীবনের স্পন্দন আবিষ্কার ক'রে বিস্ময়ে বিলীন হয়ে এসেছি। আমার সেই কলকাতা-চেনানো বন্ধু, সুরঞ্জন সরকার, আজ হারিয়ে গেছেন কোথায়, বর্ষার বিষণ্ন সন্ধ্যায় বহুপরিচিত মুখও যেমন হারিয়ে যায়, তেমনি। লোকপ্রবাদ, অন্ধকার যখন আরো গভীর হয়, তখন শহরের কোনো নিভৃততর শুঁড়িখানায় এখনো সুরঞ্জন সরকারকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। নির্মাল্যবাবু, ভয়ে সিটিয়ে আসি, তবে কি, এই এতগুলি বছরের সেতু পেরিয়ে, সবার উপরে শুঁড়িখানা সত্য, তার উপরে নেই?

শরতে আজ কোন্ অতিথি

বাইরে দুর্ভিক্ষ, কিন্তু আকাশে শাদা মেঘ জড়ো হয়, মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে, প্রতিবারের মতোই, আকাশের রং কী আশ্চর্য নীল, সুতনুকার উজ্জ্বল দাঁতের মতো ঝলোমলো রোদ্দুর, হাওয়াতে ফের স্নিগ্ধ-মৃদু স্বাদ। বাইরে দুর্ভিক্ষ, কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজব্যবস্থা তার প্রকৃতি বদলাতে গররাজি, তাই প্রথামতো সর্বজনীন নাগরিক উচ্ছলতা, দোকানে যথাসম্ভব কেনাকাটার ভিড়। ভাবের ঘরে চুরি ক'রে ঢাকঢোল কাঁসরঘণ্টা-পেটানো উৎসবলীলা। বাইরে দুর্ভিক্ষ, হাজারে-হাজারে নিরন্ন মানুষ মারা যাচ্ছে, পুরুষনারীশিশু, আমাদেরই স্বজন, বাংলাভাষী, বুভুক্ষার কাৎরানি, না-খেতে-পাওয়া-ফুলে-ওঠা পেট, পাঁজরগুলো প্রত্যেকটি-আলাদা-ক'রে-গোণা যায়, গহ্বরে-ঢুকে-যাওয়া-মৃত্যুভয়বিহ্বল চোখ। আমাদেরই দেশবাসী। না-খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে, বাইরে দুর্ভিক্ষ, তবু মধ্যবিত্ত ব্যাকরণের হেরফের হয় না, শারদোৎসব। ১৯৪৩ সালের স্মৃতি একটু-একটু মনে ছায়া ফেলে, কিন্তু ভাবালুতা ভালো নয়, যে বাঁচে সে-ই বাঁচে, মধ্যবিত্ত বিবেককে পিঠ চাপড়ে ঘুম পাড়াও, শারদোৎসব।

দুর্ভিক্ষ, আমাদের এদিককার বাংলার প্রায় সব-ক'টি জেলাতেই ভূমিহীন কৃষক তথা ছোটো চাষী, খাবার জোটাতে না-পেরে সপরিবার মারা যাচ্ছে, আশেপাশের নানা রাজ্যে—ত্রিপুরা-ওড়িশা-আসামে—প্রায় তথৈবচ অবস্থা। রাষ্ট্রের প্রসাদে একটা-দুটো লঙ্গরখানা খোলা হচ্ছে কি হচ্ছে না, একটু-আধটু খয়রাতি বিতরণ হচ্ছে কি হচ্ছে না, এই দুর্বৎসরে এমনিতেই নাকি সরকারের সামর্থ্য কম, তাছাড়া প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা তো অব্যাহত, তার উপর যে-রাজনৈতিক দল আমাদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক, সেই দলের আভ্যন্তরীণ কলহের

ছায়াও ত্রাণকার্যের ব্যবস্থাপনায় পড়ছে : রাজনীতির মূল উৎকণ্ঠা স্ব-স্ব শ্রেণীর আখের গুছোনো সুচারু করা নিয়ে ; রাজনীতি যাঁদের কাছে গোষ্ঠীচর্চা, তাঁরা ত্রাণের টাকাটাও নিজেদের কোলের দিকে টানবার চেষ্টা করবেন, তাতে বিস্ময়-বোধের স্থান নেই।

রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করারই আসলে কোনো সার্থকতা নেই। সরকার সংবেদনশীল হ'লে দুর্ভিক্ষ অন্তত এ-বছর সংঘটিত হতো না। এমন নয় যে দেশে শস্যকণা নেই, এমন নয় যে দেশে ধানচালগমযবভুট্টার হঠাৎ প্রকট অনুৎপাদন হয়েছে, তাই সংকট, তাই খাদ্যাভাব, তাই অনাহারে মৃত্যু। গন্ধমদির আমন ধান্যে সারা গ্রামাঞ্চল ছেয়ে গিয়েছিল গেল পৌষ-মাঘ মাসে, সরকারি সূত্রে তা স্বীকারও করা হয়েছিল। ফসল হয়েছে প্রচুর, কিন্তু যারা ফসল ফলায়, সেই দিনমজুর অথবা ছোটো চাষী, তাদের উপার্জনে কোনো প্রাচুর্য আসেনি। দিনমজুর জন খাটে, জন খেটে দিনের শেষে দু'টাকা-আড়াইটাকা তার উপার্জন। কিন্তু দিনমজুর বছর ভ'রে জন খাটতে পারে না, ধান রোঁয়া থেকে পাকা ধান ঘরে তোলার অন্তর্বর্তী দীর্ঘ সময় জুড়ে তার প্রায়ই হাতে কাজ থাকে না। দু-একটি দিন শুধু জমি নিংড়োনোর ব্যাপারে হয়তো ডাক পড়ে : সব-মিলিয়ে বছরে প্রায় চার-পাঁচ মাস তাকে তাই ব'সে থাকতে হয়, এই সময়টা এটা-ওটা-সেটা তুচ্ছ আয়ে বিক্ষিপ্ত উঞ্ছবৃত্তি। ছোটো চাষী-ভাগচাষীর পক্ষেও নিজেদের স্বল্পায়তন জমিতে পর্যাপ্ত উপার্জনের ব্যবস্থা সম্ভব নয়। তাদেরও তাই মাঝে-মাঝে জন খাটতে হয়, তাদেরও প্রায়-একই সমস্যা। পৌষ-মাঘ মাসে, এই বাংলা দেশেই, উজ্জ্বল ফসল ফলেছিল, কিন্তু সে-ফসলের বৃহদংশে মজুরচাষী-ছোটোচাষী-ভাগচাষীর কোনো অধিকার নেই। সে-ফসল মালিকের-জোতদারের-জমিদারের-মহাজনের। সদাশয় সরকার, বছর-বছর মালিকের-মহাজনের আদেশ শিরোধার্য ক'রে ফসলের দাম বাড়িয়ে-বাড়িয়ে যান, মালিক-মহাজনকে শস্তায় সেচের জল বিতরণ করেন, সারের ঢালাও ব্যবস্থা ক'রে দেন, ব্যাংক থেকে লঘু হারে দাদন পাওয়ার আয়োজনও সদাসম্পূর্ণ। মজুরচাষীর দিনমজুরি বাড়ে না, ভাগচাষীর ভাগের পরিমাণ বাড়ে না, ছোটোচাষীর উদ্বৃত্ত উর্ধ্বগতি হয় না। ফসলের দাম বাড়লেও তাদের লাভ নেই, বরঞ্চ ক্ষতি। তারা গ্রামাঞ্চলের সমগ্র জনসংখ্যার অন্তত নব্বুই শতাংশ। অথচ হ'লে কী হবে, তাদের সংগঠন নেই, তাদের শক্তি নেই, মাঝে-মধ্যে যা-ও তারা মালিকের-মহাজনের অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে

দাঁড়াতে শিখেছিল, এখন পুনরায় নিস্তেজ-নির্বাপিত, সুতরাং তাদের হৃদয়ের ভাষা দিয়ে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারিত হবার নয়। সে-নীতির নিয়ামক মালিক-মহাজন-সদাগরশ্রেণী। মালিক-মহাজনকে শস্তাদরে যত সার-সেচের জল-বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়, তত তাদের সম্পদ বাড়ে; ধ'রে-রাখা ফসলের দাম যত বাড়ানো হয়, তাতেও তাদের সম্পদ সমান বাড়ে; ব্যাংক থেকে সুলভ দাদনহেতুও মালিক-মহাজনের সম্পদ বেড়ে-বেড়ে চলে; ধনবিজ্ঞানের অমোঘ প্রক্রিয়া ততই সুচারুরূপে কাজ ক'রে চলে। মালিক-মহাজনের সম্পদ যত বাড়ে, ফসল ধ'রে রাখবার সামর্থ্য তাদের তত বর্ধিষ্ণু; ফসল যত বেশি ধ'রে রাখা হয়, বাজারে যোগান তত কমে; যোগান যত কমে, শস্যকণার দাম তত আরো বাড়ে; শস্যমূল্য এভাবে যত উপরে চড়ে, মালিক-মহাজনের সামর্থ্য ফের তত বৃদ্ধি পায়, তার মানে ফসল আরো-বেশি ক'রে তারা তখন ধ'রে রাখতে পারে, এবং বাজারে যত শস্যস্বল্পতা, মূল্য তত আরো ঊর্ধ্বগতি। এই মূল্য-বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা সমাজের দরিদ্রতর শ্রেণীর নেই, তাদের আয় এক-জায়গায় দাঁড়িয়ে। দুর্ভিক্ষ, গোলায় ফসল আছে, কিন্তু গরিবদের সে-ফসল কিনে খাওয়ার ক্ষমতা নেই, অতএব দুর্ভিক্ষ। দিনমজুরের শস্য-কেনার সামর্থ্য নেই, তার আহার ক'মে-ক'মে আসে, তার শরীর দুর্বলতর হয়, শরীর যত নির্জীব হয়, তার কাজ করার ক্ষমতা তত হ্রাস পায়, তার উপার্জন তত কমে। উপার্জন যত কমে, আহার্যের পরিমাণ সঙ্গে-সঙ্গে আরো তত কমে, সুতরাং তার আয় আরো সংকুচিত হয়, তার খাদ্যের পরিমাণ ফের তাই আরো কমে। এমনি ক'রে একদিন এমন অবস্থায় পৌঁছোনো যখন কঙ্কালগত শরীর নিয়ে সে মুখ থুবড়ে প'ড়ে থাকে, জন-খাটার সামর্থ্য তার সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। ইতিমধ্যে ঘটি-বাটি পেটের জ্বালায় বিক্রি হয়ে যায়, ছোটো চাষীর আধ ছটাক ভূখণ্ডও মহাজনের কাছে সমর্পিত, টিনের চালাটিও হাতবদল হয়। আর-কিছু উদ্বৃত্ত নেই, অবশিষ্ট নেই, এখন থেকে তাই বুনোওল-বুনোকচু খুঁজে-ফেরার পালা। কিন্তু প্রকৃতি কৃপণ, অখাদ্য-কুখাদ্যের যোগানও আস্তে-আস্তে ফুরিয়ে যায়। যখন একেবারেই যায়, মৃত্যুর জন্য তখন প্রহর গোণা। যেমন এখন। এই মুহূর্তে, এই বাংলার প্রায় প্রতিটি জেলায়, হাজার-হাজার গরিব মারা যাচ্ছে, যে-গরিবরা নাকি আমাদের অধিকাংশ দেশবাসী। শারদোৎসব। দুর্ভিক্ষ।

সরকারকে দুয়ো দেওয়া পণ্ডশ্রম। সরকার তার শ্রেণীচরিত্রে অবিচল

আছেন। মালিক-মহাজনদের সরকার, ভোটের মহলায় সুবিধে হয় ব'লে ঋতুতে-অঋতুতে সমাজতন্ত্রের কথা বলা প্রয়োজন, তাই বলা হয়, কিন্তু মালিক-মহাজনদের সরকারের ভুলে ভুল হবার নয়, রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পাওয়া মানেই হলো স্ব-স্ব শ্রেণীভুক্তদের সুবিধে ক'রে দেওয়া, সরকার তাই করছেন, মালিক-মহাজনদের প্রাচুর্যের উদার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছেন, মালিক-মহাজনরা ফুলছেন, ফসলের দাম বাড়ছে, তাঁরা আরো সম্পদে উপচে পড়ছেন, তাতে যদি গরিবরা মারা পড়ে তো কী করা যায়, অর্থনীতির বিধান-প্রকরণ বড়ো অকরুণ। তাছাড়া, মস্ত ভরসার কথা, গরিবগুলি তো দিব্যি ভদ্রলোকের মতো মারা যাচ্ছে, কোনো প্রতিবাদ করছে না, খাদ্যের গুদোম লুঠ হচ্ছে না, মন্ত্রীদের শীততাপনিয়ন্ত্রিত গাড়ি থেকে টেনে রাস্তায় নামিয়ে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করছে না, চোখে-ঠোঁটে কারোরই তো তেমন অসুবিধা লক্ষ্য হচ্ছে না; শারদোৎসবে যতি পড়েনি, সুতরাং ক্ষতি কী, এমনি ক'রেই যায় যদি দিন যাক না।

কাকে দোষ দেবেন, আপনার অভিশাপ কার আকাশকে বিবিক্ত-বিষাক্ত ক'রে আনবে? ক্ষেতমজুর, স্বল্পবিত্ত চাষী, ভাগচাষী, জেলে-বায়েন-মুচি-নমঃশূদ্র-মাঝি-জোলা নির্বিবাদ ভালোমানুষের মতো মারা যাচ্ছে, কিন্তু টুঁ প্রতিবাদটি পর্যন্ত উচ্চারিত হচ্ছে না, আন্দোলন মৃত, অগণিত দুর্ধর্ষ বামপন্থী অধ্যায়ের স্মৃতিলাঞ্ছিত এই বাংলাদেশ চুপচাপ দাঁড়িয়ে মৃতের-মুমূর্ষুর মিছিল দেখছে, কোনো গুদোম লুঠ হচ্ছে না, সংগঠন স্তব্ধ, রাগেহুংকারেপ্রত্যয়ে রাজপথের রাস্তা কেঁপে-কেঁপে উঠছে না। মন্ত্রীদের পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে না, ট্রামবাসট্রেন চমৎকার চলছে, কোথাও কোনো যতিপতন নেই, অথচ দুর্ভিক্ষ, প্রতিদিন না-খেতে পেয়ে শ'য়ে-শ'য়ে লোক মারা যাচ্ছে, বুভুক্ষুদের শীর্ণ চিৎকারে পাড়ার ক্ষীণ গলি রণিত হচ্ছে, ১৯৪৩ সালের স্মৃতি একটু-একটু ফের আঁকিবুকি দাগ কাটছে, কিন্তু আন্দোলন মৃত, তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছরের বিরাটবিশাল ঐতিহ্য উপহাসে পরিণত, বামপন্থী কর্মীদের গ্রামাঞ্চলে প্রবিষ্ট হয়ে ত্রাণকার্যে ব্রতী হবার মতো মানসিক সাহস পর্যন্ত নেই, সরকারের মুখাপেক্ষী না-হয়ে সেই ১৯৪৩ সালে গ্রামে-গঞ্জে-শহরে বুভুক্ষুমুমূর্ষুদের পাশে দাঁড়িয়ে বামপন্থী দলগুলির তদ্গত তর্পণের স্মৃতি এখন শুধু নিরেট ব্যঙ্গ, মৃত আন্দোলন, গ্রামে-গঞ্জে-রেলের প্ল্যাটফর্মে মৃতদের ইতস্তত ছড়ানো যে-স্তূপ, তার চেয়েও মৃততর আন্দোলন।

কী ক'রে আন্দোলন এই অন্ধকারে অবতীর্ণ হলো, তা নিয়ে নিশ্চয়ই

পর্যালোচনা-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এবং এই বিশ্লেষণ যথাসম্ভব বস্তুনিষ্ঠ হ'তে হবে, করুণাকে দূরে সরিয়ে রেখে তবে আলোচনা শুরু করতে হবে। মানছি, বহুশত ছেলেমেয়েকে বীভৎস অত্যাচারের শিকার হ'তে হয়েছে, আরো-বহুশত ছেলে-মেয়েকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, ঠিক এই মুহূর্তেও পঁচিশ-তিরিশ হাজার ছেলেমেয়ে আদর্শে তন্নিষ্ঠ থেকে কারাভ্যন্তরে দিনযাপন করছে, তাদের ত্যাগের পরিসীমা নেই, তারা তাদের জ্ঞানবুদ্ধিবিবেচনানুযায়ী কর্তব্য সংসাধন করেছে। মানছি, রাষ্ট্রক্ষমতা অনাচারের যে-বিভীষিকা বইয়ে দিয়েছেন, সমাজবিরোধীদের সঙ্গে নিবিড় ষড়যন্ত্রে যুক্ত হয়ে রাজনৈতিক কর্মীদের দলিত-পিষ্ট করবার উদ্দেশ্যে যে-পুঙ্খানুপুঙ্খ বহুবার্ষিকী পরিকল্পনায় নিযুক্ত হয়েছেন, তার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করার মতো সামর্থ্য বামপন্থী আন্দোলনের উপস্থিত নেই, কোনো-দিনই হয় তো ছিল না; বর্তমান সরকারের অত্যাচারের বহর ব্রিটিশ শাসনের চরম দৃষ্টান্তকেও ছাপিয়ে গেছে, যে-নাৎসী প্রকরণ রপ্ত ক'রে নিয়ে পুলিশ-গুণ্ডা সমন্বয়ে বামপন্থী কর্মীদের চলন-বলন রোধ করা হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে তা চল্লিশ বছর আগেকার ইওরোপীয় দুঃস্বপ্নকেও ম্লান ক'রে দিয়েছে, তা-ও মানি।

কিন্তু এই পরস্মৈপদী ব্যাখ্যাতেই যদি বিশ্লেষণ আবদ্ধ থাকে, তা হ'লে বুঝতে হবে ব্যাকুল বাদল সাঁঝে সত্যিই আমাদের দিন ফুরিয়েছে। অপ্রিয় কথা বলতেই হয়, ভগ্নদূতদের উপর চট্‌ ক'রে রেগে উঠে বধ্যভূমিতে যদি কেউ নিয়ে যেতে চান, তা হ'লেও হয়। একবার ভালো ক'রে খতিয়ে দেখুন এই এতগুলি অধ্যায় ভ'রে বাংলাদেশে বামপন্থী আন্দোলনের কী চরিত্র ছিল, সে-আন্দোলনের কারা পুরোধা ছিলেন, কারা তার চরিত্র নির্ধারণ বরাবর ক'রে এসেছেন, কাদের ইচ্ছায়-প্রবৃত্তিতে-প্রবণতায় আন্দোলনের অঙ্গসঞ্চালন ঘটেছে। বামপন্থী আন্দোলন মানে বিত্তহীনদের আন্দোলন, শ্রমিকের আন্দোলন, ভূমিহীন-স্বল্পবিত্ত কৃষিজীবীর আন্দোলন, নিম্নমধ্যবিত্তের আন্দোলন, চারদিকে যত খেটে-খাওয়া, খেটেও-না-খেতে-পাওয়া মানুষ, তাদের জড়ো ক'রে আনার আন্দোলন। অথচ, এখন পর্যন্ত, এই আন্দোলনের প্রকৃতি-তথা-পুরুষক্রম পুরোপুরি নির্ধারিত হয়েছে মধ্যবিত্ত মানসিকতার নির্ভরে। আন্দোলনের মৃদু থেকে উগ্রতম যে-ধারার দিকেই চোখ ফেরান না কেন, ঘোষবসুসেনগুপ্তদাশগুপ্তবাড়ুয্যেমুখুয্যেদের ঠাসাঠাসি ভিড়। অবশ্য এই তথ্য নিয়ে বিলাপ নিষ্ফল সময়ক্ষেপণ, আমাদের দেশ-আমাদের কাল অনন্য নয়, বামপন্থী চিন্তার-আবেগের সূত্রপাতের মুহূর্তে সব

দেশেই উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আদর্শবাদী সন্তানদের প্রধান ভূমিকা, তাঁদের শ্রেণীচ্যুতির আকুলিবিকুলি থেকেই দরিদ্রতর শ্রেণীর আন্দোলনের উদ্গম। চীনে, রুশদেশেও ঠিক এমন হয়েছে, সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে কুবা-ভিয়েতনামেও, জাপানে-ইওরোপে, অন্যান্য আরো দেশে। সুতরাং আমাদের বাড়তি লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। তবু গোল বেধেছে, গোল বেধেছে আমাদের মধ্যবিত্ত ঐতিহ্যের জন্য প্রত্যক্ষভাবে ততটা নয়, যতটা ঐতিহ্যের অন্তর্লীন লক্ষণাদির পরোক্ষ প্রভাবে। বামপন্থী আন্দোলন বাধ্যতই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহ-বিতর্ক-সংঘর্ষে আরক্ত, যে-কোনো দেশেই আরক্ত: যেহেতু এই আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করে আদর্শের অবৈকল্যের উপর, সে-আদর্শের ধ্রুবতারা যাতে স্খলিত না-হয়, তার জন্য প্রতি পলে আত্মানুসন্ধান আত্মবিশ্লেষণ প্রয়োজন, কোনো দুর্বলতার শিকার না-হয়ে আন্দোলনের অভ্যন্তর থেকে সবরকম খাদ-নিষ্কাশন অপরিহার্য। আন্দোলনের গহনে প্রতিনিয়ত বিতর্ক চলতে থাকবেই, শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর, শুদ্ধতর থেকে শুদ্ধতম প্রকরণে পৌঁছুনোর তাগিদে পারস্পরিক আলোচনা-বোঝাপড়া-সমালোচনা অত্যাবশ্যক। কিন্তু, বাংলাদেশের পটভূমিকায়, মধ্যবিত্ত মানসিকতার নিষ্পেষণে, যা হওয়া উচিত ছিল পরিশ্রুত উপাখ্যান, তা রূপ নিয়েছে উৎকট-অশ্লীল খেয়োখেয়ির। আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নিরূপণ ক'রে দিচ্ছেন ঘোষবসুসেনগুপ্তদাশগুপ্তলাহিড়ীসান্যালমুখুয্যেবাঁড়ুয্যেরা। তাঁদের অনেকেরই, মাত্র এক পুরুষ আগেই হয় তো, অঢেল জমি ছিল, ভূস্বামী ছিলেন তাঁরা, স্মৃতি বড়ো দুর্মর, স্মৃতি বড়ো কঠিন, ভূম্যধিকারীর স্মৃতি, যাঁর যত জমি তাঁর তত জমির জন্য বুভুক্ষা, কামনাবাসনালোভঅর্থগৃধ্নুতা, সুতরাং নায়েবলাঠিয়ালের সমারোহ, রাজায়-রাজায় যুদ্ধ, হানাহানি, পরশ্রীঅবলোকনে নিদ্রাহীন রাত, দ্বৈরথ সমর, লাঠিয়ালের-মশালচির-পাইকবরকন্দাজ-সড়কিবাজের অনবচ্ছিন্ন ভূমিকা। ভূস্বামীর ঐতিহ্য, সন্দেহকুটিলতাকলহপরায়ণতাপরশ্রীকাতরতা, সেনগুপ্তদাশগুপ্ত-ঘোষমুখুয্যেসান্যালবাঁড়ুয্যেবসু, এমন কি বামপন্থী আন্দোলনেও শেষ পর্যন্ত পরশ্রী-কাতরতার ছায়া পড়ে। খোঁজ নিয়ে দেখুন, তত্ত্ব নিয়ে, আদর্শ নিয়ে যেখানে ভীষণ দ্বন্দ্ব আপাতবিচারে সংগঠিত হচ্ছে, আসলে তাতে আদর্শের প্রসঙ্গ নিছক ভণিতা, তত্ত্বের ব্যূহের আড়ালে দু'দল ভূম্যধিকারমানসিকতাসম্পন্ন তাদের নোংরা, ক্লেদাক্ত কলহ পরিচালনরত। মনে ক'রে দেখুন, এই বাংলার প্রান্তে যখন বামপন্থীদের সর্বপ্রথম মস্ত বড়ো সুযোগ এলো, পারস্পরিক হানাহানির বহর

তখন থেকেই হঠাৎ বহুগুণ বৃদ্ধি পেলো। পরশ্রীকাতরতার ডালপালা সহসা উতলা হলো, ঐ গোষ্ঠী অসম্ভব এগিয়ে যাচ্ছে, ওরা সব-কিছু নিয়ে নিল, সর্বগ্রাসী ওরা, আমাদের তাই ষড় করতে হবে কী ক'রে ওদের টেনে নামানো যায়, দরকার হ'লে এমন কি পরম শত্রুরও দ্বারস্থ হ'তে হবে, এ-লড়াই বাঁচার লড়াই, এ-লড়াই জিততে হবে। পরশ্রীকাতরতা, সেই সঙ্গে অসহিষ্ণুতা। আমার পথ আসল পথ, তোমার পথ ভ্রান্ত, আমাদের বিশ্লেষণ নিখুঁত, তোমাদেরটা জোলো, আমাদের ব্যাকরণ নির্ভুল, তোমাদের ব্যাকরণ কীটগ্রস্ত। ভূম্যধিকারীর ঐতিহ্য, ভূম্যভিমানীর ঐতিহ্য, যে-ঐতিহ্য কখনো উদার হ'তে শেখায় না, কুচক্রী হ'তে শেখায়। বিশাল আকাশের নিচে সবাইকে জড়ো ক'রে আনা নয়, নিজেদের ক'জনকে নিয়ে মাঠের এক কোণে দাঁড়িয়ে বা ব'সে কুটনি কাটা; বৃহৎকে, মহৎকে হাতের নাগালে পাওয়ার চেষ্টা গৌণ হয়ে দাঁড়ায়, জবাকুসুমশান্তি তখন হিংসাদ্বেষকামক্রোধের গহনে নিহিত হয়ে আসে। মূল আদর্শ উহ্য, শ্রেণীশত্রুর প্রসঙ্গ আপাতত প্রক্ষিপ্ত, আগের কাজ আগে, ঘরের শত্রুদের সবচেয়ে আগে খতম করো, এরা কেউ-ই যে বিভীষণ নয়, আমাদের মতোই সমান আদর্শনিষ্ঠ, সে জ্ঞান তখন লোপ পেয়ে যায়, শরিকী রক্তের নেশায় চিত্তবৈকল্য ঘটে।

সেই সঙ্গে আরো যা ঘটে তা দৃষ্টিবিভ্রম। বামপন্থী আন্দোলনের যাঁরা পুরোধা, ইতিহাসের শিক্ষা যাঁদের চেতনার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে থাকবার কথা, তাঁরা, রিপুর প্রকোপে, ইতিহাসকে উল্টে-পাল্টে ফেলেন; বলতেই হয়, বুদ্ধির বিকারগ্রস্ততায় যত্ত্বণত্বজ্ঞান পর্যন্ত বিসর্জন দেন তাঁরা। ভূগোল এবং ইতিহাসে একটি পারম্পর্যসম্পর্ক আছে, যেমন আছে স্থান, কাল এবং পাত্রের মধ্যে, সে-সব কিছু তাঁরা বিস্মৃত হন। বিচারবিভ্রমহেতু, দূরকে কাছে মনে হয়, নিকটকে মনে হয় বহু দূর; কাছাকাছি মানুষের তাঁরা তাই গলা কাটেন, অথচ সবচেয়ে সতর্ক থাকা উচিত যে-মোহিনী মায়ার হাত থেকে, সেই অশরীরী প্রচ্ছায়াকে পরমা-প্রেয়সী হিশেবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করার সাধ জাগে, বিন্দুতম খেয়াল থাকে না যে কোনো-কোনো আলিঙ্গনে মৃত্যুর আশ্লেষ।

অহমিকা, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানলোপ। পশ্চিম বাংলার একটি বিশেষ রাজনৈতিক সংস্থান আছে, ভারতবর্ষের সামগ্রিক অবয়ব থেকে বিশ্লিষ্ট ক'রে এই ভূখণ্ডের বিবর্তনের প্রসঙ্গ চিন্তা করা তাই বাতুলতা। অথচ এই বাতুলতার শিকার হয়েছেন অনেকেই। একদল হয় তো ভেবেছেন ভারতবর্ষ উহ্য, আমাদের বিপ্লব

আমাদেরই বিপ্লব, বাকি ভারতবাসীদের এ-ব্যাপারে নাক গলাবার অধিকার নেই ; আমরা যদি এখানকার শ্রেণীশত্রুদের জবাইয়ের কাজটা আশু সম্পন্ন করতে পারি, তা হ'লে কার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে আমাদের বাধা দিতে এগোবে ? কিন্তু ভারতবর্ষ মানে একটি সংবদ্ধ রাষ্ট্রক্ষমতা, মন্ত্রীশান্ত্রীসাজোয়াগাড়িবোমাবিমান-বাহিনী-সংবলিত একটি রূঢ় সত্তা ; সেই শক্তি আমাদের ছেড়ে কথা কইবে না, আমাদের বিপ্লবের ব্যাপারে তারাও নাক গলাবে, তাদের সৈন্যসামন্ত নিয়ে প্রতিরোধে এগোবে, কারণ আমাদের বিপ্লবকে তারা হয় তো তাদের সর্বনাশের সূচক হিশেবে মনে করবে। তাছাড়া, স্থানভেদ-কালভেদ মস্ত জিনিশ, যেহেতু বিশেষ-এক কালে বিশেষ-এক দেশে বিপ্লবের আগুন বিশেষ-এক-ভাবে দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, অতএব আমাদের দেশে আমাদের কালে ঠিক তেমনটি-তেমনটি হবে, এ অসম্ভব প্রস্তাব। অহংবোধে অন্ধ না-হয়ে গেলে এই উপলব্ধিতে পৌঁছুতে সময় লাগা উচিত নয়। অথচ তা-ই হয়েছে।

অন্য দিকেও প্রায় সমান ভুল। আমরা বিচ্ছিন্নভাবে ইতস্তত গলা-কাটার দিকে এগোবো না, ধৈর্য ধ'রে, বহু বছর পরিশ্রম ক'রে আমরা শ্রমিকদের, দরিদ্র কৃষকদের সংঘবদ্ধ করেছি, তারা এখন আমাদের পতাকার তলায় কুচকাওয়াজে মগ্ন, তাদের শক্তিই আমাদের শক্তি, সেই শক্তির উপর নির্ভর ক'রে আমরা এবার আমূল সমাজ-বিপ্লবের দিকে এগোবো, ভূমিহীন কৃষককে বলবো, জমি দখল করো, আমরা পাশে থেকে তোমাদের অভয় দিচ্ছি, শ্রমিকরাও তোমাদের সঙ্গে আছে ; শ্রমিকদের বলবো, কলে-কারখানায় তোমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করো, সমগ্র কৃষকশ্রেণী পাশে থেকে তোমাদের সহায় হবে ; এই সংহত-সম্মিলিত শক্তির মুখোমুখি হ'তে ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল কেন্দ্রীয় শক্তি সাহস পাবে না, আমাদের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে। থাকেনি, কারণ এখানেও বিচারে স্খলন। কেন্দ্রীয় শক্তি একটি বিশেষ শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে ; এই কোণে আমরা জনসমুদ্রের জোয়ারে বিপ্লবকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবো, আর কেন্দ্র চুপচাপ দাঁড়িয়ে নিসর্গ শোভা দেখবে, তা হ'তেই পারে না। সুতরাং, এদিকে যখন আমরা জনতার সমুদ্রে অবগাহন ক'রে আত্মহারা, অন্যত্র তখন পরামর্শ-ষড়যন্ত্র-যুদ্ধের আয়োজন। আমরা টেরও পেলাম না কখন বর্গীরা এলো, আমাদের শস্য লুণ্ঠন করলো, আমাদের ভিটেমাটি থেকে আমাদেরই উৎখাত করলো। যে-সংঘবদ্ধ আন্দোলনের শক্তির অক্ষৌহিণীতে আমরা প্রত্যয় রেখেছিলাম, বোঝা গেলো

তাতে এখনো লৌহগুণ প্রবেশ করেনি। হঠাৎ-আক্রমণে পর্যুদস্ত-পরাজিত আমরা, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এখন ঘুরে-ফিরে অতীতচিন্তায় সময় রোমন্থন করছি ; পাটিগণিতে কোথায় ভুল হলো তা হ'লে ?

কিছু-কিছু ভুল, যার মূলে চিন্তার অস্পষ্টতা, ইতিহাসচেতনার অসম্পূর্ণতা, ক্ষমা করা যায়। কিন্তু যা অক্ষমার্হ তা স্বেচ্ছাকৃত ভুল, ঠাণ্ডা মাথায় হিশেব ক'ষে যে-ভুলকে উপস্থিত মুহূর্তে আর্ষবাক্য ব'লে বরণ করা হয়। তা-ও হয়েছে, হচ্ছে। যে-শ্রেণী দেশের খেটে-খাওয়া মানুষের চিরাচরিত শত্রু, যে-শ্রেণীভুক্তরা রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেয়ে খেটে-খাওয়া মানুষদের না-খাইয়ে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে প্রকাশ্যে লিপ্ত, বামপন্থী আন্দোলনের ভিতর থেকে কেউ-কেউ এখনো তাদের প্রেমে নিয়োজিত প্রাণমন। ও নিঠুর, আরো কী বাণ তোমার তূণে আছে, আমরা গ্রহণ করবো, শ্রমজীবীরা নিষ্পেষিত-নির্মূল হয়ে যাক, ও নিঠুর, তবু আমরা তোমার পাশাপাশি আছি, কারণ সাত সমুদ্র-তেরো নদীর ওপার থেকে আমাদের কাছে বাণী ভেসে এসেছে, আমরা যেন ধৈর্য না-হারাই, নিষ্ঠুরের হাতে সুন্দরের অপমান যেন সহ্য ক'রে-ক'রে যাই, কারণ, আমাদের শেখানো হয়েছে, কুশলতাতেই একমাত্র মুক্তির সম্ভাবনা। কী বলবেন এই অন্ধদের, বিগত কয়েক দশকের ইতিহাসের সূত্র এরা আদৌ বুঝতে পারেনি, কিংবা হয়তো বুঝেও না-বোঝার ভাণ করছে, কারণ এরা ক্লান্ত, এরা অপরাশ্রয়ী। শুধু পরশ্রীকাতরতা নয়, আরো-অন্য জটিলতর রোগের বীজাণু এদের জীবনীশক্তিকে কুরে-কুরে খাচ্ছে।

একটু চিন্তা ক'রে দেখুন, এই রোগের গহনে বিশেষ-এক আতুরতা, যা সম্ভবত ফের ভূম্যভিমানীর উত্তরাধিকার। বাংলার ভূস্বামী আবহমান কাল দৈবে আস্থা রেখেছেন, স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে অকম্পিতচিত্তে বংশবধুকে বিজয়াগোধূলিতে জীবন্ত গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে এসেছেন, চেতনায় কোন্-এক তন্ত্রের সংকেত। যুগের সঞ্চিত শাঠ্য নিয়ে কোনো মহিলা যদি হঠাৎ উপস্থিত হন, তাঁর গমকে মাঝে-মাঝে তাই ঘোর লাগে, ঈশ্বরীরূপে তাঁকে আরাধনার সাধ মাথা চাড়া দেয়। সে-মানবী অচিরে রক্তবর্ণ-সর্বগ্রাসী লোলজিহ্বা বিস্ফারণ করেন, কিন্তু, মধ্যবিত্ত অহমিকা, প্রায়-কাউকেই ভ্রম-স্বীকারে এগোতে দেখা যায় না। অন্য-এক মধ্যবিত্ত স্খলন, শস্তায় কিস্তি মাত্রার উদগ্র বাসনা, তা-ও সেই সঙ্গে পরিদৃশ্যমান : মজুরকৃষকবিত্তহীনদের সংঘবদ্ধ ক'রে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটানো বড়ো দুস্তর সাধনা,

অনেক রক্তাক্ত সংগ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে হবে, কাজ কী তাতে, এসো, আমরা কোনো মিহিন বিকল্প খুঁজি। এই অন্বেষণে বেরিয়ে আস্তে-আস্তে একদিন পরিপূর্ণ সুবিধাবাদের অঙ্কে ঢ'লে-পড়া: বাইরে দুর্ভিক্ষ, কিন্তু তাতে কী, আমরা নিজেরা তো রাজদরবারে কক্ষে পাচ্ছি, পাবো।

দেশে দুর্ভিক্ষ, নিরন্নের হাহাকার, ফসলঠাসা গুদোম, কিন্তু গরিবরা না-খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে কাতারে-কাতারে, রাষ্ট্রশক্তি অবিচল, দুর্ভিক্ষহেতু চিত্তস্থৈর্য এতটুকু নড়েনি, এই কারণে নড়েনি যে ছোটলোকগুলো খুব ভদ্রভাবে মারা যাচ্ছে, প্রতিবাদ না-ক'রে, লুঠপাটখুনজখম না-ক'রে, আগুন না-জ্বালিয়ে, এমন কি অভিশাপ পর্যন্ত না দিয়ে, মৃত্যুর এমন মহামহিমান্বিত সমারোহ দেখে, হতচকিত তারা, অভিশাপের ভাষা পর্যন্ত তারা ভুলে গেছে। আন্দোলন মৃত, আপাতত বামপন্থা অবরুদ্ধগতি। মধ্যবিত্তদের হাতে অছি-বদ্ধ আন্দোলন, কিন্তু রুশচীন-কুবাভিয়েৎনামে যেমনটি হয়েছিল, এখানে তা হলো না, এখন আশঙ্কা হয়, হয় তো আর হবার নয়, যে-আস্থা সমাজের দরিদ্রতর শ্রেণী মধ্যবিত্ত নেতৃত্বে অর্পণ করেছিল, তা ফিরিয়ে নেওয়ার সময় এসেছে, যেহেতু প্রতিদানে তারা নিছক বিশ্বাসঘাতকতাই শুধু পেয়েছে। বিনাত্রাণে বিনা সাহায্যে সুশৃঙ্খল বিনয়ে তারা গ্রামে-গঞ্জে ঘাটে-মাঠে-রেলের প্ল্যাটফর্মে-শহরের চত্বরে মারা পড়ছে, তাদের কাছে গিয়ে কেউ বলছেন না, অন্তত একবার, এসো, একত্র হয়ে ঐ গুদোমটা লুঠ করো, ট্রাকে-ওয়াগনে খাদ্যশস্য যা পাচার হচ্ছে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো, এসো, চলো, আমরা আছি, তোমরা ক্ষুধার্ত, তোমরা মৃত্যুপথযাত্রী, কিন্তু একটু ঘৃণা জড়ো করো, প্রতিহিংসায় সংহত হও, এ-ফসল তোমাদের, এই দেশে তোমাদের প্রধান অধিকার, তোমরা যদি খেতে না-পাও, চরম পন্থা গ্রহণের অধিকার আছে তোমাদের···

মৃত, মৃতরা কথা বলে না। আন্দোলন মৃত। বাইরে দুর্ভিক্ষ। বহু শত ছেলেমেয়েকে হত্যা করা হয়েছে, পঁচিশ-তিরিশ হাজার ছেলেমেয়ে কারার অন্ধকারে পচছে, তাদের ত্যাগে কোনো খাদ নেই। আরো হাজার-হাজার কর্মী প্রতীক্ষমান, এখনো স্ব-স্ব বিবেকানুযায়ী বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত, উদ্‌গ্রীব। জীবনের ধন, বিশ্বাস রাখতেই হয়, কিছুই ফেলা যাবে না; সে-বিশ্বাসও খোয়া গেলে আত্মহত্যা ছাড়া গতি নেই। কিন্তু সাধনার সমগ্র উত্তর হয় তো এমনকি ত্যাগেও নেই, তা হ'লে মুখ বুঁজে বাংলাদেশের মাটিতে, এই ১৯৭৪ সালে, এত

অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষ-শিশু মারা যেত না। ত্যাগের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত আন্দোলনে অহমিকার আস্ফালন, পরশ্রীকাতরতার কূর্দন, ইতিহাসাভিজ্ঞতায় অনীহা, মরীচিকামোহসমাচ্ছন্ন কুজ্ঝটিকায় ত্যাগ ঢাকা প'ড়ে থাকে।

আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, আমাদের অপদার্থতার মাশুল শ্রমিককৃষক-নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীভুক্তদের এখন গুণতে হচ্ছে। আপাতত ভয়-খাওয়া বিভ্রান্ত অবস্থা, মাঝে-মাঝে নিজেদের পিঠে চাবুক চালাই। অথচ তা-ও তো সমান অসাধুতা, যেন আত্মবিশ্লেষণেই আত্মক্ষালন। তার চেয়ে, কে জানে, একেবারে চুপ হয়ে যাওয়া হয় তো শ্রেয়। যাদের মুখ থুবড়ে মরবার, তারা মরবে; শরৎকাল, উজ্জ্বল রোদ্দুর, সুনীল আকাশে হাল্কা তুলোর মতো মেঘ, আসুন, গলা ডুবিয়ে আনন্দ করি আমরা।

আদ্যাশক্তিমহাশক্তিকালিকাকাহিনী

ব্যাপার-স্যাপার দেখে হকচকিয়ে যেতে হয়। জিনিশপত্রের দাম বাড়ছে, প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বাড়ছে, চাকরির বাজারে মন্দা, নানা তরফের বাগবিস্তার সত্ত্বেও কারখানার প্রসার আদৌ নেই, এ-বছর ফসলও ঈষৎ কম হয়েছে, বেকারের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান ; যেদিকেই তাকানো যায়, কোনো আশার আলো নেই। অথচ ধর্মানুষ্ঠান উপলক্ষ ক'রে মাতামাতি তুঙ্গে উঠেছে। কোথায় এরকম অবস্থায় একটু র'য়ে-স'য়ে খরচ করা হবে, হৈহুল্লোড় একটু কম ক'রে করা হবে, হচ্ছে ঠিক উল্টোটা। কলকাতার অলিতে-গলিতে-কোণে-সুড়ঙ্গে দুর্গাপূজার সমারোহ : যেখানে গত বছর দুটো পুজো ছিল, সেখানে এবার চারটে ; যেখানে চারটে, সেখানে অন্তত সাতটা। সর্বজনীন পুজোর শুধু সংখ্যাবৃদ্ধিই ঘটছে না, চটকও বাড়ছে, পুজো উপলক্ষ ক'রে ঢালাও অর্থের বন্যা বইছে। দেশে বিজলী সংকট, পুজোর ক'দিন কে দেখে বলবে : নানা রঙের আলোর রোশনাই, উৎসবের দাপাদাপি। আমাদের এ-পাড়ার পুজোর চমকেগমকে তোমাদের ও-পাড়ার পুজোকে ছাড়িয়ে যেতে হবে, অন্যথা মুখরক্ষা হবে না। সুতরাং প্রতি বছর মাতামাতির বহর বেড়েই চলেছে : মাতৃপুজা গৌণ, আসল লক্ষ্য কে কাকে কতটা হারিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু দুর্গার আরাধনাতেই ক্ষান্তি নেই। শ্যামাপূজার সম্ভার, সন্দেহ হয়, দুর্গোৎসবকে ছাপিয়ে উঠেছে। এক সন্ধ্যার কালীসাধনা টেনে-হিঁচড়ে প্রায় সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে : ডামাডোল, ডামাডোল, কে কত বাজি ফাটাতে পারে, কে কত আলোর ছটায় আকাশকে উন্মত্ত ক'রে আনতে পারে। প্রাণ-কাঁপানো শব্দের অহোরাত্র সমারোহ, প্রতি রাস্তায় কাতারে-কাতারে

শ্যামাপূজা, এমন কি পাশাপাশি দুটো সর্বজনীন ব্যাপার একশো গজের মধ্যে একই রাস্তার উপর, অথবা মুখোমুখি। তাছাড়া পৃথিবীতে দেবদেবীর শেষ নেই : কালী পূজার পর জগদ্ধাত্রী পূজা, জগদ্ধাত্রীর পর কার্তিক, কার্তিকের পর সরস্বতী, সরস্বতীর পর বাসন্তী, বাসন্তীর পর বিশ্বকর্মা, এমনি ক'রে, বর্ষা পেরোতে না-পেরোতে, দেবী ভগবতীতে পৌঁছে-যাওয়া। শুধু সময়ের ফাঁকগুলি ভরিয়ে যেতে থাকো, পূজা থেকে পূজান্তরে এ-ভাবে বিহার ক'রে-ক'রে অচিরে ফের দুর্গোৎসবের ঋতুতে উপনীত হওয়া যাবে। প্রতি নতুন ঋতুতে নিনাদ আরো-একটু উচ্চগ্রাম হোক ; আমাদের ডুবতে দাও, আমাদের মরতে দাও।

বছর কয়েক আগেও, পুজোর সম্ভার জোটানো হতো পাড়ায়-পাড়ায় চাঁদার হামলা ক'রে। চাঁদা, যা স্বেচ্ছায় দেয়, তাকে জিজিয়াতে পরিণত ক'রে তোলা হয়েছিল, সাধারণ গৃহস্থের না-দিয়ে উপায় কী। হালে চাঁদার অত্যাচার হয় তো কমেছে, উৎসবের সমারোহ বাড়া সত্ত্বেও কমেছে। খুচরো অর্থ সংগ্রহের আর তেমন দরকার নেই ছেলেদের, তারা প্রচুর কাঁচা টাকা পাচ্ছে হাতে। রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে পাচ্ছে, ভয়ে-নীল-হয়ে-আসা ব্যবসায়ীরাও বিজ্ঞাপনের ছুতোয় মোটা টাকা দিচ্ছে। তাছাড়া, সরকারী সৌজন্যও প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হচ্ছে। বলতে গেলে, এ-বছর থেকে, এই পশ্চিম বাংলায়, যাবতীয় হিন্দু পূজাদি রাষ্ট্র-স্বীকৃত, রাষ্ট্রপ্রসাধিত অনুষ্ঠানে পরিণত। সরকার এবং প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রসন্ন অভয় সর্বজনীন সর্ববিধ উৎসবকে মায়ার কাঠি ছুঁয়ে গেছে। সুতরাং যত ইচ্ছে বেলেল্লা হুল্লোড় চলুক, পাড়ায়-পাড়ায় ছেলের দলের ভয়চকিত হবার কোনোই কারণ নেই। আপাতত তাদের কেন্দ্র ক'রে পৃথিবী অন্বিত হচ্ছে, তাদের কড়ির অভাব নেই, রাষ্ট্রপ্রসাদেরও অভাব নেই। পূজা থেকে পূজান্তরে, নিবিড় ঘোরের মধ্য দিয়ে যুবশক্তির বিহার চলবে।

অথচ, খোঁজ নিয়ে দেখুন, বেকারের সংখ্যা ভয়ংকর বেড়ে গেছে গত কয়েক বছরে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ছেলেরা ঠায় ব'সে আছে, সতেরো হাজার পদের জন্য সতেরো লক্ষ দরখাস্ত জড়ো হচ্ছে ; যারা কলাবিজ্ঞান নিয়ে সাধারণভাবে পড়াশুনা সমাধা করেছে তাদের যেমন সুবিধা হচ্ছে না, যারা কারিগরি শিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদেরও একই অবস্থা। সেচের তেমন প্রসার না-হওয়ায়, এবং ভূমিব্যবস্থার সংস্কার উপস্থিত এক-জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকায়, পল্লী অঞ্চলেও অনুরূপ ঘটনার ঘনঘটা ; ভিড় বাড়ছে, কিন্তু লোকনিয়োগ বাড়ছে না। অথচ

সর্বত্র মূল্যমান ঊর্ধ্বগতি : যাঁদের উদ্বৃত্ত ফসল নেই, অথচ মূল্যবৃদ্ধি থেকে যাঁরা সামান্যতম বাড়তি মুনাফা হাতাতে পারছেন না, তাঁরা সংখ্যায় অমেয়। দেশের জনসাধারণ সার্বিকভাবে মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপে হাঁসফাঁস করছে। সর্বজনীন পূজাসমূহের উদ্যোক্তারা কিন্তু এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্বিকার। বেকারের সংখ্যা যত বাড়ছে, জিনিশপত্রের দাম যত বেশি চড়ছে, মহাশক্তিমহাবিদ্যামহাদুর্গামহালক্ষ্মী-মহাসরস্বতীআত্মাশক্তিকালিকাপরমেশ্বরীবন্দনা ততোই আরো ছড়াচ্ছে।

কেন এমনধারা হচ্ছে তার কিন্তু একটি অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা সম্ভব। ধরুন গোটা পশ্চিম বাংলায় বেকারের সংখ্যা তিরিশ লক্ষ ছুঁই-ছুঁই করছে। সামান্য বেশিকম হতে পারে, কিন্তু নানা অনুসন্ধানে মনে হয় এই হিশেবটিতে তেমন-কোনো ভীষণ গলদ নেই ; এমন কি রাজ্য সরকারও দু'একবার এই সংখ্যাটিকেই ব্যবহার করেছেন। যদি র'য়ে-স'য়ে অঙ্ক ক'ষে বলা যায় যে বর্তমান অবস্থায় নতুন কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন জনপ্রতি অন্তত পাঁচ হাজার টাকার বিনিয়োগ, তা হ'লে তিরিশ লক্ষ নতুন কাজ সৃষ্টি করতে হ'লে পনেরোশো কোটি টাকার দরকার পড়বে। কেউ-কেউ হয়তো বলবেন, হিশেব আরো-একটু ছাঁটুন, এখন যে-সমস্ত কলকারখানা বন্ধ আছে, কিংবা তৈজসাদির অভাবে অথবা আর্থিক সংকটহেতু যে-সব কারখানায় পুরো কাজ হচ্ছে না, সে-সব জায়গায় অতিরিক্ত লোকনিয়োগের জন্য জনপ্রতি আদৌ পাঁচ হাজার টাকার দরকার নেই, কম হ'লেও চলবে। কৃষিক্ষেত্রেও ঐ হারে বিনিয়োগ তেমন আবশ্যিক নয় : ভূমিসংস্কার প্রয়োজন, সার-সেচ-বিদ্যুৎ-উন্নত ধরনের বীজ-লগ্নি ইত্যাদি নিশ্চয়ই চাই, কিন্তু সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকলে গড়ে দু'হাজার-আড়াই হাজার টাকা ঢাললেই একজন লোকের কর্মসংস্থান করা যেতে পারে। তর্কের খাতিরে এত-সব কথা মেনে নিলেও তিরিশ লক্ষ বেকারের ব্যবস্থা করতে হ'লে নিদেনপক্ষে এক হাজার কোটি টাকা চাই-ই চাই। এই পরিমাণ মুদ্রার সংস্থান রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে উপস্থিত সুদূরপরাহত। তা যদি না-ও হতো, বিনিয়োগের মারফত উৎপাদনব্যবস্থার সম্প্রসারণ চারটিখানি কথা নয় ; তা সময়সাপেক্ষ, বছরের-পর-বছর গড়িয়ে যাবে আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ হ'তে। বেকার-সম্প্রদায় কি অতটা সময় স্রেফ আঙুল চুষতে রাজি থাকবে ?

পরিকল্পনার জাল পেতে, উৎপাদনব্যবস্থাকে বিকশিত-উন্মোচিত ক'রে বেকারসমস্যার তাই আশু সমাধান সম্ভব নয়। অত পরিমাণ টাকা নেই,

যথাযোগ্য সংগঠনশক্তি নেই, সবচেয়ে যা বড়ো কথা, আপনারা টিপে-টিপে মেপে-ঝেঁপে পরিকল্পনা রূপায়িত করবেন বহু বছর ধ'রে, আর সুবোধ বালকের মতো বেকারের দল চুপচাপ আশায় বুক বেঁধে পাশ থেকে আপনাদের প্রকর্ষ অধ্যবসায়-সহকারে নিরীক্ষণ করবে, তা হ'তেই পারে না। সেই ঋতু আমরা অতিক্রম ক'রে এসেছি। তাছাড়া ততদিনে বেকারের সংখ্যা আরো অনেক বেড়ে যাবে।

এই মুহূর্তে অন্য যা করা যেতে পারে তা কর্মহীনদের জন্য বেকার ভাতার ব্যবস্থা। এখানেও কিন্তু পাটিগণিত মারাত্মক। প্রতি বেকারকে মাসে একশো টাকা ক'রে বৃত্তি দিতে হ'লেও বছরের হিশেবে গিয়ে দাঁড়ায় বারোশো টাকায়। তিরিশ লক্ষ বেকারের জন্য তা হ'লে বাৎসরিক বরাদ্দ পড়ে তিনশো ষাট কোটি টাকা, এবং বছরের-পর-বছর ধ'রে অতএব এই তিনশো ষাট কোটি টাকা বা সমপরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা রাখতে হয়। জনপ্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা ক'রে ধরলেও বাৎসরিক হিশেব একশো আশি কোটিতে স্তম্ভিত থাকে। বেকারদের শান্ত রাখা কর্তব্য, নইলে আগুন জ্বলবে, কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় এমন সামর্থ্য নেই যে স্রেফ পশ্চিম বাংলায় বেকার ভাতা বিলোনোর জন্য প্রতি বছর দুশো কোটি টাকার মতো আলাদা ক'রে নির্ধারণ করা হবে।

সমস্ত কর্মহীনকে সুষ্ঠু বিনিয়োগের মারফত কাজ পাইয়ে দেওয়া, অন্যথা প্রত্যেকের জন্য ন্যূনতম ভাতার ব্যবস্থা করা, আপাতত সরকারের পক্ষে অসম্ভব। ময়দানের বক্তৃতার পাটাতনে দাঁড়িয়ে কাব্যিক প্রতিশ্রুতির পরিপূরণ সম্ভবপরতার বাইরে, বহু যোজন বাইরে। কিন্তু একটা-কিছু করতেই হয়, নইলে যে-যুবশক্তিকে নির্ভর ক'রে রাজনৈতিক সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছনো গেছে, তা বিগড়ে যাবে, বিগড়ে গিয়ে উল্টোপাল্টা কথা বলা শুরু করবে, উল্টোপাল্টা কথা থেকে উল্টোপাল্টা কাজ, বিষম বিপত্তি ঘটবে।

সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না; যুবকসম্প্রদায় মারমুখো হয়ে উঠবে না, অথচ সরকারি খাতে তেমন মারাত্মক অর্থব্যয়েরও প্রয়োজন হবে না, এমন রাজযোটক সূত্রের খোঁজে অথচ খুব বেশি দূর যেতে হলো না। পল্লী অঞ্চলের যুব সম্প্রদায় সম্বন্ধে এখনো তেমন মাথা না-ঘামালেও চলবে: কর্মসংস্থানের অভাবে তাদের মনে যদিই বা বিক্ষোভ দানা বাঁধে, সে-অসন্তোষ সহসা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা নেই, কারণ গরিব কৃষকদের সংগঠন তেমন জোরালো নয়; পশ্চিম বাংলায় যা-ও একটু জোরালো হয়ে উঠেছিল, রাজনৈতিক

ঘটনা-সংঘাতে ফের ঠাণ্ডা মেরে গেছে। সুতরাং, যদি পুঞ্জীভূত অসন্তোষকে নিগড়ে বাঁধতে হয়, কলকাতা এবং প্রধান-প্রধান মফস্বল শহরগুলির কর্মহীন যুবকদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা দরকার। এমন-এক আয়োজন চাই যার প্রসাদে কর্মসংস্থানের কোনো সুচারু ব্যবস্থা হোক-না হোক, ন্যূনতম কোনো নিয়মিত উপার্জন থাকুক-না থাকুক, যুবকের দল ভুলে থাকবে, সম্মোহিত থাকবে, নিয়োজিত থাকবে। সর্বজনীন পূজার সমারোহে সেই প্রার্থিত পথের সন্ধান পাওয়া গেছে।

অঙ্কের হিশেবেই ফেরা যাক। ধরুন তামাম কলকাতা শহরে সব-মিলিয়ে দু'হাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইদানীং জনশ্রুতি কোনো-কোনো এ-ধরনের পুজোয় খরচের বহর এক লাখ-দেড় লাখে গড়িয়ে গেছে; অন্যদিকে, কোনো-কোনো দরিদ্রতর পাড়ায়, দশ-পনেরো হাজার টাকার মধ্যেই এখনো মহাদেবীর আরাধনা সম্পন্ন হ'তে পারছে। যদি গড়ে প্রতি সর্বজনীন অনুষ্ঠানে খরচের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব'লে ধরা হয়, তা হ'লে দু'হাজার অনুষ্ঠানের জন্য মোট ব্যয় ঠেকে গিয়ে এক কোটি টাকায়। দুর্গোৎসব বাদ দিয়ে সারা বছর ভ'রে অন্য আরো যা-যা পুজোর প্রকোপ চলে, ধরুন সর্বজনীন খাতে সে-সমস্ত অনুষ্ঠানে আরো দু'কোটি টাকা প্রবাহিত হয়ে যায়। সংবৎসরে জননী ভগবতী এবং তাঁর আশেপাশের দেবদেবীদের উপলক্ষ ক'রে তা হ'লে সাকুল্যে তিন কোটি টাকার চাহিদা। মফস্বল শহরের পূজাপ্রক্রিয়ায় কলকাতার জৌলুষ নেই, খরচপত্রের বহরও অনেকটাই পরিসীমিত। যদি মেনে নেওয়া যায় যে মফস্বলে নানা সর্বজনীন পূজানুষ্ঠানে দু'কোটি টাকা ব্যয়িত হয়, তা হ'লে সারা পশ্চিম বাংলায় প্রকাশ্য পীঠে দেবীবন্দনার জন্য সম্পূর্ণ খরচের মাত্রা মোটা-মুটি পাঁচ কোটি টাকার মতো দাঁড়ায়।

এই অঙ্কের একটু-আধটু হেরফের হ'তে পারে, কিন্তু তুলনাগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাতে ব্যত্যয় ঘটবে না। কর্মহীন যুবকদের চাকরি দেবার সামর্থ্য আমাদের নেই, বিনিয়োগের ব্যবস্থা-শিল্পবিস্তারের প্রতিভা আমাদের আয়ত্তের বাইরে, আমাদের যে-কোনো প্রতিশ্রুতির ভরাডুবি ঘটবার আশঙ্কা। যুবক সম্প্রদায় অলিন্দের বাইরে দাঁড়িয়ে আশায় দোলায়িত হচ্ছে, কিন্তু দু'দণ্ড বাদেই, যে-মুহূর্তে নিশ্ছিদ্র তমিস্রার কাহিনী ঘোষিত হবে, তাদের প্রতীক্ষার চরিত্র বদলে যাবে: তারা হিংসায় ফুঁসবে, ক্রোধে খান্‌খান্ করতে চাইবে অলিন্দ-

প্রকোষ্ঠ-সুগঠিত প্রাসাদ। সেই সর্বনাশের হাত যদি এড়াতে চাই, এসো, যুবকদের লেলিয়ে দিই, দেবী-পূজায় ভিড়িয়ে দিই, নেশায় ওরা মাতোয়ারা হয়ে উঠুক। একবার নেশায় মাতলে ওদের দিয়ে আর ভয় নেই, নেশার ঘোরে ওরা পরিপার্শ্ব ভুলবে, নিজেদের অতীত-ঐতিহ্য ভুলবে, ভবিষ্যৎচিন্তা ভুলবে। এই নেশা দৈনন্দিন দিনযাপনের গ্লানিকে চাপা দেয়, খিন্নতা-জীর্ণতার আলোক-পরিধির বাইরে যুব সম্প্রদায়কে তুলে নিয়ে যায়, সমস্ত ভাবনাচেতনা এক উতরোল সম্মোহনে ডুবিয়ে দেয়: কাড়ানাকাড়াজগঝম্প, হট্টগোলশঙ্খনাদদামামাদ্রিমিকি, রক্তসদৃশসিন্দুরচর্চিতবিভা, নৃত্যগীতঅট্টহাসিউচ্চহুংকার, দ্রুততমধমনীস্পন্দনহত-চকিতবিদ্যুৎবহ্নি। নেশা, ঘোর, বিষাদ ও আনন্দের অঙ্গাঙ্গী মিশ্রণ, মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ভেসে-আসা এক অসহ্য সুখসংগীত। যে-ভয়াবহ পার্থিব আরতি জীবনানন্দকে মোহহান ক'রে এনেছিল, সেই শত-শত শূকরের চিৎকার, শত-শত শূকরীর প্রসববেদনা, কান্না-প্রেম-মোহ-অভিমান-অনুভূতি সব-কিছু পিছনে ফেলে রেখে দেবীপূজার উন্মত্ত প্রস্থান। কেউ-কেউ কাজ পায়, অধিকাংশ পায় না; অল্পসংখ্যক কয়েকজন ফুলে-ফেঁপে-অপরের মাথায় কাঁঠাল বুলিয়ে ঐশ্বর্যের তুঙ্গ পাহাড়ে চ'ড়ে বসেছেন, অথচ অধিকাংশই সানুদেশে ধিকিয়ে ধিকিয়ে নরকপ্রতিম জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে; শিল্প-পতি-সদাগরের দল মিথ্যে কথা বলছেন, জালিয়াতি করছেন, পুকুরচুরি করছেন, সমাজতন্ত্রের ধোঁকা দিয়ে আখের গুছোচ্ছেন, অন্যদিকে দু'মুঠো অন্নের সংস্থানও বি. এসসি-এম. এসসি-এম. টেক পাশ-করা অগণিত ছেলেমেয়েরা করতে পারছে না; গুটিকয়েক অসাধু রাজনৈতিক নেতা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আপোষরফা ক'রে জিনিশপত্রের দাম বাড়িয়ে যাচ্ছে, অথচ পরমুহূর্তে খবরকাগজে নাকি-কান্নার প্রবাহ বইয়ে দিচ্ছে: একবার মহাশক্তিকালিকাপরমেশ্বরী প্রভৃতির পুজোর ফেরে ভিড়িয়ে দিতে পারলে এবংবিধ উটকো চিন্তার মোহাবরণ আর যুবকদের জড়াতে পারবে না। শ্রেণীসংঘর্ষের ইতিকথার মধ্যে তাদের আর প্রবিষ্ট হবার উপায় থাকবে না তা হ'লে, তারা নির্বেদ নির্মোহ মেষশাবককুলে পরিণত হবে। পূজা থেকে পূজান্তরে, এক দেবীর স্তুতি থেকে অন্য-এক ভীষণতরা দেবীর স্তুতিতে, এক তন্ত্রের অজ্ঞান থেকে ঘোরতর অন্য-এক তন্ত্রের গভীরতর জ্ঞানহীনতায় যুবকযুবতীরা বিহার করবে। তারা আলাদা ভাবে চিন্তা করতে ভুলে যাবে, দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা তাদের আর স্পর্শ করবে না, ক্ষুধাতৃষ্ণাদিসম জৈব

প্রয়োজন তারা উপস্থিত ভুলে থাকবে ; সেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-কথিত নেশার মতো, তারা ভেসে-ভেসে যাবে।

অথচ, কত সস্তায় কিস্তি-মাৎ দেখুন। হাজার-হাজার কোটি টাকার শিল্পসম্ভার নয়, কয়েকশো কোটি টাকার বেকার ভাতা পর্যন্ত নয়, প্রতি বছর কমবেশি কোটি পাঁচেক টাকার সামান্য মামলা। যাঁরা রাষ্ট্রশক্তির হাল ধ'রে আছেন, শিল্পপতি-উচ্চবিত্ত-কৃষিজীবীব্যবসায়ীদের সঙ্গে যাঁদের নাড়ির সংযোগ, পাঁচসাত কোটি টাকার ব্যবস্থা করা তাঁদের কাছে অতিশয় সরল ব্যাপার, চিনি বা গম বা সুতি কাপড়ের দাম একটু বাড়িয়ে দিলেই এই ঈষৎপরিমাণ টাকা তাঁদের করতলগত আমলকি হয়ে যায়। তাই গঙ্গাজল দিয়েই গঙ্গাপুজার উপচার সাজানো হচ্ছে : তৈজসাদির দাম চড়িয়ে সাধারণ লোকের কাছ থেকে বাড়তি যে-অর্থ আহরণ করা হয়, তার একটা অংশ যুবককুলকে বশীভূত করার প্রয়োজনে ব্যবহৃত, ব্যবহৃত, ব্যবহৃত হ'তে থাকে। অশ্লীলতার এক বিশাল বন্যা ভব্যতা-সভ্যতাকে পরাভূত ক'রে বিজয়ী রাজপুত্রের মতো এগিয়ে যায়।

চিকিৎসাশাস্ত্র তথা মনোবিজ্ঞান দু'পক্ষ থেকেই এই মীমাংসার সমর্থন মেলে ; পাশ্চাত্ত্যের মহাদেশাদিতে যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে যে-নৈরাজ্য দেখা গেছে, তার অভিজ্ঞতাও অনুরূপ : একবার নেশার আবর্তে নিমজ্জিত হ'লে বেশ-কয়েকদিনের জন্য খাদ্য-পানীয়ের তাগিদের বাইরে চলে যাওয়া যায়, শরীরের আদিম প্রয়োজনগুলি স্তিমিত হয়ে আসে। অবশ্য, সপ্তাহের-পর-সপ্তাহ ধ'রে, স্রেফ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দিন অতিক্রান্ত করলে, দেহে কোনোরকম পুষ্টি অনুপ্রবেশের সুযোগ না-থাকলে, আস্তে-আস্তে মৃত্যুর দূতরা এগিয়ে আসবে, নেশার ঘোর আর মৃত্যুর সমাচ্ছন্নতার মধ্যে তখন আর বিশেষ তফাৎ থাকবে না, শরীরের বিভা ক্রমশ নিস্তেজ হবে, নিস্তেজ হ'তে-হ'তে একদিন সম্পূর্ণ নিভে যাবে। কিন্তু কী লাভ আগে থেকে সেই মহাশ্মশানের কথা ভেবে। দেশের যাঁরা হাল ধ'রে আছেন, তাঁদের আপাতত সমস্ত গুরুতর চিন্তার প্রদাহ থেকে মুক্তি। দেশে অন্নাভাব থাক, ক্ষতি কী ; দেশে প্রতিদিন বেকারের সংখ্যা হাজারে-হাজারে বেড়ে যাক, কোনো ক্ষতি নেই ; আর্থিক প্রগতি এক-জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে থাক, তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। কোনো ক্ষতি নেই দেশ যদি চরম সর্বনাশের দিকে ধাপে-ধাপে এগোতে থাকে, কারণ আমরা অক্ষত থাকবোই, আমাদের হাতে জাদুকাঠি, আমরা দেশের লোককে পুজোর নেশায় ভিজিয়ে দিয়েছি,

দেবীশক্তিআত্মাশক্তিমহাশক্তিকালিকাপ্রলয়ংকরীপ্রলয়েশ্বরী আমাদের আশ্রয়, কোনো প্রলয় তাই আমাদের আর ছুঁতে পারবে না।

একবার চিন্তা, করুন, এটা ১৯৭২ সাল, মানুষ স্বয়ংসাধিত বিজ্ঞানের সাহায্যে চন্দ্রলোকে পৌঁছে গেছে, পদার্থের নিভৃততম রহস্য আজ মানুষের কুক্ষিগত, পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক ভূখণ্ডে ঈশ্বরের যে-কোনো অভিব্যক্তি ধূল্যবলুণ্ঠিত। চিন্তা করুন, ভারতবর্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের পর পঁচিশ বছর গত হয়েছে, অথচ ঐ সময়ের পরিসরে মাথাপিছু খাদ্যের পরিমাণ বাড়ে তো নেই-ই বরঞ্চ হ্রাস পেয়েছে, ধনৈশ্বর্যবণ্টনের অসাম্য কমে না গিয়ে আরো বিস্ফারিত হয়েছে। চোখ মেলে দেখুন দুর্গোৎসবকালিকাসাধনার আলোকঝলকিত মণ্ডপের ঠিক বাইরে, কী গভীর স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার, দু'পা এগোলে শীর্ণবুভুক্ষুমুমূর্ষু ভিখিরির শরীরে আপনার পা জড়িয়ে যাবে, এরকম অন্তত পনেরো লক্ষ ভিখিরি-প্রায়-ভিখিরি কলকাতার রাস্তায়, খোলা আকাশের নিচে, গ্রীষ্মে-শীতে-বর্ষার বীভৎসতায় দিনাতিপাত করে যাচ্ছে। অথচ, কোনো পুরুষার্থ উত্তেজিত হয় না, ঢাক বাজছে, কাড়ানাকাড়া, শঙ্খনাদ, দেবীর রসনানিঃসৃত রক্তের বিদ্যুৎ-ঝলক, দেবীকে পূজো করো, দেবীতে আনত হও, পুরুষার্থ স্তিমিত হয়ে আসুক।

স্তিমিত হয়ে আসে। সন্দেহ হয়, যাঁরা রাজনীতির লীলাকেলি খেলছেন, তাঁরা দুই স্তরে ভেল্‌কি সাধছেন। অনবচ্ছিন্ন দেবীসাধনার অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার গহনে হয়তো আরো-এক গূঢ় অভীপ্সা নিহিত আছে। এখানেও মনোবিজ্ঞান ছায়া ফেলে। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে, সাংকেতিকতার সূত্রে অনেক সময় যে-প্রয়াস বিধৃত, ইশারায়-ইঙ্গিতে সে-ধরনের কোনো প্রজ্ঞা আমাদের চেতনার উপর চাপিয়ে দেওয়া চলছে যেন। দেবীপূজা, মাতৃসাধনা, শক্তিআরাধনা, মহালক্ষ্মীমহাসরস্বতীমহাভগবতীমহেশ্বরীকে তদ্গতচিত্তে তর্পণ : এটা প্রসাদভিক্ষার ঋতু, সর্বস্বসমর্পণের ঋতু, অন্ধভক্তির ঋতু, অলৌকিকতায় বিশ্বাসের ঋতু, অন্ধ আবেশের ঋতু। যিনি এই আবেগের-প্রত্যয়ের-আবেশের-নিষ্ঠার-ভক্তির-ভয়ের-মোহাচ্ছন্নতার অভিরূপ, তিনি কে? তিনি কি শুধুই বৈদেহী দেবিকা যাঁকে আমরা প্রতিমামৃত্তিকায়, আমাদের সংকীর্ণ পার্থিবকল্পনায় সীমিত ক'রে আনি, নাকি তিনি কোনো মানবীস্বরূপা, ঈশ্বরীর রক্তমাংসবিভূষিতা প্রতিভূ? দেখে-শুনে মনে হয়, বড়ো জটিলকুটিল নাটকাভিনয় চলছে, ডামাডোল,

ঢাকঢোল, মাত্র কোটি পাঁচেক টাকার সাবলীল আরতি, অথচ কী ভয়াবহ তার প্রক্রিয়া, অন্ধমস্ত দেবীপূজাই শুধু নয়, তারও গভীরে এক মানবীকে দেবী-স্থানে প্রতিষ্ঠা ক'রে ক্রমাগত হারে লাভের হিশেব কষা চলছে।

জনশ্রুতি, আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, দশ কোটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নাকি তাঁদের স্বতন্ত্র বিশ্বাসে প্রশান্ত হৃদয় নিয়ে এখানে স্থিত থাকতে পারেন; ভাবনাচিন্তার ক্ষেত্রে যাঁরা সংখ্যালঘু, তাঁরাও নাকি পারেন। এ-সমস্তই কিংবদন্তী। আসলে এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে কারোরই হয়তো আর নিস্তার নেই, পৃথক চিন্তা বা বিশ্বাসের দোহাই দিয়ে অব্যাহতি পাওয়ার আশা কম, দেবীপূজায় সকলকেই ব্যাপৃত হ'তে হবে। জনে-জনে অভয় দেওয়া হচ্ছে, জলাতঙ্কের আশঙ্কা অমূলক, দেবীকে সবাই মিলে ভজনা করো, দেবী কামড়াবেন না। আর যদি মিথ্যে ভয় পাও, ঘাবড়ে গিয়ে দেবীর স্থান থেকে পালাতে শুরু করো, তা হ'লে, সুকুমার রায়ের ছড়ার সেই বয়ানের মতো, দেবী এবং তাঁর সন্তানসন্ততি সবাই মিলে ছুটে এসে সত্যি-সত্যি কামড়ে দেবেন।

শ্রেণীসংগ্রাম, অবৈকল্য, ব্রেখ্‌ট

দেখে-শুনে আমার মনে ভয় ঢুকেছে। ইওরোপ থেকে পালিয়ে-আসা শ্লথদন্ত অধ্যাপক, বিবেককে-আফিম-খাইয়ে-মোহ্যমান শিল্পী, ঈষৎ ব্যসনভক্ত অভিনেতা-অভিনেত্রী, কারোরই তেমন অভাব নেই। ইত্যাকার চরিত্রের প্রসাদানুকূল্যে ইদানীং তাই অনেক মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে চেষ্টা চলছে ব্রেখ্‌টকে ভদ্রতার মুখোশ পরিয়ে কায়দা করার। মার্কিনি তত্ত্বাবধানে ব্লুমিংটনে-কলাম্বিয়ায়-কনেটিকটে-এবং-আরো-এখানে-ওখানে ব্রেখ্‌টের নতুন ব্যাখ্যান শুরু হয়েছে। ব্যাখ্যান, নবমূল্যায়ন, অন্তর্দৃষ্টিমণ্ডিত অপ-বা-উপবিশ্লেষণ, যা খুশি বলুন। যে-অর্থ আমরা সোজাসুজি সাধারণ বুদ্ধিতে ক'রে এসেছি, যে-অর্থ এতদিন স্বতঃসিদ্ধতার সমান্তরালতায় গৃহীত হয়েছে, যে-অর্থ নিয়ে এতদিন—অর্থাৎ ব্রেখ্‌টের বন্যা-বওয়ানো প্রভাববিস্তার অনুভূত হবার আগে পর্যন্ত—সন্দেহের সমস্যা দেখা দেয়নি, কী ক'রে তার সারাৎসার বদলে দেওয়া যেতে পারে তাই নিয়ে আপাতত ষড়যন্ত্র চলছে। সমাজবোধ নয়, তোমরা কিচ্ছু বুঝতে পারোনি, এই নাটকটি আসলে অমুক প্রতীকের খেলা; বিপ্লবের ডাক নয়, আসলে ঐ কবিতাটি কোনো ব্যক্তিগত মানসিক উপপ্লবের স্বাক্ষর বহন করছে; শ্রেণীসংগ্রামের উদ্বোধন নয় এখানে, এই পংক্তিগুলিতে হলিউডের গোষ্ঠীজীবনের হার-মানানো জটিলতা নিয়ে ব্রেখ্‌ট একটু তেরছা বিদ্রূপ ব্যক্ত করেছেন মাত্র। তাছাড়া, বিষয় নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন তোমাদের: ব্রেখ্‌টের নাট্যশৈলীর দিকে তাকাও, এপিক নাটকের লক্ষণগুলি মিলিয়ে দেখো, এদিকেই তো ভদ্রলোক জীবদ্দশায় বেশি দৃষ্টি দিয়ে গেছেন; নাটকের সঙ্গে সংগীতের মিশোল অনুধাবন করো, প্রণালী-পদ্ধতি-আঙ্গিক শেখো। এই নবমল্লিনাথদের মধ্যে যাঁরা আরো-একটু বেশি

অসমসাহসী, তাঁরা তারপর আরো-এক ধাপ এগিয়ে যান: তা বিষয়ের কথাই যদি বলো, তা হ'লে বলি, তোমরা এতদিন তেমনটি ভেবে দেখোনি, ব্রেখ্‌ট আসলে আশা-উজ্জ্বলতার কবি নন, বিষাদেরই কবি, তমিস্রার কবি। এই তমিস্রার কারণ, তা-ও বলি, হিটলার নন, নাৎসী জর্মেনী বা ধনকুবেরদের আমেরিকা নয়, প্রকৃতপক্ষে হতাশার উৎস সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির দিনযাপনের মলিন কুয়াসা। তবে কী দরকার এ-সমস্ত বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যে গিয়ে, ব্রেখ্‌ট হচ্ছেন কথকতার কবি, উচ্ছলতার জাদু-সাজিয়ে, তাঁর নাটক-কবিতার মধ্যে রাজনীতির ঘোলাটে তত্ত্ব অযথা কেন খুঁজতে যাওয়া? এসো, আমরা আপোষ করি। কষাইখানার সেন্ট জোন উপাখ্যানটির মানে হলো গিয়ে আমাদের সেই পুরোনো রূপকথার—সেই যে গো, এক কাঠকুড়ুনির মেয়ে—একটু ভোল-টোল পালটে নতুন সাজ দেওয়া, যাতে আধুনিক শ্রোতা-দর্শক-পাঠকের মন আঁকড়ানো যেতে পারে। আর যদি Die Mutter-এর কথাই তোলো, বোঝাই তো যাচ্ছে ব্রেখ্‌ট ও-ধরনের অপরিপক্ব, অর্থহীন অতিবিপ্লববাদে বিশ্বাস করতেন না।

দেখে-শুনে আমার মনে ভয় ঢুকেছে।

সমবেত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, আমি দুঃখিত, কিন্তু ব্রেখ্‌ট কদাপি ভদ্রলোক কবি ছিলেন না, এবং ভদ্রলোকদের জন্য কবিতা-গান-নাটক লিখতে তাঁর কোনোই উৎসাহ ছিল না। তাঁর কোনো লেখাই ভদ্র রচনা নয়, ভদ্দরলোকের জন্য রচিত নয়। ভদ্দরলোকদের গাল পাড়বার জন্যই তাঁর লেখার অবতারণা, ভদ্দরলোকদের ভণ্ড মুখোশটা টেনে খুলে ফেলে দিয়ে আসল, কদর্য, কামলোভাতুর রূপটা সভাসমক্ষে প্রমাণ করবার জন্যই ব্রেখ্‌ট ছড়া বেঁধেছেন, দৃশ্য ভেবেছেন, শৈলী নিয়ে চিন্তা করেছেন। টাকার প্রলেপে ঢেকে ব্রেখ্‌টকে রূপান্তরিত করা ততটা সহজসাধ্য নয়। তা হ'লেও আমার মনে ভয় ঢুকেছে; তার কারণ নীতিতে শ্লথতা এলে, আদর্শ সম্বন্ধে উপলব্ধির ধৃতি এলোমেলো হয়ে এলে, যে-কোনো গুজবেই কান পাততে হয়তো সাধ জাগবে। দু'পাশে তাকিয়ে যা দেখছি, ক্রমাগত দেখছি, ক্রমশ বেশি ক'রে দেখছি, তা থেকে তাই ভয়।

ব্রেখ্‌ট অশিষ্টাচারের কবি, ঘৃণা করতে ভালোবাসতেন তিনি। সবচেয়ে আগে তিনি আক্রমণ চালিয়েছেন যাঁদের ঘৃণা করতে ভালবাসতেন, সেই ভদ্র-লোকদের ভাষাকে। শিষ্ট, পরিশুদ্ধ, পরিশীলিত, পরিলম্বিত জর্মন ভাষাসৌকর্যকে তিনি মাচান থেকে আছড়ে মাটিতে ফেললেন, ধুলোর মধ্যে, নোংরা আবর্জনাস্তূপে।

জর্মন ভাষার স্থচারু ঐতিহ্যগত-অলংকারখচিত ভাষা মুখ থুবড়ে পাশে প'ড়ে রইলো, হঠাৎ ব্রেখ্‌টের কলমের খোঁচায় সাধারণ মানুষের সাধারণ বিনিময়-প্রতিবিনিময়ের ভাষা উজ্জীবন্ত রূপকাহিনী হয়ে উঠলো, খিস্তি-খেউড়ের ভাষার ডাল-পালা উতলা হলো, যা ছিল গালাগাল, তা-ই হয়ে উঠলো গান-কবিতা-নাটকের জাদু-ছোঁয়ানো-কথা-বলা। ব্রেখ্‌ট কবে কোথায় যেন বলেছিলেন, যত বেশি ভদ্রতা, তত বেশি ভড়ং। ভাষার ভড়ংটাকে খর্ব ক'রে এনে তিনি তাঁর উদ্ধত বিদ্রূপের প্রথম স্বাক্ষর রাখলেন।

কিন্তু ভাষার বিপ্লব নিতান্তই গৌণ সাফল্য। কী হবে ভদ্রলোকের ভাষাকে ভেঙে-চুরে তছনছ ক'রে, কী লাভ এই নঙর্থক অভিযানে, যদি না তারও পরে অন্য-কিছু ইতিহাসের প্রতিশ্রুতি থাকে, যদি না তারপর রচনার, গঠনের, নির্মাণের স্পষ্ট কথা বলা থাকে। লোকায়তে-নিয়ে-আসা ভাষাকে ব্রেখ্‌ট অবশ্যই ব্যবহার করলেন শ্রেণীসংগ্রামের নিহিতার্থে। রাখারাখি-ঢাকাঢুকি নেই, ঋজু-অনাড়ম্বর ভাষায়, খোঁচা দিয়ে, খোঁটা দিয়ে, ঘৃণা ঢেলে, ক্রোধের বিষ মিশিয়ে, তিনি কাতারে-কাতারে পংক্তি যোজনা করলেন, কবিতায়, নাটকে : পংক্তির সংখ্যা অজস্র, কিন্তু বাণীর সংহতি এক—মন্ত্রীদের, সেনাপতিদের, বড়োলোকদের বিশ্বাস নেই, তাদের ঘৃণা করতে শেখো, তাদের সংহারের মন্ত্র জপো, কারণ তারা তোমাকে-আমাকে স্বস্থ-সুন্দর জীবনযাপন করতে দেবে না, আমাদের পরিশ্রমের-তিতিক্ষার স্থযোগ নিয়ে তারা নিজেদের স্থবিধা গুছোবে; তাদের মনে পাপ, তাদের মনে আর মুখে বিস্তর সমুদ্রের ব্যবধান; স্থতরাং তাদের ঘৃণা করতে শেখো, বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের মধ্যে ঘৃণা ঢোকাও, ক্রোধের মধ্যে ঘৃণা ঢোকাও, এমনকি প্রেমিকাকে ভালোবাসার মুহূর্তেও ভুলে যেও না এই প্রেমকে বিষিয়ে তুলতে পারে যে-শ্রেণীশত্রুরা, তারা আশেপাশেই আছে, তাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব এখনো অসমাপ্ত; শ্রেণীসংগ্রাম বাদ দিয়ে মুক্তি নেই, কারণ প্রতারকরা নিজেদের ধর্ম ভুলতে পারে না।

Lehren Zufriedenheit.
Die, fuer die die Gabe bestimmt ist,
Verlangen Opfermut.
Die Sattgefressenen sprechen zu den Hungernden
Von den grossen Zeiten, die kommen werden,

Die das Reich in den Abgrund fuehren,
Nennen das Regieren Zu schwer
Fuer den einfachen Mann.

ভণ্ডেরা পরিতুষ্টির উপদেশ দেয়, নিবৃত্তির বাণী বিতরণ করে। আমরা কর দিই, ওরা সম্ভোগ করে; ওরা চর্বচোষ্য লেহন করে, আমরা উপোসী থাকি; পাটাতনে দাঁড়িয়ে পরিতৃপ্তিতে রোমন্থন করতে-করতে তারপর ওরাই আমাদের কাছে ভবিষ্যতের সোনালি দিনের কথা বলে; ওরাই দেশকে রসাতলের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ, কেয়াবাৎ খেল, এই ভণ্ড-অপদার্থের দল বার-বার ক'রে শোনায় রাষ্ট্রচালনার দায়িত্ব কঠিন, আমাদের মতো সাধারণ লোকের কম্মো নয়।

সুতরাং সংগ্রামের পথ ছাড়া গতি নেই, এবং সংগ্রামের সাফল্যের জন্য যে কোনো প্রকরণের ব্যবহারই আর্যপ্রয়োগ: হানো বজ্র, হানো বিদ্যুৎ, হানো ঘৃণা, হানো প্রতিহিংসা। তাছাড়া, আমাদের ভয় কীসের; নীতি আমাদের দিকে, ন্যায় আমাদের পক্ষে, বিবেক আমাদের দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করছে। যারা কাজ করে, যারা মায়া দিয়ে ভালোবাসে, যারা প্রাণমন দিয়ে লালন করে, এই পৃথিবীটা তাদের, মজুর-কৃষকদের, সৎশ্রমিক-চিন্তাশীলদের, কবির-কর্মীর-শিল্পীর। যারা খেটে খেতে জানে না, ভালোবাসার জন্য ঝুঁকি পোয়াতে যাদের আগ্রহ নেই, তাদের নয়; যারা পরের ধানে মই দিয়ে বেড়ায়, তাদের নয়। শৌখিন মার্কিন অধ্যাপকরা নিরুদ্বিগ্ন ঘুমোতে পারেন, কিন্তু ককেশীয় খড়িবৃত্তি কোনো আজবদেশের আজব বিচারপদ্ধতি নিয়ে রূপককাহিনী নয়, নাটকটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি ছোটো, গাঢ়, অখণ্ড নীতিকথার মর্ম বহন করছে: বংশপরিচয় উহ্য, যে বাঁচায়, যে মায়া করে, তারই সন্তানটির উপর অধিকতর অধিকার, সেই পরিচারিকার; উপস্থিত মুহূর্তে সিন্দুকের চাবি যার কাছে, টাকা তার নয়, যাদের-যাদের শ্রমে একদা এই সম্পদের সঞ্চার হয়েছিল, তাদেরই ভোগের উত্তরাধিকার।

এবং সে-অধিকার কেউ সন্তর্পণে হাতে তুলে দেবে না, তা ছিনিয়ে আনতে হবে, সংগ্রামের রক্তক্ষয়ী অভিজ্ঞতায় দীর্ণ হ'তে পারলেই তবে স্বাধীনতার অভিজ্ঞান। এই সংগ্রাম জনতার সংগ্রাম, জনতার পাশাপাশি, জনতার সার্বভৌমতা মেনে নিয়ে, জনতার পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে। সাধারণ মানুষকে বাদ দিয়ে, সাধারণ মানুষের মতামত-জিজ্ঞাসা-বিতর্ক-অভিযোগ এড়িয়ে সফল সংগ্রাম অসম্ভব।

জননায়ক নায়ক হন জনতার সুবাদে, জনতাকে ডিঙিয়ে নয়। যে-মুহূর্ত থেকে তিনি জনতা থেকে বিশ্লিষ্ট, আর জনতার নায়ক নন, সে-মুহূর্ত থেকে তিনি প্রতিবিপ্লবী, অতএব ঘৃণ্য, বধ্য, পরিত্যাজ্য : ব্রেখ্‌টে বার-বার এই প্রতীতির পুনর্ঘোষণা। শেক্‌স্‌পীয়রের কোরিওলেনাস তাঁর আদর্শের জাদুতে সম্পূর্ণ অন্য চেহারা নিল। এটিও অকপট নীতিকাহিনী : শ্রেণীসংহতি ছাড়া সত্য নেই, জনতানুগত্য ছাড়া সত্য নেই। যে-কোরিওলেনাসকে রোমের জনসাধারণ বীরোত্তম ব'লে বরণ করেছিল, শ্রেণীস্খলনের ফলে তার কী ভয়াবহ পরিণাম : সে শ্রেণী ত্যাগ করেছে, অতএব তাকেও সবাই ছেড়ে চ'লে যাবে, জননী-জায়া পর্যন্ত। ব্রেখ্‌ট আকারে-ইঙ্গিতে কথা-বলায় বিশ্বাস করতেন না, স্পষ্টতম উক্তিতে তাঁর ঘোষণা : শ্রেণীত্যাগের চেয়ে বড়ো পাপ আর নেই, এই কৃতঘ্নতার অতএব কোনো ক্ষমা নেই।

ব্রেখ্‌টের সূত্রে নীতিবিসর্জনেরও একই পরিণাম। আদর্শ নিয়ে আপোষ চলে না. বিশ্বাস নিয়ে আপোষ করতে গেলে আস্তে-আস্তে নৈতিক কাঠামোটিই ধ্ব'সে পড়ে। অন্ধতা এবং বিজ্ঞানের মধ্যে রফার জায়গা নেই, প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সাময়িক বোঝাপড়ার চেষ্টা করলে অচিরে একদিন প্রতিক্রিয়া আমাদের সত্তাকে সম্পূর্ণ গ্রাস ক'রে নেবে, শোধনবাদে সুতরাং মুক্তি পরাহত। গ্যালিলিও অত্যাচারের আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে স্বীয় আবিষ্কারের দাবি প্রত্যাহার করলেন ; কিন্তু যে-আদর্শ থেকে একবার বিচ্যুত হওয়া যায়, তাতে প্রত্যাবর্তন দুরূহ চিকীর্ষা। বরঞ্চ উল্টোটাই ঘটে। এক বিচ্যুতি দিয়ে যার শুরু, তাকে স্খলন থেকে স্খলনান্তরে ক্রমশই নেমে যেতে হয়। কারণ লোভের পথ পিচ্ছিল, এবং যার মন একবার দুর্বল হয়েছে, দুর্বলতায় তার প্রবৃত্তি সহজাত হয়ে আসে। গ্যালিলিওর মতো একদা-প্রতিভাশালীকেও তাই ধাপে-ধাপে স্খলিত হয়ে-হয়ে পরিশেষে মেষশাবকে পরিণত হ'তে হয়।

আত্মসমর্পণ নয়, সাময়িক পশ্চাদপসরণ নয়, সংগ্রাম, দ্বন্দ্ব, ঘৃণা, হিংসা, প্রতিহিংসা : এই মৌলিক সত্যগুলির বাইরে ব্রেখ্‌টের অন্য-কোনো তত্ত্ব নেই। তিনি ব্রাত্য হননি কোনোদিন, এমন-কোনো তথ্য নেই যা প্রমাণ করতে পারবে শ্রেণীসংগ্রামের আদর্শ সম্বন্ধে সামান্যতম সংশয়ও তাঁর মনে কোনোদিন জায়গা পেয়েছিল। তবে কি ব্রেখ্‌টের নাটকে-কবিতায় প্রেম নেই, মমতা নেই, স্নেহ নেই, ফুলের-আকাশের-গাছের-পাখির-মানুষের-পরিবেশের প্রতি ভালোবাসা নেই,

ব্রেখ্‌ট সম্বন্ধে অন্য যা-কিছু শোনা যায় সব ভুল? এই হেঁয়ালির জবাব ব্রেখ্‌ট নিজেই বিশদ ক'রে দিয়ে গেছেন। প্রেমের জন্যই আপাতত হিংসা, মমতার বশেই আপাতত যুদ্ধ, পৃথিবীতে-প্রকৃতিতে শান্তি যাতে উন্মোচিত-বিকশিত হয়ে একদিন ছড়িয়ে পড়তে পারে, সেই জন্যই শ্রেণীসংগ্রাম। প্রেম-প্রীতি-স্নেহ ইত্যাদি বৃত্তিগুলি পরিচর্যার জন্য প্রয়োজন কিছুটা জাগতিক সম্পদের, কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যের, পরিপূর্ণ মানসিক সুস্থতার। যতদিন এই সম্পদ, এই সাচ্ছল্য কতিপয় মুষ্টিমেয়ের করায়ত্ত, ততদিন পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ প্রেমের বাইরে প'ড়ে থাকবে। তাদের জন্য ছিনিয়ে আনতে হবে আনন্দ-ভালোবাসার-ভালো-থাকার আকর। অতএব প্রতিরোধ, অতএব শ্রেণীসংগ্রাম। গাছের শাখায় মঞ্জরী ঝুলে পড়েছে, তাতে অবশ্যই আনন্দের দ্যোতনা: কিন্তু রেডিওতে হিটলারের উন্মাদ প্রলাপের নির্ঘোষও তো সেই সঙ্গে। আপাতত মঞ্জরীকে বলা: একটু সবুর করো, তোমার কাছে আনন্দ পেতে আসবো, কিন্তু তার আগে ঐ উন্মাদকে সামলাতে হবে, নইলে সর্বনাশ।

আসলে ছোটোলোকদের প্রেমের কবি ব্রেখ্‌ট, প্রথম রচনা থেকে সর্বশেষ স্তবকবিন্যাস পর্যন্ত অবৈকল্য বজায় রেখে গেছেন। অতি আদিতে চ'লে গিয়ে স্মরণ করুন Die Dreigroschenoper-এ পলির সেই আবেগনির্ঝর গান। কার জন্য তার প্রেম, তার দেহ, তার কাব্যভরা উচ্ছ্বাস? টাকাওলা লোকেরা এলেন, গেলেন; শিষ্টাচারঠাসা লোকেরা, জাহাজের মালিক-সদাগরি লোকেরা, ফর্সা জামাকাপড়-পরা লোকেরা; আকাশে স্বপ্নালু চাঁদ, সমুদ্র থরোথরো, তবু প্রতিবারই পলিকে বলতে হয় 'না'; যেহেতু সব-কিছু সম্পূর্ণ-নিটোল-নিখুঁত, তাকে বলতেই হয়, 'না'। কিন্তু তারপর

Jedoch eines Tags, und der Tag, der war blau
Kam einer, der mich nicht bat,
Und er haengte seinen Hut an den Nagel in meiner Kammer
Und ich wusste nicht mehr, was ich tat.
Und als er kein Geld hatte,
Uud als er nicht nett war,
Und sein Kragen war auch am Sonntag nicht rein,
Und als er nicht wusste, was sich bei einer Dame schickt,

Zu ihm sagte ich nicht "Nein".
Da behielt ich meinen Kopf nicht oben,
Und blieb nicht allgemein.
Ach, es schien der Mond die ganze Nacht
Ach, es ward das Boot am Ufer losgemacht,
Und es konnte gar nicht anders sein !
Ja, da musst ich mich doch einfach hinlegen
Ja, da konnt ich doch nicht kalt und herzlos sein.
Ja, da musste es doch geschehen.
Ach, da gab's ueberhaupt kein Nein.

তারপর একদিন, ভারি চমৎকার ছিল সেই দিনটা, একজন এলো, সে কোনো কথা বললো না, টুপিটা ঘরে ঢুকে টাঙিয়ে রাখলো, তার টাকাকড়ি ছিল না, ভদ্রতার কোনো কেতা জানতো না সে, নোংরা, এমনকি রবিবারেও ময়লা জামাকাপড় প'রে থাকতো, সেই তাকে—যে ভদ্র নয়, শিষ্ট নয়, ধনী নয়, পরিচ্ছন্ন নয়, যেহেতু সে এসব কিছু নয়—পলি প্রত্যাখ্যান করতে পারলো না। পলি ঘাড় ফিরিয়ে রইলো না, কাছে এলো, আকাশে চাঁদ, সমুদ্রে তরঙ্গ, যাকে দেওয়ার, পলি তাকে হৃদয়প্রেম সব দিয়ে দিল, দিয়ে শান্ত হলো, পরিপূর্ত হলো।

ব্রেখ্‌টের সম্পূর্ণ সাধনাতে এই একই পরিপূর্তি : যাদের কিছু নেই, তাদের প্রেম দিতে পারার আনন্দ, তাদের জন্য যুদ্ধ করার অহংকারগর্ব। এই গর্বগৌরব-অহংকারের উজ্জ্বলতার বাইরে ব্রেখ্‌টের অন্য-কোনো পরিচয় নেই।

মার্ক্স, সার্ত্র, শ্রীমতী বোভোয়া

কিছুদিন আগে বৃটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন জঁ-পল সার্ত্রের সঙ্গে একটি বেতার-আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন। সার্ত্র অধুনা তাঁর আত্মজীবনী লিখছেন, প্রসঙ্গ সে-প্রস্থানভূমি থেকে শুরু ক'রে সমকালীন দর্শন-সাহিত্যের অনেকগুলি প্রান্তর ছুঁয়ে-ছুঁয়ে আসে, যা বিশেষ ক'রে চমক লাগিয়ে দেয় তা সার্ত্রের বার-বার ক'রে পুনরুক্ত প্রত্যয় যে তিনিও মার্ক্সপন্থী।

ঠাণ্ডাযুদ্ধের যে-সমস্ত লড়াইবাজরা ১৯৫৩ সালের ভিয়েনা শান্তি সম্মেলনের সময় থেকেই সার্ত্র সম্বন্ধে হতাশ হয়ে আছেন, তাদের মনে অবশ্যই বিস্ময়ের প্রবাহ বইবে না। বরঞ্চ, আলতো বিশ্লেষণে তাঁদের কাছে এটাই মনে হবে, হাঙ্গেরীর ব্যাপার নিয়ে হুল্লোড়-বাঁধানো সার্ত্রের পক্ষে নতুন ক'রে পথজিজ্ঞাসার ইঙ্গিত নয়—পিকাসো এবং আরাগঁ-ও তো সে-গলাবাজিতে ক্ষীণগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন —নেহাতই সাময়িক সচেতনতাস্খলন; লাভক্ষতির বিচার ক'রে সার্ত্র এখন ফের কমিউনিজমের ভাবনা-ডুবোনো মাদকতায় ডুবে-যাওয়ার সুযোগ খুঁজছেন।

তন্নিষ্ঠমন এই সরল উপাখ্যানে সায় দেবে না। *L'Existentialisme et un humanisme*-এর পরিশিষ্টে সাভিলের সঙ্গে সার্ত্রের বিতর্কের মূল সূত্রগুলি মনে আনলে তাঁর সাম্প্রতিকতম উক্তিকে রাজনৈতিক ব্যাখ্যায় কাঠামোয় যুক্তি-শুদ্ধ ক'রে নেওয়ার চেষ্টা বিপরীত ধোঁকার সৃষ্টি করবে মাত্র। যদিও Les Mains Sales-এর অভিনয় বন্ধ ক'রে দিতে তিনি রাজি হয়েছিলেন, সৃজনের সমস্ত ইতিহাসকে তা হ'লেও ইচ্ছার ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না; সার্ত্রের

[1] Translated by Hazel E. Barnes. Methuen & Co., London. 50s

চিন্তার সাক্ষ্য বহন ক'রে আছে তাঁর পুঞ্জিত রচনাবলী, গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ-বিতর্ক, *Les Temps Modernes*-এর পুরোনো-সব সংখ্যা। যদি এমনও মেনে নেওয়া হয় যে ইতরজনদের কাণাঘুষোই ঠিক, দার্শনিক সার্ত্র সম্প্রতি রাজনীতির বিষাক্ত-বিবিক্ত সমুদ্রে আত্মহত্যায় উন্মত্ত, সে-ক্ষেত্রেও এ-আপাতবিকারের কারণ খুঁজতে হবে, এবং তার জন্য সার্ত্রের রচনার পর্যালোচনাই শ্রেয়তম পথ।

তবে কি অস্তিত্ববাদের প্রথম স্ফুরণ থেকেই মার্ক্সীয় চিন্তার রাহু ছায়া ফেলে আছে? কোন্ সূত্রের স্বল্পতম নির্ভরে সে-সেতুবন্ধন যা আজ সার্ত্রকে ঘোষণা করতে বাধ্য করায় যে মার্ক্সকে ছাড়িয়ে কোনো ভাষ্য নেই, বিচার নেই, যুক্তিগঠন নেই? তাঁর প্রধান দর্শন প্রণয়ন *L' Etre le Neant*-এর সদ্য-প্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ *Being and Nothingness* সার্ত্রীয় দর্শনের বিশদ পুনর্বিশ্লেষণের চমৎকার সুযোগ এনে দিয়েছে।

সত্তাই অস্তি, সত্তার বাইরে কেবলই শূন্যতা: অস্তিত্ববাদের মূল কথা, অন্তত হিদেগারের ধারার ঐতিহ্য বহন ক'রে সার্ত্রীয় দর্শনে যা সংস্থিত হয়েছে, এই প্রাথমিক অনুশাসনের শরীর আশ্রয় ক'রে। আমি আছি, আমি স্বয়ম্ভু, আমার বাইরে যা-যা, তা আমার সত্তার স্ফুরণের পক্ষে অকেজো, অবান্তর। আমার বর্তমান আমার অতীতের প্রতিফলন, আমার ভবিষ্যৎ আমার বর্তমানের কল্পনা-যোজনা-জিজ্ঞাসার সংশ্লেষণ থেকেই জাত হবে। আমার সত্তা এক, আমার সত্তা শূন্যতার মধ্যে একটি দ্বীপ বাইরের হাওয়া তাকে আন্দোলিত করতে পারে না, বাইরের আবেগ তাকে মহাদেশ কিংবা মহাসমুদ্রের সন্ধান দিতে পারে না, কোনো চিন্তার বিদ্যুৎ আমার সত্তাকে শিহরিত করবে না, কলুষিত করবে না। আমার সত্তা অজেয়, আমার সত্তা বহিঃপ্রকৃতির অভিভাবের বাইরে।

তা-ই যদি হয়, সত্তার কোনো সহকার থাকতে পারে না। সমাজ, দেশ, সখ্য, এ-সমস্তই মানুষের স্বেচ্ছাকৃত শৃঙ্খল, কিন্তু জীবনের নিয়ামক নয়। মানবিক অনুশাসন মিথ্যে, সামাজিক সংজ্ঞাদি অলীক, এমনকি বন্ধুতার আনুগত্য পর্যন্ত সত্তার খেয়ালখুশির উপর। সত্তা থেকে সত্তান্তরে, অস্তিত্ব থেকে অন্য-এক অস্তিত্বে, এক বিশেষ অবস্থা থেকে অন্য-এক অবস্থার আবহে অহরহ আমার অভিযাত্রা, কিন্তু তাতে বাইরের কোনো অঙ্গুলিহেলন নেই। সিদ্ধান্তগুলি আমার, অঙ্কুর থেকে উদ্গম, উদ্গম থেকে বৃদ্ধি, বৃদ্ধির পর বিকাশ: অস্তিত্বের প্রতি ধাপেই আমি চিন্তা করছি, ব্যক্ত করছি, গঠন করছি, ভাঙছি, নিজেকে

প্লাবনে ভাসাচ্ছি, আগুনে পোড়াচ্ছি। যে-কোনো মুহূর্তে আমি আমার গতি বদলে দিতে পারি, ব্যক্তিগত পরিসংখ্যানে বিপ্লব আনতে পারি, প্রথাকে উপহাসে মিলিয়ে দিতে পারি।

বলা হবে, এ তো নৈরাজ্যের ভাষণ, অণুর বিবৃতি। মার্ক্সীয় দর্শনের সার-সত্য সমষ্টি, অণু-উপনিষদের খণ্ডন। মার্ক্স যেখানে পুঞ্জ ও সংহতি নিয়ে ন্যায় প্রণয়ন করেছেন, সার্ত্র সেখানে ভগ্নাংশবিলাসিতায় মগ্ন। সার্ত্রীয় দর্শনের মূল বিভক্তি সমষ্টিকে অস্বীকার, অতএব মার্ক্সের পুরোপুরি প্রতীপ। এ-দুই প্রত্যন্ত চিন্তার মধ্যে তা হ'লে সাযুজ্যের সুযোগ কোথায়, সামান্যতম সৌষম্য খুঁজে পাওয়াও তো সম্ভবপরতার অন্য পারে?

কিন্তু না-হয় আরেকটু ভেবে দেখা যাক। বিভক্তির প্রসঙ্গ পাশে সরিয়ে রাখলে, সার্ত্রের চিন্তাবিন্যাসও ভূতচৈতন্যবাদকে আশ্রয় ক'রে। যুক্তির যে-চূড়ান্ত সরলীকরণ মার্ক্সীয় অন্বীক্ষায় আশ্চর্য তীক্ষ্ণতা পেয়েছে, সার্ত্রেও তার স্পষ্ট আভাস বর্তমান। তাছাড়া, মার্ক্সের কাঠামোতেও বহিঃপ্রকৃতির জায়গা নেই। সমাজ বিবর্তিত হয়, এক পরিষঙ্গ থেকে পরবর্তী প্রস্থানে এগিয়ে চলে নিজের তাগিদে, অন্তর্লীন দ্বন্দ্বের পীড়নে। প্রকৃতি-পুরুষ কাহিনী সমাজের ক্ষেত্রেও উহ্য, উপমান-উপমেয় দিয়ে অলঙ্করণ করতে হ'লে বলতে হয় সমাজই পুরুষ, সমাজই প্রকৃতি। সমাজে ক্লেশের সংকট আছে, আত্মজিজ্ঞাসার আর্তনাদও অনুপস্থিত নয়: পুঞ্জ-পুঞ্জ ক'রে শক্তি-প্রতিশক্তির বিরোধ শীর্ষের দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে, অতঃপর একদিন বিস্ফোরণ হয়ে দেখা দেয়। তার ফলে সমাজ এক স্তর থেকে নতুন-আরেক স্তরসন্ধিতে ভারসাম্য আবিষ্কার করে। সমাজের এই অহরহ চিত্তশুদ্ধিতে অথচ বিধাতার ভূমিকা নেই, অন্য-কোনো বহিঃশক্তির প্ররোচনা নেই। সার্ত্রের সত্তার মতো, সমাজও স্বয়ম্ভু। মার্ক্সীয় সংস্থার প্রধান চমৎকারিতাই হলো এই আন্বীক্ষিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা। কাঠামো তথা বস্তুর সারাৎসারে অস্তিত্ববাদের লক্ষণাদিও অনুরূপ।

এই সমান্তরলতা উপেক্ষণীয় নয়। নিছক ন্যায়ের দিক থেকে দেখলে মনে না-হ'য়েই পারে না মার্ক্সীয় দর্শনের প্রজ্ঞাটুকু নিয়ে কেউ যেন অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করছিলেন, হঠাৎ হাত থেকে প'ড়ে গিয়ে টুকরো-টুকরো চূর্ণ-চূর্ণ হয়ে গেল তা, সার্ত্র তার একটি ভগ্নকণা কুড়িয়ে নিলেন। অখণ্ডর চেতনায় যে-প্রক্রিয়া কাজ করছিল, অখণ্ডেও তা থেকে ব্যভিচার হলো না। কিন্তু সত্তার পরিধি

ছোটো হয়ে এলো এবার, সমষ্টির শপথ বর্জন ক'রে দর্শন ব্যক্তির ভর পেলো। যা ছিল সমাজবিবর্তনের একচ্ছত্র বিজয়ী কাহিনী, কীরকম সংকীর্ণ-বিশীর্ণ হয়ে এলো তার রূপকল্প-পটভূমি-পরিসর, সত্তা তার লোকাতীত এককত্বে স্তম্ভিত হয়ে এলো।

সার্ত্রীয় দর্শনে সংকট তাই প্রায় প্রথম থেকেই অপ্রতিরোধ্য। দুটো যথেষ্ট ভিন্ন কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, মনে হয় প্রায় প্রত্যেক দর্শনই কিছু পরিমাণে জাতিস্মর। সার্ত্রীয় প্রজ্ঞার পক্ষেও শেষ পর্যন্ত মার্ক্সীয় অন্বীক্ষার জন্মঋণ শোধ না-ক'রে উপায় নেই। অথচ অন্য পক্ষে সত্তা ও চিন্তার ধর্মই হলো প্রাক্তন অধিস্থান সম্বন্ধে গ্লানিবোধ, ঐতিহ্যকে অস্বীকার। কিছুটা গ্রীক চিন্তার প্রলেপ লাগিয়ে এটাও বলা চলে, যে-অখণ্ড দর্শনের ভূমণ্ডল থেকে বিশ্লিষ্ট হওয়ার ফলে অস্তিত্ববাদের স্বতন্ত্র স্ফুরণ, তাঁর প্রসঙ্গে কর্ণমূলভ একটি অনীহা গ'ড়ে ওঠাও বিচিত্র ব্যাপার নয়। মার্ক্সীয় দর্শন সম্বন্ধে সার্ত্রের রচনাবলীতে তাই জায়গায় জায়গায় দ্বিধা, অস্থিরতা. এমনকি স্ববিরোধিতা পর্যন্ত পরিকীর্ণ হয়ে আছে : এই দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা থেকে অস্তিত্ববাদের মুক্তির আশা পরাহত। উপরিলিখিত বেতার-আলোচনায় সার্ত্রের স্বীকৃতি—মার্ক্সের সংজ্ঞা থেকে পশ্চাদপসরণ অসম্ভব—তাই সাময়িক বিভ্রম নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রেরণাসঞ্জাতও নয়, বরঞ্চ পরিপৃক্ত উপলব্ধিরই বিবেকদংশন।

সংকটের অন্য কারণের জন্য আরো জটিলে প্রবেশ করতে হয়। এখানেও অবশ্য জন্মের প্রসঙ্গের মধ্যেই সমস্যার গ্রন্থিগুলি বিধৃত হয়ে আছে। যেহেতু মার্ক্সের চিন্তা সমাজসমষ্টি নিয়ে বিস্তার পেয়েছে, তাতে কোনো জায়গাতেই নৈরাশ্য বা সর্বনাশের দ্যোতনা ছায়া ফেলেনি। সমাজে ঘুণ ধরবে, বিরোধী শক্তিতে সংঘর্ষ বাঁধবে, গুঁড়ো হয়ে যাবে পুরোনো কাঠামো, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে সামাজিক মানুষ নতুন স্তরে উঠে যাবে, মহত্তর সমাজের সৃষ্টি হবে, প্রগতির রথ-ঘর্ঘর বন্ধ হবে না। সমাজের চিত্তশুদ্ধি ক্ষণিকের আবেগ নয়, তা চিরন্তন অন্তঃপ্রবণতা; মানুষের, সমাজের অপ্রতিহত মহত্ত্বসিদ্ধির প্রয়াসও অতএব এক শেষহীন অভিযাত্রা। মানুষের সিদ্ধির শেষ নেই, মহত্ত্বের শেষ নেই : মার্ক্সীয় দর্শনের এটাই প্রধান, পরম বাণী।

সার্ত্রীয় সংস্থানে পৌঁছুলে অনুশাসন-অধিকরণ সব-কিছু চূড়ান্ত বদলে যায়। শুধু তার নিজের সত্তা নিয়ে মানুষ একা; সে নির্জন, একাকী একদিকে, অন্য পারে

পৃথিবীর অন্য-সমস্ত মানুষ, অন্য-সমস্ত মানুষের সত্তা, দেহ। নিজেকে নিয়ে নিমগ্ন হয়ে থাকাই তার দায়িত্ব, অন্য সমস্ত-কিছু উপেক্ষা ক'রে। নিজের সত্তার নির্ভরে দাঁড়িয়ে সে-ও প্রগতি খোঁজে। কী সেই প্রগতির প্রকৃতি, সত্তা তার একাকিত্ব নিয়ে কী জয় করবে, নবতর কোন্ উপনিবেশে নিজেকে বিস্তার করবে? আমার চেতনা, আমার দেহ: সত্তার মাত্র এই দুই অস্ত্র, দুই মধ্যবর্তিতা। কিছুদূর পর্যন্ত আমার চেতনাকে আমি শোধিত, শাণিত ক'রে তুলতে পারি। কিন্তু, আমার একাকিত্বের প্রেক্ষিতে, সে-চেষ্টায় একটি বিশেষ সীমা অতিক্রম ক'রে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার চেতনাকে যদি আরো শালীন ও উন্নত করতে চাই, অন্য সত্তার গহনে আমাকে প্রবেশ করতে হবে, অন্য চেতনাকে পরাভূত ক'রে আমার চেতনার প্রয়োজনে লাগাতে হবে। তেমনি, আমার নিজের দেহের চরম উপলব্ধিতে পৌঁছুতে হ'লে অন্য দেহের অভিজ্ঞানে অবগাহিত হ'তে হবে, দেহ থেকে দেহান্তরে উত্তাপের স্নিগ্ধতা অন্বেষণ করতে হবে।

কিন্তু ঠিক এখানেই অস্তিত্ববাদের প্রচণ্ড পরাভব। কারণ হাজার চেষ্টা করলেও অন্যের সত্তা আমার হবার নয়, অন্যের চেতনা আমার অভিজ্ঞানের বাইরে। কিছুদূর এগিয়ে তাই প্রতিহত হয়ে ফিরতে হয়, সামনে নিশ্ছিদ্র গুহার অন্ধকার। তাছাড়া, দেহের মধ্যবর্তিতায় আত্মবিস্তারের প্রয়াসও অসফল হ'তে বাধ্য; যেখানে দেহের অভিজ্ঞতায় চেতনার সমাস নেই, সত্তার উত্তাপ সেখানে অবশ্যই অনুপস্থিত। দেহের-পর-দেহে বিহার ক'রে-ক'রে শেষ পর্যন্ত তাই অভিভূত অবসাদ নিয়েই প্রত্যাবর্তন করতে হয়।

সুতরাং অস্তিত্ববাদের অন্তিম মুক্তি ব্যর্থতাবোধে, হতাশার খিন্নতায়। তার সত্তা নিয়ে, সত্তাভরা সাহস নিয়ে মানুষ পৃথিবীর পথে এসে দাঁড়ায়, পৃথিবীজয়ের, প্রকৃতিজয়ের বাসনায় তার চোখের অঞ্জন ছাওয়া। সে সৃষ্টি করতে চায়, নিজেকে উন্নততর কোনো সোপানে উত্তীর্ণ করতে চায়; সত্তা থেকে সত্তান্তরে, চেতনা থেকে চেতনান্তরে, দেহ থেকে দেহান্তরে তার তৃষ্ণা। কিন্তু যে-একাকিত্ব তার গর্ব ছিল, তা-ই অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। যদিও তার চেষ্টায় ত্রুটি নেই, লক্ষ্য তার কাছে মরীচিকাপ্রতিম হয়েই থাকবে। বড়ো জোর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র ভাষায় আমরা বলতে পারি 'রাহুগ্রস্ত হ'লেও, সে আমাদের নমস্য', কিন্তু সে-শ্রদ্ধার অর্ঘ্যে সত্তার প্রভূত আত্মধিক্কার কাটবে না।

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, সার্ত্রের নিজের এবং সার্ত্র-প্রভাবিত অন্যান্য

লেখকদের কাহিনীবিন্যাসে যৌনসম্পর্ক ও সংগম-প্রক্রিয়ার প্রলম্বিত, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ বিকারপ্রিয়তা থেকে উদ্ভূত নয়, তার বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা আছে। চেতনার বহির্বিজয়ের গণ্ডি যেখানে নিষ্ঠুররকম সংক্ষিপ্ত, একমাত্র দেহের সাহায্যেই সে-অবস্থায় সত্তার ভূপর্যটন সম্ভব। সুতরাং এ-পর্যটনের বর্ণনায় কৃপণতা বারণ। শুধু দেহ দিয়েই যতটুকু সম্ভব নিজেকে বিস্তার করতে পারছি আমি, এ-ই আমার সৃষ্টি, এ-ই আমার মহত্ত্বের ভূমিকা; অতএব আমাকে বিস্তার ক'রে বলতে দাও, বাধা দিও না, এ আমার ক্ষীণজয়ের কাহিনী, যে-কাহিনী শেষ হয়ে গেলে ফের শূন্যতা, এমনকি যে-কাহিনীরও পরিশেষ সেই একই শূন্যতায়।

সন্দেহ হয়, সার্ত্র ও তাঁর প্রত্যক্ষ অনুসরণকারীদের কাছে অস্তিত্ববাদের অন্তিম কুয়াশা বহুদিন থেকেই উৎকর্ণ জিজ্ঞাসারূপে উপস্থিত হয়েছে। তা হ'লে কি সত্তার ঘোষণা, এককত্বের তূর্য নিনাদ শেষ পর্যন্ত শুধু নেতির তমিস্রাতেই পৌঁছে দিতে সক্ষম? সৃষ্টির অন্য-কোনো রূপবিভঙ্গ নেই, ইতিহাস অথবা সমাজবিজ্ঞানের নতুন-কোনো সম্ভাবনা নেই? এই যে-নতুন দর্শন, সত্তার সংস্থানে যার গর্ব, তাকে তো ফলিত বিচারের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা ক'রে নিতে হবে। ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজসংস্থা, মানবিক সম্পর্কের সর্ববিধ প্রসঙ্গ, অস্তিত্ববাদের প্রস্থানে এদের যদি আলাদা রূপ না-দেওয়া যায়, তা হ'লে তো সে দর্শন ব্যবহারিক অর্থেই ব্যর্থ হয়ে গেল।

অস্তিত্ববাদীরা কোন্ দিকে মুখ ফেরাবেন তা হ'লে? তাদের আহৃত প্রজ্ঞায় পথনির্দেশ নেই, অন্তত যেটুকু আছে তা আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সমাজকে অবহেলা ক'রে কাটিয়ে যাওয়া অসম্ভব, রাজনীতির নির্ঘোষও মুখোমুখি প্রত্যক্ষতা। সত্তার নিঃসঙ্গ অঙ্গন থেকে বেরিয়ে সমষ্টির সীমান্তে এসে হাত মেলাতেই হবে, একাকিত্বের বিপন্ন পিপাসা অন্যথা মেটবার নয়। আত্মদর্শনে যদি মুক্তির সন্ধান নেই, বাধ্য হয়েই অন্য অনুস্মৃতি খুঁজতে হয় তখন। অস্তিত্ববাদীরা অবশ্য এ-ধরনের সমর্পণকে চরম ব'লে মনে করবেন না, শুধু বলবেন ভগ্নাংশিক বোঝা-পড়া। কিন্তু বিশেষণে কী-ই বা এসে যায়: এ-সত্য থেকে পলায়নের উপায় নেই যে অস্তিত্ববাদ এক স্তম্ভিত উপত্যকায় এসে উপনীত হয়েছে, এখান থেকে কোন্ দিকে ফের উদ্দাম হওয়া সমীচীন, তা নিয়ে আপাতত অনেকরকম কলরোল, একদা-সহযাত্রীদের বহুধা বিভাগ।

সার্ত্র ও ক্যামু-র পথ পৃথক হয়ে যাওয়ার কারণও এই সংকটের আবর্ত। রাজনীতির ক্ষেত্রে সার্ত্র যে-কারণে কমিউনিস্ট পার্টির দিঙ নির্দেশ কয়েক বছর আগে মেনে নিয়েছিলেন, ক্যামু-ও সমান্তরাল বিশ্লেষণ ক'রে দক্ষিণচক্রে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন। হয়তো এমন বললে অপভাষণ হবে না যে অস্তিত্ববাদের প্রধান দুই পুরোহিত যে পারস্পরিক মতামত-পরিপন্থী দুই রাজনৈতিক সংস্থার ছায়াশ্রয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন সেটা যত বিস্ময়ের, তার চেয়েও অনেক বড়ো প্রশ্নদ্যোতক এ-ব্যাপার যে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তাঁদের নিতেই হলো। সার্ত্র আরাগঁ-র পাশে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে আসছেন, এটাই যাঁদের প্রধান দুঃখ, তাঁরা অস্তিত্ববাদের গভীরতর সংকটের সারমর্ম কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি।

শ্রীমতী সীমন দ্য বোভোয়ার ছ'শো পৃষ্ঠাব্যাপী উপন্যাস *Les Mandarins** অস্তিত্ববাদের অন্তর্লীন উতরোলের আশ্চর্য-উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি বহন করছে। স্থান পারী, কাল আজ থেকে বছর দশেক আগেকার পটভূমিকা, কমরেড তোরেজকে সবেমাত্র মন্ত্রিত্ব থেকে অপসারিত করা হয়েছে—কি হয়নি—, পাত্রপাত্রীরা প্রায়-অধিকাংশই সাহিত্য-রাজনীতির সদর-অন্দর প্রব্রজ্যা ক'রে থাকে। দার্শনিক দক্রই ও সাহিত্যিক আঁরি, দক্রইয়ের উপন্যাসলেখিকা স্ত্রী এ্যান, কন্যা নাদিন, যে যুদ্ধের মধ্যে কিশোরবয়সের প্রেমিককে হারিয়ে এখন সে-জ্বালার প্রতিষেধক হিশেবে পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে গমন করতে ভালোবাসে, আঁরির পুরোনো প্রেমিকা পলা, যে আঁরির অস্তিত্ব নিজের সত্তার মধ্যে পুরোপুরি ভ'রে রাখতে চায়। আরো-অনেক চরিত্রের আনা-যাওয়া, টানাপোড়েন, দ্বন্দ্ব, সংঘাত, আকর্ষণ-বিকর্ষণ। সাধারণ উপন্যাস হ'লে সম্ভবত এত ভিড়ে হাঁপিয়ে উঠবার উপক্রম হতো, কিন্তু শ্রীমতী বোভোয়ার বই নিমগ্নতায় আঁকড়ে ধরে, এমনকি ক্বচিৎ-অন্যমনস্কতা পর্যন্ত অপরা প্রসঙ্গ ব'লে মনে হয়।

উপাখ্যান-অংশ সবিস্তারে বিবৃত করার বিশেষ সার্থকতা নেই, কারণ কাহিনীর ভূমিকা দৃষ্টান্তের পরিধিতে সীমিত, কখনোই প্রধান নয়। ব্যক্তিগত বিশ্বাস, নীতি, প্রচিন্তা, যুক্তিসংস্থা, যে-সব বৃত্তিকে অক্ষৌহিণী ব'লে অস্তিত্ববাদীরা বিবেচনা ক'রে থাকেন, তাদের সাহায্য নিয়ে কিছুদিন পর্যন্ত হয়তো পরিশুদ্ধ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু একদিন-না-একদিন শ্রান্তির ঢল নামবেই।

* Translated by Leonard M. Friedman. World Publishing Company, Cleveland and New York. $ 7·50

দরুই ও আঁরিতে মিলে রাজনীতি-বহির্ভূত স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠনের প্রয়াস শেষ পর্যন্ত ফুৎকারে মিলালো, আঁরির পত্রিকা *l' Espoir*-ও ঠিক সে-কারণেই নির্বাপিত হয়ে এলো। মার্ক্সবাদের সামাজিক অনুশাসনগুলি মানা হবে, অথচ কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক নেতৃত্ব সর্বস্বীকার্য নয়, এই দ্বৈত সিদ্ধান্তের অস্তিত্ববাদী অঙ্গীকার বাইরের চাপ সহ্য করতে পারার মতো নিজস্ব শক্তি সঞ্চয় করতে পারে না। ফলে ডাইনে-বাঁয়ে দুদিক থেকেই চাপ আসে, চাতুরী ও হঠকারিতার প্রলোভন, সত্তা তার নিঃসঙ্গতা নিয়ে বহুবল্লভ হয়ে উঠতে পারে না, তার স্থিতির সন্ধানও তাই অসফল হ'তে বাধ্য। নিজের সত্তা খানিক বিনিময় না-করলে অন্যরা তাদের সত্তা আমার অধীনে গচ্ছিত রাখতে রাজি হবে না; অথচ আমার দর্শন আমাকে এ-বিনিময়ের অনুশাসন শেখায়নি, অতএব ব্যর্থতার হাত থেকে নিস্তার নেই।

সবাইকেই প্রতিহত হয়ে আসতে হয়। পলা শুধু আঁরির সত্তা নিংড়ে-নিংড়ে পেতে চেয়েছিল, নিজের মনে আকাশকুসুম রচনা ক'রে ভেবেছিল তার নিজের সত্তায় আঁরির সত্তা পুরে ফেলতে পারবে, দুই অস্তিত্বকে এক ক'রে দেবে সে। করুণরকম ব্যর্থ হলো সে, কারণ আঁরির সত্তা পরাভূত হ'তে রাজি নয়, অহরহ বহুগমনে বরঞ্চ সে আশ্বস্ত হ'তে চায়, নিজেকে বোঝাতে চায় এখনো সে নিজের নিয়তি। অন্য পক্ষে পলাও যেদিন বুঝতে পারলো আঁরির সত্তা সুদূর-পরাহত, নিঃশেষে সব স্মৃতি মুছে ফেললো সে চেতনা থেকে; যার আর-কোনো সম্বল নেই, সে শুধু নিজের সত্তাটুকু নিয়ে নিভৃত হয়ে রইলো।

ব্যর্থতা আঁরিরও। পত্রিকাচালনা ও রাজনীতির কথা ছেড়ে দিলেও, আরো নানা ক্ষুদ্রতর পরিসরে তাকে রক্তের ইঙ্গিতের বাইরে বোঝাপড়া করতে হয়। কোনো-এক দিকে স্বাধীনতা ব্যক্ত করতে গেলে অন্য-এক কোণ থেকে টান পড়ে, পত্রিকার আয়ু বাড়াবার প্রয়োজনে মিথ্যে সাক্ষ্য দিতে হয়, রাজনৈতিক বিশ্বাসের চাপে প'ড়ে শঠতার সঙ্গ সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই, বাৎসল্যের বশে বিবেক-বিরোধী পাপ ক্ষমা ক'রে যেতে হয়। সত্তার বিভিন্ন বশ্যতার মধ্যে সংঘাত প্রতি মুহূর্তে চেতনাকে খণ্ডবিখণ্ড করে দিচ্ছে, এ-প্রতিদ্বন্দ্বে কোন্ পক্ষে [illegible] হ'লে তার অঙ্গীকার, স্বাধীনতার স্বরূপ তা হ'লে কী? যদি বলা হয় প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তই স্বতন্ত্র, সার্বভৌম, তা হ'লে কোনোক্রমে জোড়াতালি দিয়ে দর্শনের অন্তর্নিহিত মর্ম বজায় রয়েছে সে-দাবি করা চলে অবশ্য, কিন্তু চিত্তশান্তি হয় কি? নাদিনকে

বিয়ে ক'রে গার্হস্থ্যে নেমে আসার সিদ্ধান্তটি বড়ো, না কি তার আগেকার অবিচলিত মনোভাবই সত্য ?

অথবা এ্যানের কথাও ধরা যেতে পারে। মহীরুহের মতো উদার স্বামী, এ্যানের রক্তে তবু চঞ্চলতা, নিজের সত্তার উপর তার অধিকার অখণ্ড আছে মাত্র এটুকু প্রমাণ করবার জন্যে স্ক্রিয়াসিনের সঙ্গে হোটেলের ঘরে সংগম ক'রে আসতে তার আপত্তি নেই, কিন্তু এই অস্থিরতার সংস্থানে নীড় ভাঙাই সম্ভব, নতুন ক'রে কিছু গ'ড়ে তোলা যায় না। সেজন্যই তার মার্কিন প্রেমিক পর্যন্ত, তার উত্তাল সম্মোহন সত্ত্বেও, এ্যানকে ধ'রে রাখতে পারলো না। ভয় দুদিকেই : সত্তাকে বিসর্জন দিতে রাজি নয় এ্যান ; তাছাড়া, যে-মুহূর্তে পারস্পরিক আবেগে সামান্য সংহতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, সে-সংহতি সম্বন্ধেও তার আশঙ্কা, সে তো বহির্চক্রান্তে ধরা প'ড়ে যাচ্ছে না ?

একমাত্র দব্রুই চরিত্রে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি অবৈকল্য বজায় আছে। এটা পিতৃ-প্রবণতার প্রতীক কিনা তা তর্কসাপেক্ষ। তবে পরাস্ত-পর্যুদস্ত-নিঃশেষিত হয়ে আঁরি, নাদিন, এ্যান, সবাই-ই যে দব্রুইয়ের আনুগত্যে ফিরে আসে, সে-প্রচ্ছন্ন সংকেতের আকর্ষণ কম নয়। রাজনীতিতে প্রতিহত হয়ে দব্রুইও তেমনি নিজের পড়ার ঘরের অখণ্ড শান্তিতে ফিরে এসেছিল। তবে কি অস্তিত্ববাদ, আঁরি-দব্রুইয়ের গোষ্ঠীগঠনের প্রয়াস, সত্তার শপথে বাহু-মেলতে-চাওয়া, ইত্যাকার আরো নানা আকৃতি, সব-কিছুই একদিন শান্ত হয়ে আসবে, শ্রান্ত হয়ে আসবে ? তারা তখন তা হ'লে সত্তার জীর্ণ জিজ্ঞাসাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে ফিরে যাবে মহীরুহের ছায়ায়, মার্ক্সীয় দর্শনের বিশাল সমুদ্রে, কমিউনিস্ট পার্টির মসৃণ সংশ্লেষণে ? সত্তাকে যদি সৃষ্টিশীল হ'তে হয়, সমষ্টির সামগ্রিক প্রত্যয় মেনে নিয়েই তবে তা হ'লে ?

শ্রীমতী বোভোয়ার উপন্যাসে এ-প্রশ্নের উত্থাপন আছে, স্পষ্ট মীমাংসা নেই। সার্ত্রের সাম্প্রতিক রচনাদিতেও আপাতত একই জিজ্ঞাসা। একক সত্তা ও সমাজচেতনার মধ্যে সেতুযোজনার উৎকণ্ঠায় অস্তিত্ববাদের প্রহর কাটছে ; ইতিমধ্যে হয়তো প্রবাহ আরো আরক্ত হবে।

বুদ্ধি, মেধা, মেরী ম্যাকার্থি

হাল্কা পাঠ্যবস্তুতে আস্তে-আস্তে পৃথিবী ছেয়ে যাচ্ছে। এটা প্রায় প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ীই হচ্ছে। মার্কিনি অর্থানুকূল্যে দেশের-পর-দেশ টিকে আছে—কাতারে-কাতারে মার্কিনি ধনবিজ্ঞানী-সমাজতাত্ত্বিক-সমাজসেবক-মনীষী-কূটনৈতিক-পণ্ডিত-মূর্খ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছেন। মার্কিনি যন্ত্রপাতি, মার্কিনি ছবি, ইংরেজি ভাষার অগ্রগামী মার্কিনি বিকৃতি। মার্কিনি জীবনযাত্রার মূল দর্শনের সূত্র ঋজুতাকে আশ্রয় ক'রে—সব-কিছুকে আমি-ভালো-তুমি-নিকষ-মন্দ-র পর্যায়ে ঠেলে নামাতে হবে, সোজা ক'রে আসল কথাটি নিবেদন করতে হবে, তাতে যদি হৃদয়গহনের সূক্ষ্ম, সন্তর্পিত উচ্চারণগুলি ধরা না-পড়ে, ক্ষতি নেই ; চিন্তার ব্যাপ্তি যদি কমিয়ে আনতে হয়, তা হ'লেও বিষণ্ণতা অবান্তর।

তার মানে অবশ্য এই নয় যে চিন্তার উৎকর্ষ, কল্পনার তেপান্তরবৃত্তি মার্কিন দেশে শেষ হয়ে এসেছে। কুড়ি কোটি লোকের মস্ত বড়ো দেশ, প্রাচুর্য সর্বত্র উপচে পড়ছে : বাইরের পৃথিবীর স্থূলবোধআচরণঅভিক্ষেপ পাশে সরিয়ে রেখে অনুপাতে-স্বল্পসংখ্যক বৈজ্ঞানিক এখনো মহৎ গবেষণা করছেন, তন্নিষ্ঠ সাহিত্য-দর্শনকাব্যচর্চাও অনুপস্থিত নয়। স্রেফ সংখ্যাতত্ত্বের সিদ্ধান্ত থেকেই এটা ব'লে দেওয়া যায় যে মনীষা তথা অন্বীক্ষার ঊর্ধ্বমানের কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই—সাধারণ বিচারবুদ্ধি যতই স্থূল হ'য়ে আসুক না কেন, অসাধারণত্ব সব-সময়েই পরিমাপের বাইরে।

কিন্তু মুশকিল হলো শতকরা সাতানব্বুইদের নিয়ে যে-সমাজ তা নিতান্তই শাদামাটা, দুঃসহরকম ভোঁতা। এবং যে-মার্কিনি প্রতিভাস ভিতরে-বাইরে বিকিরিত হচ্ছে, তা এই সাতানব্বুইদের সমাজের। খোলা, চটকদার ছবিওলা

বই, যা এক নিশ্বাসে প'ড়ে ফেলা যায়; ব্যাকরণ পেরিয়ে-আসা ভাষ্যবিন্যাস, যা একেবারে-হালে-মার্কিন-দেশে-উপনীত পোল-ইতালীয়-চেক-স্লাভ-সুইডিশ যে-কেউ চট্ ক'রে বুঝে নিতে পারে; ইতিহাস ও নীতিচর্চায় এমন-এক দেশজ সরলতা যাতে উত্তম-অধমের অতিরিক্ত কোনো ভাবনানুষঙ্গ নেই; কাব্য যেখানে লংফেলো-রবর্ট ফ্রস্টের বন্ধনী ছাপিয়ে উপ্‌চে ওঠার অনুমতি পায় না; মঞ্চাভিনয় ভদেভিলের শাসন ডিঙিয়ে খুব বড়ো জোর মিউসিক্যালের অঙ্গনে পৌঁছে হাঁপাতে শুরু করে; গল্পসাহিত্যের নামে যেখানে অশুদ্ধ, সস্তা বুকনিভারাতুর ইংরেজিতে বহুশত পৃষ্ঠাব্যাপী প্রলাপকথন চলে।

হয়তো এ-বিষয় নিয়ে আক্ষেপের সমারোহ অযৌক্তিক। লোকায়ত এবং লোকোত্তরের দ্বন্দ্বে লোকোত্তর ক্রমশ পিছুপা হবে। প্রায়নিরক্ষরদের সংখ্যাধিক্য ঘটলে এক ধরনের প্রায়নিরক্ষর সাহিত্যও সৃষ্টি হ'তে বাধ্য। একবারে হালে মার্কিনদেশে সাহিত্যের অছিলায় অনেকরকম কণ্ডূয়ন হচ্ছে: কবিতায়-গল্পে-প্রবন্ধে। দুটো লক্ষণ প্রধানত চোখে পড়ে: এক, অধিকাংশ সাহিত্যব্রতীর প্রায়-অবিশ্বাস্য প্রাকরণিক (এবং ব্যাকরণিক) দৌর্বল্য; দুই, সমস্ত রচনার মধ্যে একটি অপ্রচ্ছন্ন বিক্ষিপ্তভাব, যার ফলে, উদাহরণত, উপন্যাসের ভূমিকা এক সংস্থানে শুরু হ'য়ে হঠাৎ গ্রহান্তরে চ'লে যায়; কাব্যে টুকরো-টুকরো নৈরাজ্য, আঁটোসাঁটো ছন্দের দীর্ঘস্থায়ী প্রয়াস কদাচিৎ লক্ষ্য হয়; প্রবন্ধ যা-ও দু'একটি লেখা হয়, প্রায়ই তত্ত্বজর্জর প্রলাপের বিকল্প।

শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যুগপৎ এই সারল্যানুসৃষ্টি এবং ঈষদস্থিরতা মার্কিন-দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। চিত্রকলায় প্রাকরণিক পূর্বকুশলতা উৎক্ষিপ্ত, চোখ-ধাঁধানো পটাঙ্কনের দিকে আপাতত লোকায়ত আসক্তি। দর্শনচিন্তা সাংবাদিকতার স্তরে এসে ঠেকেছে: সমাজের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে বছরে দুটো-তিনটে ক'রে বই লিখছেন ভাড়াটে সাংবাদিকেরা, এবং সে-সব বই হু-হু ক'রে কাটছে। টাইপ নিয়ে গল্প, টাইপ কী ক'রে হয়, তার ব্যাখ্যার জন্য উপন্যাস: এই প্রাথমিক পার্থক্যটুকু পর্যন্ত অবলুপ্ত। প্রায় যে-কেউই উপন্যাসের ভাণ ক'রে এক হাজার পৃষ্ঠা জুড়ে ব্যাপ্তি খুঁজছেন, কিন্তু, মাঝে-মাঝেই মনে হয়, এমনকি প্রথম পৃষ্ঠাটুকুও সৃষ্টির প্রয়োজনের বহির্ভূত প্রয়াস।

উজ্জ্বলতার অনুসন্ধানে কোন্ দিকে তাকাবো তা হ'লে? মার্কিনদেশের ফসলে আপাতত আমাদের উদরপূর্তি হচ্ছে, মার্কিনিদের কাছে যন্ত্রপাতি-কাঁচামাল-অন্যান্য

তৈজস অনেক-কিছুর জন্যই হাত পাততে হচ্ছে। সুতরাং আশা বলুন, আশঙ্কা বলুন, শিগ্‌গিরই আমাদের শিক্ষায়-আচরণে-অভিক্ষেপে রঙ-বেরঙ চোখে পড়বে। অবশ্য প্রায় ছ'লক্ষ গ্রামে ধুঁকে-পুকে বেঁচে-থাকা ভূমিহীন কৃষিজীবী-মজুরচাষিদের মধ্যে এই তরঙ্গ পৌঁছুবে না, নগরে-বন্দরে অগুন্তি নিম্নবিত্তরাও হয়তো অস্পর্শিত থাকবেন। কিন্তু শহুরে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের চোখে মার্কিনি নেশার অঞ্জন লাগবেই, জাতীয় পরিকল্পনাদির ফিকিরে হালে বেশ-খানিকটা পয়সা করেছেন সেরকম মধ্যবিত্ত-উচ্চমধ্যবিত্তরাও বাদ যাবেন না, সদাগরি দপ্তরের কর্মচারী-সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ-চিকিৎসক-আইনজ্ঞ-অধ্যাপক অনেকেরই মনে-ব্যবহারে দোলার চমক লাগবে। গোপাল বড়ো সুবোধ বালক, যা পায় তা-ই খায়: আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের গোপালরা খুব বেশিদিন অচঞ্চল থাকতে পারবেন ব'লে মনে হয় না। ইতিমধ্যেই ড্রেনপাইপ পাৎলুন, ট্যুইস্ট নৃত্যসংগীত, মার্কিন চুটকি পত্রিকা, অখ্যাত-অজ্ঞান মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঝালরওলা খেতাব, ইত্যাদির প্রসারে হকচকিয়ে যেতে হয়। মান অপরগতি, কাল অস্থির। অন্য সময়ের তুলাদণ্ডে যে-সামগ্রী অপকৃষ্ট বিবেচিত হতো, তা-ই এখন দেশের সাক্ষর শ্রেণীর কাছে পরমগ্রহণীয় মনে হচ্ছে।

যেহেতু এই অয়নবৃত্তের মধ্যে আমরা ধরা প'ড়ে গেছি, সাহিত্যের স্বাদ আমাদের এখন হয়তো অধিকাংশ সময়ে *Time*-পত্রিকার শেষের তিন-চারটি পৃষ্ঠা উল্টে মেটাতে হবে, এই পত্রিকাটির, কিংবা সমগোত্রীয় অন্য-কোনো খবরকাগজের, বিচারের কষ্টিপাথরে নিজেদের বিবেচনাকে বিন্যস্ত করতে হবে। বোধহয় খুব-একটা পরিশীলিত-পরিশ্রমী চেষ্টারও দরকার নেই: চোখের সামনে যে-প্রতিম্ব দেখবো, দিনের-পর-দিন যে-রুচির প্রচার শুনবো, যে-আদর্শকে রাজাসনে অধিষ্ঠিত করার অনুজ্ঞা পাবো, এমনই মানুষের আত্মসমর্পণকাতরতা, অচিরে মনের, রুচির, আদর্শের গড়নও অনুরূপ পরিবর্তিত হবে। ফলে *New Yorker*-এর মতো উজ্জ্বল-ঝকঝকে-সুসংস্কৃত পত্রিকা প'ড়ে আমাদের আনন্দ ব্যাহত হবে, আমরা শ্রীযুক্ত লুসের লঘুরসচটুল মহলের ঘরানা হবো। হেমিংওয়ে-পাঠে আর তেমন নেশা হবে না, জন হার্সি-গোছের কোনো লেখকের যুদ্ধ-কাহিনী নিয়ে পড়বো; লাওনেল ট্রিলিং কিংবা এডমাণ্ড উইলসনের সাহিত্য-বিচারে আর আস্থা থাকবে না, দেখবো রীডর্স ডাইজেস্টে কে কী লিখেছেন।

এই অপকৃষ্ট-আসক্তির সমারোহে, ধ'রেই নেওয়া চলে, শ্রীমতী মেরী ম্যাকার্থি

অপঠিত থেকে যাবেন। ওরকম ঝলোমলো গদ্য, ওরকম শিক্ষিত কৌতুক, ওরকম নির্দয় ব্যঙ্গ, কাছে টানতে পারে না, লোককে ছিটকে গণ্ডির বাইরে ফেলে দেয়। এত বুদ্ধির দীপ্তি, যা মেয়েলি অথচ যা মনীষার ধারে প্রখর, শ্রীমতী ভার্জিনিয়া উল্‌ফের রচনায় ইতিপূর্বে পাওয়া গেছে, কিন্তু এক হিশেবে শ্রীমতী ম্যাকার্থির গদ্য আরো-বেশি সার্থক : শ্রীমতী উল্‌ফের গদ্যে কবিতার কিঙ্কিণী-মূর্ছনা যথেষ্টই ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে আরো যা ছিল তা অস্বাস্থ্য-ছড়ানো এক প্রলাপঅস্থিরতা। মেরী ম্যাকার্থির লেখায় সেরকম কোনো প্রলাপের প্রলেপ নেই, তাঁর গদ্য তাই উচ্ছল-ছলোছলো তটিনীরোল, যে-নদীতে অথচ চিন্তার গভীরতর জলকেলি। এই গদ্য প্রেমিকার মতো কাছে টানে, বন্ধুর মতো আলোচনায় জড়ায়, ওস্তাদের গানের লয়ের মতো হঠাৎ কোনো সুদূরে তুলে নিয়ে যায়। অত্যন্ত ঘরোয়া শব্দাবলী, যেন সিগারেটের ধোঁয়ার অন্তরালে পড়শী মেয়েটি বসিয়ে যাচ্ছে, অথচ যে-মুহূর্তে শব্দ-স্থপতি শেষ হলো, টনক নড়লো আমাদের, দ্রুত ঘাড় তুলে আমরা মেয়েটির মুখের দিকে তাকালাম : এ মেয়ে তো যে-সে মেয়ে নয়, একসঙ্গে রাজনীতি কপচাচ্ছে, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছে, শ্রীমতী সীমন দ্য বোভোয়াকে একহাত নিচ্ছে, মার্কিন সমাজের বিভিন্ন স্তরের কুশ্রীতা-হীনতা-অন্ধতা নিশানা ক'রে ব্যঙ্গের ফুলঝুরি ঝরাচ্ছে, এরই ফাঁকে-ফাঁকে কিন্‌সী রিপোর্টের সিদ্ধান্তাদি নিয়ে তুখোড় টিপ্পনি, গান্ধিজির মৃত্যুতে বিষাদার্ঘ্য, সেনেটর ম্যাকার্থির উদ্ভাববিশ্লেষণ। যে-ভাষাকে মনে হয় কবিতা, তার যে এত প্রকার ব্যবহার সম্ভব, এমন সচ্ছন্দ দ্রুত তালে বিষয়-থেকে-বিষয়ান্তরে প্রব্রজ্যা সম্ভব, এই উপলব্ধির আনন্দ অনেক।

অথচ ঠিক সেই ভাষাই আবার খানিক বাদে কথকতায় ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। এমন-অনেক প্রবন্ধ মেরী ম্যাকার্থি লিখেছেন, যেগুলিকে অনায়াসেই গল্প ব'লে চালিয়ে দেওয়া যায়, এবং এমন-অনেক গল্প, যেগুলিকে বলা চলে রসে-বিষাদে-মেশানো স্মৃতিচারণ। কয়েক বছর আগে *Memories of a Catholic Girlhood*[১] নাম দিয়ে তিনি একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলেন : সত্য এবং কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে আশ্চর্য-উজ্জ্বল পর-পর অনেকগুলি চিত্রের সমাবেশ। ফিকে-হয়ে-আসা স্মৃতি, তার শরীরে কিছু-কিছু কবিতার কথা-বলা; যা মনে

১ Harcourt, Bruce & Company, New York. $ 3.95

পড়ে না, অনুপূর্ব-মনে-থাকা দৃশ্যগুলির সঙ্গে কল্পনার বুনোন জুড়ে নতুন-ধারা এক মাধুরী-সমাবেশ। এই বয়নশিল্প সারা হবার পর আরেক দফা তারপর লেখিকার নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার পালা: প্রতি কাহিনীর শুরুতে—নয় তো শেষে—পাঠককে সতর্ক ক'রে দেওয়া কতটুকু ছোঁওয়া, কতটুকু কথা, সব-মিলিয়ে কতটুকু ভাবনা-কাঁপানো মনের আল্‌পনা। যেন এক মেরী আরেক মেরীকে তর্জনী তুলে শাসাচ্ছে, 'এখানে তুমি স্রেফ গুলতাপ্‌পি দিচ্ছো, ঐ গল্পটাতে তোমাকে যে-প্রথম চুমু খেয়েছিল, তাকে তুমি ইচ্ছে ক'রে কেটে দিয়েছো। আর এখানটায় নিজেকে তুমি বাহাদুরি দেওয়ার চেষ্টা করছো, আসলে যা ঘটেছিল তা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরকম...'।

যোগ-বিয়োগের বোঝাপড়ায় পাঠকদের মস্ত লাভ এই যে যে-বই গোড়াতে ছিল নিতান্তই কয়েকটি খাপছাড়া গল্পের সমষ্টি, তা রূপান্তরিত হলো, পিতৃমাতৃহীন অপাপবিদ্ধা একটি বালিকা কী ক'রে অনেকগুলি নির্মোকের মধ্য দিয়ে গিয়ে সবশেষে, সতেরো বছরের জাদুমুহূর্তে, ভাসার কলেজের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছুলো, তার আশ্চর্য-নিটোল এক প্রবহমান চিত্রকল্প আমাদের কাছে উন্মীলিত হলো। নিজেকে নিয়ে লেখা কাহিনীতে অনেক সময় একটা খুঁত ঢুকে যায়: আবেগে অপক্ষপাত বজায় রাখা দুরূহ হ'য়ে পড়ে। কিন্তু যেহেতু শ্রীমতী ম্যাকার্থি নিজেই নিজের সমালোচক, এবং সমালোচনাতে কোনো স্থান-কিংবা-সময়চ্ছেদ ঘটেনি—কোথাও আপাতঅবৈকল্যবিচ্যুতি ঘটলে সঙ্গে-সঙ্গে মন্তব্য যোগ ক'রে দেওয়া হয়েছে—,যা দোষের হ'তে পারতো তা অধিকতর মাধুরীরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

সেজন্যই, *Memories of a Catholic Girlhood*-এর ভগ্নাংশগুলি পাঠান্তে, সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত মেরী ম্যাকার্থিকে অত্যন্ত পরিচিত ব'লে মনে হয়, তাঁর ইহুদি-জাতা প্রসাধনবিলাসিনী দিদিমাকে পরিষ্কারভাবে চোখের সামনে দেখতে পাই, কনভেণ্টের মেয়েদের আর মাদার সুপিরিয়রকে আমাদের আলাপিতা ব'লে ধ'রে নেওয়া চলে প্রায়, Medicine Springs-গ্রামের ছেলেপাগল মেয়েদুটির সঙ্গেও যেন কোথায় আলাপ হয়েছিল এমন মনে হয়। শ্রীমতী ম্যাকার্থির লেখার হাত কী ক'রে স্কুলজীবনে আস্তে-আস্তে পাকা হলো, সাহিত্যে প্রীতি কী ক'রে সমস্ত সত্তা বেয়ে সঞ্চারিত হলো, ভাষার প্রতি নিবিড়-অন্ধ প্রেম জড়ো হ'তে-হ'তে হঠাৎ কী ক'রে একদিন উদ্দামতা পেলো, প্রতিটি ধাপ গুণে তার

পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিবৃত্ত এখন আমাদের জানা। এবং স্কুল পেরোবার পর, সীঅ্যাট্‌লের সেই প্রত্যন্ত পরিবেশ ঝেড়ে ফেলে স্বপ্ন-দিয়ে-তৈরি পূর্বপ্রান্তিক ভাসার কলেজে পড়তে যাওয়ার মনোবলই বা কী ক'রে শ্রীমতী ম্যাকার্থি জড়ো করলেন, তা-ও আমরা *Memories* পাঠ ক'রে জেনে নিতে পারলাম।

অতঃপর ভাসার, সুন্দরী, শৌখিন, বড়োলোকদের ফ্যাশান-বানানো বুদ্ধি-ঝলমল কন্যকাতে-ছাওয়া ভাসার। শ্রীমতী ম্যাকার্থির প্রবন্ধসংগ্রহ *On the Contrary*[২]-তে ভাসার কলেজের মেয়েদের নিয়ে একটি রচনা আছে ('The Vassar Girl')। রচনাটি কিছু স্মৃতিরোমন্থন, কিছু সমাজবিশ্লেষণ। ভাসারের অধিকাংশ ছাত্রী বিত্তবান ঘর থেকে; যাদের সেরকম কুলপরিচয় নেই, তারা পড়াশুনোয় মেধাবী, বৃত্তি পেয়ে প্রবেশ করে। সজাগ চোখ, সজীব মন, রাজনীতিচর্চায় নয় তো অভিনয়কলায় নয় তো অন্য-কোনো নেশায় সর্বদা ঘোর-লাগা অবস্থা মেয়েদের: ছাত্রীথাকাকালীন পর্যায়ে প্রত্যেককে দেখেই মনে হয় দশ বছর বাদে কোনো-না-কোনো ক্ষেত্রে একটা মস্ত-কিছু হবে—হয় সাহিত্যিকা, নয় অভিনেত্রী, অথবা ওয়েইটম্যান-কাপে-খেলতে-পারা টেনিস খেলোয়াড়, বা রাজনীতিতে-ঢুকে সমাজবিপ্লবের-বন্যা-বওয়ানো জননায়িকা। ভাসারের সমস্ত অঙ্গন ছেয়ে এই প্রতিশ্রুতির মর্মর: হাওয়ার এমন-এক গুণ, পরিবেশে এমন-এক ধার যে কোনো মেয়েকেই তুচ্ছ মনে হয় না, প্রতিভাহীনতার প্রসঙ্গ যেন অবান্তর। সমস্ত পৃথিবী ঐ চারটি বছরের সীমাসময়ের মধ্যে যেন প্রত্যেকটি ভাসার ছাত্রীর কাছে অবনত হয়ে আসে: হে মেয়ে, প্রণতি গ্রহণ করো, ক'রে ধন্য করো সব-কিছুকে, তোমার জন্য সব-কিছুই তো প্রস্তুত।

তবে বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে, আঠারো-উনিশ বছরের উদ্ভিন্ন-যৌবনা মার্কিন মেয়েরা ভাসার-হাণ্টার-স্মিথ-ওয়েলেস্‌লী ধরনের কলেজের মুক্ত অঙ্গনে। ঋতুশেষ হ'লে প্রতিভাতে মরচে ধরে, উনিশ বছরে হাডসন নদীর ধারে পিকনিক করতে গিয়ে যাকে অসম্ভব প্রতিভাবতী মনে হয়েছিল, কয়েক বছর বাদে নিউ ইয়র্ক শহরের সাবওয়েতে, কিংবা ক্লীভল্যাণ্ডে কোনো সুপার-মার্কেটে অপরাহ্নিক বাজার-করার মুহূর্তে, তাকে নির্বাপিত মনে হয়, সাধারণ মনে হয়, হয়তো বা এমনকি নিরেট মনে হয়। শ্রীমতী ম্যাকার্থি হিশেব দাখিল ক'রে

২ Farrar, Strauss & Cudahy, New York. $ 3.95

বলছেন, আসলে, অধিকাংশ মেয়েদের পক্ষে, ভাসারে গেলেও যা, না-গেলেও তাই। উত্তরজীবনে ভাসারের প্রলেপ তেমন-কিছু লেগে থাকে না: 'a census was taken, and it was discovered that the average Vassar graduate had two-plus children and was married to a Republican lawyer' (*On the Contrary*, ২০০ পৃষ্ঠা)। এতদ্‌সত্ত্বেও যে-ক'টি প্রাক্তন ভাসারকন্যা যশোমতী হিশেবে পরে নাম কুড়োন, তাঁরা স্বয়ংবৃত্তা, তাঁদের গৌরবে ভাসারের খ্যাতির বহর বাড়ে, কিন্তু সে-গৌরবে পোকীপ্‌সির এই মেয়ে-কলেজের আদৌ অধিকার নেই।

তা হ'লে ভাসারে গিয়ে মেয়েরা কী পায়, পরিবেশের উজ্জ্বল-কজ্জল মোহিনী-মায়া যে-বৈভব ছড়ায়, তার মূল্য কতটুকু? শ্রীমতী ম্যাকার্থি, স্পষ্টই বোঝা যায়, বেশ কয়েক বছর ধ'রে সমস্যাটি নিয়ে ভেবেছেন। আগেই যা বলেছি, চিন্তার মেয়েলিমার জন্য তিনি আদপেই লজ্জিতা নয়, তাঁর মানসিক গণিতগঠনে এধরনের মিতাক্ষর-দায়ভাগ সমস্যা বড়ো জায়গা দখল ক'রে আছে। *Memories*-এর পর, ভাসার-জীবন নিয়ে রচিত উপন্যাস *The Groves of Academe*-র পর, শ্রীমতী ম্যাকার্থিকে তাই প্রাকৃতিক তাগিদেই উত্তর-ভাসার জীবনের প্রসঙ্গে কোনো না-কোনো একদিন ভাষ্য লিখতে হতো। তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস, *The Group*,[৩] মনে হয় সেই ভাষ্য।

শ্রীমতী ম্যাকার্থি এখানে নিজেকে সামান্য আড়ালে রেখেছেন, তা হ'লেও অনুমান করা সহজ যে উপন্যাসটির মারফৎ আরেকবার স্মৃতিচারণের মহড়া চলছে, নিজের ফেলে-আসা-বিশেষ দিনগুলিকে কিছুটা ভালোবাসা, কিছুটা ঠাট্টা করা, কিছুটা হয়তো বা বিচার করা। *The Group* ভাসার থেকে পাশ-ক'রে-বেরোনো আটটি মেয়ের কাহিনী, স্থান প্রধানত নিউ ইয়র্ক শহর, কাল ধরা চলে ১৯৩৩ সাল থেকে শুরু ক'রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধবার প্রাক্কাল। মার্কিনদেশে সে-এক অদ্ভুত সময় গেছে: বহু প্রবন্ধে বহু গল্পে মেরী ম্যাকার্থি বিপ্লবের ছোঁয়া-লাগা প্রেমরক্ত সেই বছরগুলির বর্ণনা দিয়েছেন, ভাসার থেকে সদ্য-বেরিয়ে-আসা তিনি, সাহিত্যিকা, রাজনীতিভক্ত, প্রেমিকটি হয়তো শখের অভিনেতা, আর মনে সহস্র সংকল্পকল্পনায় সহস্র অশ্বমেধের উদ্দামতা। আর্থিক মন্দায় চুপ্‌সে

৩ Weidenfeld and Nicolson, London. 18s.

আছে গোটা মার্কিন দেশ, শিল্পপতিদের মধ্যে হাহাকার, এমন সময় আশার মশাল আকাশে উঁচিয়ে রাষ্ট্রপতি রোজভেল্টের অনুপ্রবেশ। সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত-কিছু অন্যরকম হয়ে গেলো ; New Deal-এর দুর্মর আশার নির্ভরে শিল্পী শ্রমিক-কবি-রাজপুরুষ-অভিনেতা-কারুকর্মী সবাই অভিনব অভিজ্ঞানে ব্যাপৃত হলেন। পুরোনো কাঠামো আর না, পুরোনো দর্শন-রাজনীতি-ধনবিজ্ঞান মেকি প্রমাণিত হয়ে গেছে, এবার নতুন ক'রে পৃথিবী গড়ার পালা। রাজনীতিতে মার্কসবাদ আর তার অসংখ্য বিস্ফারিত অলিগলি, যৌনসম্পর্কে শ্রীমতী মেরী স্টোপ্‌স অথবা স্টেখেল, সাহিত্যে বা চিত্রকলায় দুঃসাহসী প্রাকরণিক প্রসঙ্গান্তর। কী উজ্জীবন্ত প্রাণবন্ত ছিল মার্কিনদেশ এই অল্প-কয়েকটি বছর : যুদ্ধোত্তর নির্জীব-হ'য়ে-আসা জুজুবুড়ির-ভয়ভীত রীতিসংকীর্ণ বর্তমানের মার্কিন দেশের সঙ্গে সেই সোচ্চার মিছিলের দিনগুলির কোনোরকম যোগসূত্রই নেই। সাম্প্রতিকতার কোনো প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত উপন্যাসটিতে নেই, কিন্তু নেই ব'লেই তিরিশ বছর আগেকার পুরোনো উজ্জ্বলতার স্মৃতিকে এতটা দ্যুতি নিয়ে বিকিরিত হ'তে দেখে চমকে উঠতে হয়।

The Group-এর শুরু তাদের আটজনের এক জনের বিবাহানুষ্ঠানে, শেষ কয়েক বছর বাদে সেই মেয়েটিরই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজনের ভিড়ের মধ্যে। ইতিমধ্যে চোখে-প্রগাঢ়-নীলিমা-নিয়ে-বেরিয়ে-আসা ভাসার কলেজের সেই আট-জন ঘর বেঁধেছে, ভেঙেছে ; ছবি এঁকেছে, ছবি আঁকা ছেড়েছে ; প্রেমে পড়েছে, প্রেম থেকে পালিয়েছে ; পারিবারিক অনুশাসন পেরিয়ে ভিন্নরকম হবার চেষ্টা করেছে, হয়তো সামান্য সফল হয়েছে, নয় তো হয়নি ; পৃথিবীকে আবিষ্কার করতে বেরিয়েছে, পৃথিবীদ্বারা প্রতিহত হয়ে ফিরেছে, নয় তো পৃথিবীর রলরোলের সঙ্গে সন্ধি করতে শিখে এসেছে ; সমাজবিপ্লবের কথা ভেবেছে, কার্যত মাত্র প্রেমিক থেকে প্রেমিকান্তরে গমন করেছে, অথবা যৌনবোধের বিষয়ান্তরে। এই কাহিনীর বিস্তারে কৌতুক আছে, ঝিকিমিকি রোদ্দুর আছে, অথচ বুকে-চেপে-বসা অসাফল্যের বেদনার গ্লানিও অনুপস্থিত নয়। আটজন যে-আলাদা-আলাদা স্বপ্ন নিয়ে ভাসার কলেজের ফাটক পেরিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, সেই স্বপ্নগুলি কেমন বিকিরিত-বিস্ফারিত-বিচূর্ণিত হ'তে-হ'তে অপরাপর ধূসর শরীরে বিলীন হয়ে গেলো, তার মমতা-মাখানো বৃত্তান্ত শ্রীমতী ম্যাকার্থির এই কাহিনী। কাহিনীটিতে তেমন-একটা অখণ্ডতা যে আছে তা নয় : এক অধ্যায় থেকে পরের অধ্যায়ের

সেতুবন্ধন মোটামুটি শিথিল, কিন্তু ক্ষতি হয়নি তাতে, হয়তো এই শিথিলতাই তির্যক বিন্যাসে প্রমাণ শেখায় যে ইচ্ছার সঙ্গে স্বপ্নের, স্বপ্নের সঙ্গে সৃষ্টির সম্বন্ধও এলায়িতশিথিল।

শ্রীমতী ম্যাকার্থি বোধহয় আরো-একটা কথা বলতে চাইছেন। কৈশোর-প্রথম যৌবনের আদর্শগুলি অধিকাংশই ধোপে টেঁকে না: আমরা অহরহ বদলাচ্ছি, কিছুটা জ্ঞানের পরিধি বৃহত্তর হচ্ছে ব'লে, কিছুটা আবেগের অভিজ্ঞতায় দীর্ণ হচ্ছি ব'লে। অনেক পথ হেঁটে, অনেক কাদা-কাশবন অতিক্রম ক'রে মাঝে-মাঝে হয়তো নিজেকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়: কী হলো এত সব ক'রে, হঠাৎ কোথা দিয়ে কোথায় এলাম, এর কোনো দরকার ছিল কি, এই আকৃতির, আকাঙ্ক্ষার, অতৃপ্ত বাসনার, অপূর্ণ স্বপ্নের? মানুষকে বুঝতে চাই, ব্যথা দিয়ে চ'লে আসি; পৃথিবীকে অন্যরকম ক'রে গড়তে চাই, পৃথিবীই আমাকে বদলে দিয়ে পিষ্ট ক'রে চ'লে যায়। সব-মিলিয়ে তা হ'লে এই বেদনার, এই অশান্তির সার্থকতা কোথায়? শ্রীমতী ম্যাকার্থি এই প্রশ্নের উত্তর প্রায় অস্তিত্ব-বাদের আশ্রয় থেকে দিচ্ছেন: সার্থকতা অভিজ্ঞতার গহনে, এই কান্নার-ব্যর্থতার-কৌতুকের-অচরিতার্থতায়-মেনে-নেওয়ার মধ্যে; ভাসারের নীলিমা একদিন চোখ থেকে মিলিয়ে যাবে, তারপর মধ্যাহ্নের স্নেহস্বচ্ছতা; এই স্বচ্ছতার স্বাদই জীবনবোধ।

শ্রীমতী ম্যাকার্থি পঞ্চাশ পেরিয়েছেন: ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধেছে, থেমেছে, যুদ্ধোত্তর পর্বে মার্কিনদেশের একদা-স্বপ্নালু সমাজ অনুশাসনে নির্জীব হয়ে এসেছে; ভাসার-থেকে পাশ-করা মেয়েরা হয়তো এখন আর নিষিদ্ধ স্বপ্ন দেখে না, স্বপ্নের সঙ্গে কর্মের, কল্পনার সঙ্গে সৃষ্টির অসেতুসম্ভব পরম্পরা সুতরাং হয়তো তাদের আর চকিত ক'রে আনে না; হয়তো তাদের কাছে মেরী ম্যাকার্থির কোনো আকর্ষণ নেই, তাদের প্রিয়া পাঠিকা হয়তো শ্রীমতী এডনা ফার্বার।

হয়তো দীপ্ত বুদ্ধির দিন শেষ হয়ে এসেছে, মেধার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, হয়তো মেরী ম্যাকার্থি তা হ'লেও এখনো লিখে যাবেন, কিন্তু আমরা পড়বো না।

তদ্গত রূপকথা

মৃত্তিকার কাছাকাছি, জীবনের প্রথমতম স্ত্রের কাছাকাছি। ঘোরালো-প্যাঁচানো নয়, চতুরালি নেই, নিরাভরণ পরিস্বচ্ছ ভাষার নির্ঝ'র। এই ভাষায় এমন-এক ছন্দ, যা মানুষের আদি মুহূর্তের প্রার্থনাউচ্চারণের মধ্যে ছিল। ভাষার সঙ্গে সংগীতের কোনো পার্থক্য নেই : সংগীত সমবেত হয়ে যা গীত হয়ে থাকে, ভাষাও তাই—প্রতিবেশীর সঙ্গে, প্রেমিকের সঙ্গে, যে-একদা আমার ভাই ছিল; আপাতত নিজেকে শত্রুর ভূমিকায় কল্পনা ক'রে আবেগকে বিমুক্ত করতে চাইছে, তার সঙ্গে, আলাপ জমাবার সংকেতধ্বনিসংহতি। যারা যত সরল, যারা যত নির্ভীক, যারা ন্যূনতম মানবিকপাপবোধভারাতুর, তাদের ভাষা তত গানের কাছাকাছি : ভাষার ছন্দিত রূপ, ছন্দ সংগীতের সঙ্গে একাকার।

ঠিক এই মুহূর্তে আফ্রিকায় উথাল-পাথাল বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে। আমি রাষ্ট্রবিপ্লবের কথা বলছি না, তার ছিটেফোঁটা সংবাদ আমরা খবরকাগজে পাই, সমস্তরকম বিদেশী প্রভাব ছুঁড়ে ফেলে রাষ্ট্রের-পর-রাষ্ট্রে যে-আমূল নতুন সমাজকল্পের প্রতিজ্ঞা উজ্জয়িনী হয়ে উঠেছে বিগত দশ-পনেরো বছর ধ'রে, তার কিছু-কিছু আভাস আমাদের অহমিকাঠাসা জীবনযাপনে মাঝে-মাঝে মৃদু স্পর্শ ক'রে যায় : আমরা হয়তো আতঙ্কে সাময়িকভাবে কাৎরাই, নয় তো পাশ ফিরি। কিন্তু যে-খবর আদৌ পৌঁছয় না তা আফ্রিকার নানা দেশের সারাৎসার প্রাণস্পন্দন যাতে জড়ানো সেই গান-ছন্দ-সাহিত্য-নৃত্যের খবর। ঈশ্বর, এদের কৃপা করো, এরা নিরক্ষর; আমাদের মতো সুপ্রাচীন ঐতিহ্য নেই; অথচ আমাদের মতো ইওরোপের স্পর্শের প্রশ্রয়নে নতুন-কোনো প্রজ্ঞাপারমিতার সন্ধান পর্যন্ত পায়নি। এদের নৃত্যকলা, মার্কিনি ছবিতেই তো দেখেছি, বেধড়ক

ঢাক বাজানোর সঙ্গে অসভ্য দাপাদাপি ; এদের গানে, গলায় ঐশ্বর্য যতই থাক না কেন, আসলে কেমন-এক গুমোট-ছাওয়া সানুনাসিকতা ; আর এদের সাহিত্য কিংবা কাব্য আমদের জ্ঞানের পরিধির বাইরে। আফ্রিকার লোকেরা আবার লেখাপড়া শিখলো কবে থেকে যে কবিতা লিখবে, কি মহৎ কোনো দর্শনচিন্তায় নিজেদের ব্যাপৃত করবে? অজ্ঞতার মতো নিরাপদ দুর্গ আর নেই : আমরা মিশর আর আলজেরিয়ার মধ্যে তফাৎ করতে শিখিনি, ঘানা-নাইজেরিয়া এক হয়ে আছে আমাদের মানসে, চাদ কিংবা উগাণ্ডা অথবা কিনিয়ায় কোথায় কী ধরনের সাংস্কৃতিক আলোড়ন দেখা দিচ্ছে, তা জানার আগ্রহ আমাদের প্রায় শূন্য। জানি না আরবিভাষায় কী লেখা হচ্ছে, জানি না সোয়াহিলিতে নতুন কী জাদুর সংযোগ, আমাদের জানা নেই বাণ্টুভাষায় চিন্তার দিগন্ত কতদূর পর্যন্ত এগিয়েছে। আমরা কূপমণ্ডূক, আমরা পরিতৃপ্ত।

কিন্তু এই পরিতৃপ্তি ধাক্কা খায় মার্কিন দেশে, ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে। ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী হিশেবে যাঁরা দুই-দেড় শতাব্দী আগে শৃঙ্খলিত বিপর্যয়ের মধ্যে নতুন ভূখণ্ডে চালান হয়েছিলেন, তাঁদের আর-কিছু সম্বল ছিল না, শুধু গান ছিল, প্রার্থনার ভাষা ছিল, যে-প্রার্থনা প্রেমেরই অন্য-এক নাম। দশকের-পর-দশক ধ'রে, সন্তানসন্ততির দুঃখের নিহিত নীলিমা আরো-আরো সন্তানসন্ততির দুঃখের নীলিমায় মিশে যাওয়ার আপাতঅনন্ত প্রহরে ব্যাপ্ত হয়ে, মার্কিন ও ক্যারিবিয়ানের নিগ্রোরা কোনোক্রমে নিজেদের ভরসা দিয়ে রেখেছে। ভরসা দিয়ে রাখতে পেরেছে কারণ, অত্যাচারের তীব্র-দীর্ণ মুহূর্তে পর্যন্ত, তাদের আস্তিকতা অটুট ছিল, পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা নিটোল ছিল। সমস্ত নৈরাশ্যের উপকণ্ঠে পৌঁছেও তাই তাদের গান ছিল, ভাষার অপাপবিদ্ধতা ছিল। যে-সংকেতশব্দাবলী আফ্রিকাতে একদা ভাষাকে বাক্যগত করতো, তার স্মৃতি নতুন পরিবেষ্টনীতে খুব বেশিদিন টিঁকে রইলো না, অচিরে প্রভুদের ব্যবহৃত ভাষামণ্ডলী থেকেই পুনরায় নবসংকেতসম্ভার সৃষ্টি করতে হলো। কিন্তু তেমন ক্ষতি হলো না তাতে। যেখানে হৃদয়ক্ষরিত আনন্দ ব্যথা-প্রকাশের উৎস, যে-কোনো ভাষার মধ্যবর্তিতাই সে-অবস্থায় সমান ব্যবহারযোগ্য। আধো-ইংরেজি, আধো-ব্যাকরণঅসম্মত বাক্যবিন্যাস, কোনো-কিছুই নিগ্রো সম্প্রদায়ের সত্তার আকৃতিকে প্রতিহত করতে পারলো না। উপচে-পড়া জলের কলস মানলো না শাসন, উপচোলোই। তা উছলে উঠলো ক্যারিবিয়ানে ক্যালীপসোর উদ্দীপ্তির মধ্য

দিয়ে, তা তীব্র হলো স্পিরিচুয়াল গানের ভক্তির সংহত মূর্ছনার মধ্য দিয়ে। নিগ্রোদের আর সব কেড়ে নেওয়া হলো, ঐশ্বর্য, নারী, ঐতিহ্যের গর্ব, পরিকল্পিত অধ্যবসায়ের সঙ্গে সব-কিছুর অধিকার লুপ্ত করা হলো। দস্যুর দল, মহাজনের দল যা কেড়ে নিতে পারলো না তা ভক্তি, বিশ্বাস; আর সেই আস্তিকতাকে দুর্বার উৎসাহে প্রকাশ করার মতো দেবদত্ত কণ্ঠ, ভাষা, গান। সব-কিছুর শেষে গান, সব-কিছু নিঃশেষ হয়ে গেলেও অথচ যা যায়নি, সেই তদগত প্রেমের অভয়-মাখানো গান।

এই গান যে-কোনো সাধারণ লোক বাঁধতে পারে, যে-কোনো দুঃখী, সাক্ষরতা নিষ্প্রয়োজন। কথা-ব'লে-যাওয়ার মতো গান, অনুরাগে-মমতায় সাধারণ লোক সদাসর্বদা যে-ভাষা ব্যবহার করে, সেই ভাষায় পাশাপাশি-বসিয়ে-যাওয়া গান, ঋজুতার বাইরে যার অন্য-কোনো প্রাকরনিক পরিচয় নেই। কিন্তু তবুও তা আশ্চর্য ঐশ্বর্যউজ্জ্বল স্থপতি হয়ে ওঠে, কারণ এই আস্তিক নিরক্ষররা স্মৃতিভ্রষ্ট হয়নি, তাদের জাতিস্মর চৈতন্যে এই অনুভূতির ছোঁওয়া যে ভাষার প্রয়োজন প্রেমের জন্য। শাদামাটা শব্দগুলি তাই, প্রেমের আশ্লেষ যেহেতু তাদের তিলোত্তমা ক'রে দিয়ে গেছে, প্রতি মুহূর্তে, প্রতি উচ্চারণে ঝলকানি ছড়ায়:

You've got to move when the spirit say move,
Move when the spirit say move!
When the spirit say move, Oh Lord,
You've got to move,
You got to move when the spirit say move.

নিরাড়ম্বর সামান্য-কয়েকটি কথার প্রতিধ্বনি, অথচ মনে হয় আশ্চর্য কাব্য। ব্যথা আছে, অথচ দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা নেই। যেন সমস্ত দ্বন্দ্ব অতিক্রম ক'রে, সমস্ত দর্শন উপলব্ধি ক'রে কোনো হ্রদের উপকূলে পৌঁছনো গেছে। এখন যেন সব শান্ত, সমস্ত গ্লানি বিদূরিত, সমস্ত সন্দেহ অপগত। কচিৎ-কখনো অশীতিপরা কোনো নিগ্রো মহিলার মুখাবয়বের দিকে তাকালে যেন এই অভিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিদ্যুৎবার্তা অনুভব করা যায়, যন্ত্রণা-লাঞ্ছনা-অবমাননা উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্বাসের সমাহিতি, ভবিতব্যনির্দিষ্ট খিন্নতাম্লান প্রব্রজ্যার শেষে নিরাসক্ত আনন্দ। সেই মুখাবয়বে কোনো ঘৃণা নেই, ক্রোধ নেই, প্রতিহিংসাপ্রবণতা নেই, যা আছে তা শুধু আস্তিকতার স্থৈর্য। নিগ্রো গানেও তাই। দুঃখ নয় দৈন্য নয় অভিযোগ

নয়, উত্তরদেশের গাথা : ভক্তি, প্রেম, ভবিষ্যৎবিশ্বাস, ক্ষমার প্রসন্নতা, আদি মানবিক গুণগুলির পুনরাবৃত্তি। সম্প্রতি কিছু-কিছু নিগ্রো গানে উত্তাপের প্রসঙ্গ সামান্য অসহিষ্ণুতা, চিত্তস্থৈর্যের ঈষৎ উচ্চাবচতা। কিন্তু মনে হয় না নিগ্রো কবিতা-গানের মূল হৃৎসত্তা আদৌ বিচলিত হয়েছে, মনে হয় এখনো অবৈকল্য অস্খলিত।

বিচলিত হয়নি কারণ হয়তো উত্তেজনার সত্যিই আর প্রয়োজন নেই। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে নিগ্রো সম্প্রদায় রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও থরোথরো ; দু'কোটি নিগ্রোর পদক্ষেপে অনাচারের প্রাচীন দেয়ালগুলি ধ্ব'সে-ধ্ব'সে পড়ছে। এবং আফ্রিকায় দেশের-পর-দেশে শুভ্র সভ্যতার সাম্রাজ্যবাদ বিলীন হ'তে-হ'তে যাচ্ছে। এমন অবস্থায়, নিগ্রোরা হয়তো যথার্থ যুক্তির সঙ্গেই গান উচ্চারণ করতে পারেন, আশঙ্কার কারণ গত : We shall overcome, one day we shall be free ; we shall over-come, we shall soon be free।

মনে হয় এই অখণ্ড বিশ্বাসের জ্যোতির্মণ্ডল নিগ্রো লেখকদের গদ্যরচনাকে পর্যন্ত ক্রমশ উদ্ভাসিত করছে। আশ্চর্য বই জেমস বল্ডুইনের *The Fire Next Time*[১]। যে-কোনো রচনাই যে শৈলীর ব্যাপার, অধ্যবসায়ের ইতিহাস ব'য়ে নিয়ে তবে যে সাহিত্যের জন্ম, *The Fire Next Time*-এ তার কোনোরকম স্বীকৃতি নেই। হৃদয়ের গভীরতম অভ্যন্তর থেকে এই রচনার উদ্ভব, অবিকল স্পিরিচুয়াল গানগুলির মতো। যেমনভাবে কথাগুলি উঠে আসছে, ঠিক তেমনি বসিয়ে যাওয়া হচ্ছে ; কোনো সরঞ্জাম নেই, কারণ হৃদয় কথা বলছে। একটি মন, যে-মনের বহির্ধৃতি একটি রক্তমাংসসম্পন্ন মানুষ, যে-মানুষের গায়ের রঙ নিকষ কালো, নাক থ্যাবড়ানো, ঠোঁট পুরু, চুল উগ্র-কোঁচকানো ; সেই মানুষের সেই মন আবাল্য ঘা খেয়েছে, চিন্তা করেছে, চিন্তা ক'রে ফের নতুন ক'রে ঘা খেয়েছে। যারা আপাত-শক্তিশালী, যন্ত্রপাতি যাদের অধিকারে, ধনসম্পদ যাদের মুঠোর মধ্যে, যারা সংখ্যার দিক থেকে নয়গুণ, তাদের ভয়-পাওয়া পর্যবেক্ষণ করেছে, তাদের সেই ভয়-পাওয়ার অসহায়তা থেকে যে-ক্লৈব্য সমাজে সঞ্চারিত হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করেছে। এই ক্লীবতা থেকে শ্রেণীসংঘর্ষ, বর্ণবিদ্বেষ ; এই

১ The Fire Next Time. Dial Press, New York. $ 2.25.

অসহায়তা থেকে নিগ্রোদের ঘরবাড়িমন্দির পুড়োনো, ভালো শিক্ষালয়ে পড়তে না-দেওয়া, ভালো পল্লীতে থাকতে না-দেওয়া ; এই ভীরুতা থেকে নিগ্রো নারীধর্ষণ, আচমকা গুলি চালিয়ে নির্জন লোকালয়ে নরহত্যা ; এই সমুৎপন্ন সর্বনাশের দুঃস্বপ্নবোধে শ্বেতকায় মার্কিনমহলে শঠতা-চাতুরী-কালহেলনের ক্লান্তি-কর অভিনয়। একটি মন, কালো শরীরের আবরণের নিচে যে-আবাল্য দেখেছে, চিন্তা করেছে, অবশেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে ; সেই সিদ্ধান্তগুলি এ-বইতে নিরুত্তাপ স্বরে লিপিবদ্ধ হয়েছে। স্বরে উত্তাপ নেই, কিন্তু তাই ব'লে লেখক নির্মোহ নন। মোহ আছে, প্রেম আছে, নিজের সম্প্রদায়কে ভালোবাসা আছে, কিন্তু শত্রুপক্ষ সম্পর্কে কোনো হিংসা নেই, বিদ্বেষ-বহ্নি নেই ; কিছুটা কৌতুক আছে, সামান্য-কিছু করুণাও হয়তো বা। একদিকে বিশ্বাস : 'Know whence you come, there is really no limit to where you can go' (১৬ পৃষ্ঠা)। অন্যদিকে, শ্বেতকায়দের সম্বন্ধে আশ্চর্যশ্রীমণ্ডিত অন্তর্বেদনাবোধ : 'Try to imagine how you would feel if you woke up one morning to find the sun shining and all the stars aflame. You would be frightened because it is out of the order of nature. Any upheaval in the universe is terrifying because it so profoundly attacks one's sense of one's own reality. Well, the black man has functioned in the white man's world as a fixed star, as an immovable pillar ; and as he moves out of his place heaven and earth are shaken to their foundations' (১৭ পৃষ্ঠা)।

নিগ্রোসমস্যা নিয়ে লেখা তত্ত্বকথা কী জাদুতে মহত্তম সাহিত্যে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে বল্‌ডুইনের বই সেই হেঁয়ালি। গদ্য, অথচ মনে হয় কবিতার চরণ থেকে চরণান্তরে উপনীত হচ্ছি। গদ্য কবিতা হয়ে উঠেছে, গান হয়ে উঠেছে, কারণ এই গদ্য লিখেছেন একজন নিগ্রো, লিখেছেন নিজের সম্প্রদায়ের প্রতিভূ হয়ে, দুই শতাব্দীর জীবনী কুড়ি হাজার শব্দের স্থপতিশাসনে বন্দী ক'রে। ভাষার এখানে অকারণ ব্যবহার নেই, প্রত্যেকটি ক্রিয়াপদ একটি বিশেষ আবেগকে পরিস্ফুট করার জন্য নিয়োজিত, সব-ক'টি বিশেষণ যথাযথতম দ্যোতনার ভাববাহক, প্রতিটি বিশেষ্য ইতিহাসের পাহাড় খুঁড়ে জড়ো করা। আধিক্য নেই, বাহুল্য

নেই ; নির্ঘোষ নেই, কিন্তু কাকুতিও নেই। দু'শো বছরের অপমানের ইতিহাস কথা বলছে, লাঞ্ছনার কাহিনী ব্যক্ত করা হচ্ছে, কিন্তু, আবেগের জায়গা থাকলেও, আবেগাধিক্যের নেই, নেই এই কারণে যে ইতিহাস তো অতীত হয়ে গেছে, এবং নিরাসক্ত বিচারে ইতিহাস ইতিমধ্যেই বিধান নিরূপণ ক'রে গেছে কাদের জয়, কাদের পরাজয় ; সুতরাং তিক্ততার, হীনতার আর অবকাশ নেই, সে-প্রসঙ্গ প্রক্ষিপ্ত।

The Fire Next Time শাপমুক্তির কাহিনী, মার্কিন নিগ্রো সম্প্রদায় সহসা কী ক'রে উপলব্ধি করলো ইতিহাস তাদের দিকে, তার তদ্গত রূপকথা। রূপকথার বর্ণনায় এক এবং বহু প্রায়ই পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছে, সত্তা এবং সমাজ একীভূত। এটাও মহৎ সাহিত্যসৃষ্টির সংজ্ঞা : পৃথিবীর প্রায়-সমস্ত সভ্যতাতেই ব্যক্তিসত্তা এবং সমাজচেতনা পরস্পরের নির্ভরে সাহিত্যকে জন্ম দিয়েছে। কখনো মনে হয় বল্‌ডুইনের আত্মজীবনী পড়ছি, খানিক বাদে তা নিগ্রো সমাজের চেতনার ইতিহাসস্রোতস্বতীর সঙ্গে এক ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। নিচের উদ্ধৃতি প'ড়ে সন্দেহ হ'তে পারে কোনো অকপট স্নাতস্নিগ্ধ আর্ষ-উক্তি শুনছি, 'That man who is forced each day to snatch his manhood, his identity, out of the fire of human cruelty that rages to destroy it knows, if he survives his effort, and even if he does not survive it, something about himself and human life that no school on earth—and, indeed, no church—can teach. He achieves his own authority, and that is unshakable. This is because, in order to save his life, he is forced to look beneath appearances, to take nothing for granted, to bear the meaning behind the words. If one is continually surviving the worst that life can bring, one eventually ceases to be controlled by a fear of what life can bring ; whatever it brings must be borne. And at this level of experience one's bitterness begins to be palatable, and hatred becomes too heavy a sack to carry' (৮৪ পৃষ্ঠা)।

হয়তো এই আস্তিকতায় সমস্ত সমস্যার নিরসনের সূত্র বিধৃত হয়ে আছে ;

অথবা হয়তো নেই। হয়তো, এখনো কিছুদিন, ঘৃণাকে বাদ দিয়ে আবেগ অসম্ভব, প্রগতি অসম্ভব। ব্যক্তি থেকে অন্যতর ব্যক্তিতে হয়তো অভিজ্ঞতার রূপ ভিন্ন হ'তে থাকবে। হয়তো রক্তাক্ত বিপ্লবের পথ এড়িয়ে ইতিহাসের নিস্তার নেই, মার্কিনদেশের নিগ্রো সম্প্রদায়েরও নেই। কিন্তু বিপ্লবের ভিত্তি বোধের উপর, চেতনার উৎসমূল থেকেই কর্মের আবেগ। চেতনা, বোধ, সাহিত্য; বিপ্লবের জন্যই প্রয়োজন সাহিত্যের। *The Fire Next Time*, তার প্রত্যয়-বোধ সত্ত্বেও, এই প্রত্যয়ে যাদের বিশ্বাস নেই, তাদেরও হয়তো প্রেরণা জুগিয়ে দেবে; তার কারণ বলড়ুইন নিজেই গানের কলির সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন,

The very time I thought I was lost,
My dungeon shook and my chains fell off.

এই বই সেই শৃঙ্খল-মুক্তির ব্যঞ্জনা।